শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবলাইলাল সেন
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—কৃষ্ণা দশমী, ফাল্গুন, ১৩৫৩

মূল্য—৪৲

প্রিণ্টার—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭নং, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!'

—রঙ্গলাল

অতি-মানুষের দেশ!

রূপকথা বলছি না—মানুষ আর অমানুষে মিলে সত্যি দেশটাকে অতিমানুষের দেশে পরিণত করেছে। যুগার্জিত কৃষ্টিধারা, জন্মার্জিত আভিজাত্য, জগৎখ্যাত জীবনায়ণ সবকিছুকে অতিক্রম করে,—অস্বীকার করে ওরা আজ অতিমানবত্বের সাধনায় মেতেছে—যে মানুষ মাটির পৃথিবীকে ভেঙে গুঁড়িয়ে জ্বলন্ত এ্যাটোম্ পিণ্ডে পরিণত করবে—শ্যামলা ধরিত্রীর শস্য-সম্ভার যার কাছে হবে উপহাসের উপকথা, যার মনের ক্ষুধা মিটাবে পাখীর কাকলি নয়, আকাশের এরোপ্লেনের কর্কশ চীৎকার আর এ্যাটোম্ বোমের অভিজাত মৃত্যু-রশ্মির রূপছটা, শরীরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য যারা মৃত্তিকার স্বাদু দান নয়—ফ্যাক্টরির ফসলকে নিজের হাতে ফলিয়ে নেবে। হাসি পায়!—বাঁশীকে ওরা ভেঙে ফেলেছে—কবিতাকে করেছে গদ্যের মজুরণী—ললিতকলাকে লিপষ্টিক আর রুজ পাউডারের উগ্র চাকচিক্যে করেছে অহঙ্কৃত। ক্ষমাকে ওরা বলে ভীরুতা, দানকে ওরা বলে ইনটেলিজেন্ট ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট—সত্যকে বলে মনোবিকার! ওরা অতি-মানুষ হচ্ছে! ওদের শান্তির বাণী সহজ সাহিত্য নয়, জটিল রাজনীতি! সাম্যের বাণী সুযোগ-সুবিধার গোপন ফাঁদ—সান্ত্বনার বাণী ধোঁকা দিয়ে সময় ক্ষেপনের ব্যবস্থা।

যে দাসত্ব-বেদনা জাতির মানস-লোকে আজ দাবানলের মত জ্বলছে, তারই ব্যঞ্জনা জাতীয়-সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে যুগযুগান্তর। শক্তিশালী লেখনীর সেই কঠোর-কোমল বাণী-মূর্তিকে জাতি আজ চিনতে শিখেছে, তাই সাহিত্যিকের উপর পাঠক-সাধারণের দাবীও আজ অগাধ।

বর্তমান উপন্যাসে স্বাধীনতা হীনতার দুর্বিসহ গ্লানি এবং অপরিসীম দুঃখ-বেদনাকে লেখকের বজ্র-কঠোর লেখনী যে বীর্য্য-গভীর রূপ দিয়েছে, আশা করি, তা প্রত্যেক পাঠকের অন্তরকে জাগ্রৎ করবে। ফাল্গুনীবাবুর নিজস্ব বাচন-ভঙ্গী, চরিত্র-চিত্রণ, অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়াও এই বইয়ে আছে আগামী যুগের বলিষ্ঠ সম্ভাবনার সংকেত।

দেব সাহিত্য এণ্ড কোং

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

পাণি-বজ্রেষু—

নেতৃত্বের হে জাগ্রত বিজয়-রুদ্র, তোমার বিরাট আদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তিকা হোক… …!

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!'

—রঙ্গলাল

অতি-মানুষের দেশ!

রূপকথা বলছি না—মানুষ আর অমানুষে মিলে সত্যি দেশটাকে অতিমানুষের দেশে পরিণত করেছে। যুগার্জিত কৃষ্টিধারা, জন্মার্জিত আভিজাত্য, জগৎখ্যাত জীবনায়ণ সবকিছুকে অতিক্রম করে,—অস্বীকার করে ওরা আজ অতিমানবত্বের সাধনায় মেতেছে—যে মানুষ মাটির পৃথিবীকে ভেঙে গুঁড়িয়ে জ্বলন্ত এ্যাটোম্ পিণ্ডে পরিণত করবে—শ্যামলা ধরিত্রীর শস্য-সম্ভার যার কাছে হবে উপহাসের উপকথা, যার মনের ক্ষুধা মিটাবে পাখীর কাকলি নয়, আকাশের এরোপ্লেনের কর্কশ চীৎকার আর এ্যাটোম্ বোমের অভিজাত মৃত্যু-রশ্মির রূপছটা, শরীরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য যারা মৃত্তিকার স্বাদু দান নয়—ফ্যাক্টরির ফসলকে নিজের হাতে ফলিয়ে নেবে। হাসি পায়!—বাঁশীকে ওরা ভেঙে ফেলেছে—কবিতাকে করেছে গদ্যের মজুরণী—ললিতকলাকে লিপষ্টিক আর রুজ পাউডারের উগ্র চাকচিক্যে করেছে অহঙ্কৃত। ক্ষমাকে ওরা বলে ভীরুতা, দানকে ওরা বলে ইনটেলিজেণ্ট ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট—সত্যকে বলে মনোবিকার! ওরা অতি-মানুষ হচ্ছে! ওদের শান্তির বাণী সহজ সাহিত্য নয়, জটিল রাজনীতি! সাম্যের বাণী সুযোগ-সুবিধার গোপন ফাঁদ—সান্ত্বনার বাণী ধোঁকা দিয়ে সময় ক্ষেপনের ব্যবস্থা।

হাঃ হাঃ হাঃ! হেসে উঠলো লোকটা। বলিষ্ঠ চেহারা—মুখের ভাব বাংলাদেশের মতই কোমল, রংও তেমনি শ্যামল—আর চোখ দুটি পুরো বাঙ্গালী-চোখ, কিন্তু অন্তরে ও মোটে বাঙ্গালী নয়—শান্তির বাণী আউড়ে সাম্যের সুযোগ ও খুঁজে বেড়ায় না—ওর জীবন যুদ্ধের জীবন, ও ছিল সৈনিক। ওর জীবনের যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য ও দীর্ঘ পথ পার হয়ে এল। আজ আসছে নতুন এই সাঁকোটা দিয়ে।

লোকটির নাম কালীপদ। অত্যন্ত সহজ বাংলা নাম। তন্ত্রোপাসক বাংলার একটা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই নামের সঙ্গে। লোকটিকে দেখলে কিন্তু মোটে তান্ত্রিক বলে মনে হয় না—বন্য সাঁওতাল মনে হয় প্রথম দর্শনে; তারপর ওর উজ্জ্বল টানা চোখ, ঠোঁটের প্রান্তের ঈষৎবক্র ঊর্ধভঙ্গীর গঠন আর চিবুকের সূক্ষ্মতা দেখে চেনা যায়—লোকটা বাঙালী।

সাঁকোর মাঝখানে এসে সে থেমে গেল; নদীর পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে একবার করে চাইল—দূরে, বহু দূরে একটা মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া দেখা যায়—তার পানেও চাইল একবার, তারপর আবার হাঁটতে লাগলো। সাঁকো পার হয়েই দুপাশে দুটো বাবলা গাছ, ঠিক কাঁটাদেওয়া ফটকের মত দেখাচ্ছে। হলদে ফুল ফুটেছে আর তার ঘন ডালে ঠোঁটবাঁকানো দুটো টুনটুনি পাখী তিড়িক্ তিড়িক্ করে লাফাচ্ছে। দীপ্ত আকাশের বিরামহীন শান্তি—রৌদ্রের নিষ্করুণ পিপাসা—নদীর বালুকণার শাণিত ঝিলিক্ চমৎকার একটা আকর্ষনীয় অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এখানে—অতিমানুষের দেশ!

কালীপদ আবার দাঁড়ালো। ওর মনের চিন্তা মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে। চল্লিশের ঊর্ধে ওর বয়স, বাঙ্গালী-জীবনে বৃদ্ধত্বের বয়স বৈকী। কিন্তু ও তো বাংলায় ছিল না। ওর শরীরের শক্তিমত্তা দেখলে ওকে বাঙ্গালী বলে

মনে হয় না—তবু কিন্তু ওর মনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাগুলো ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে! দীর্ঘ সতেরো বছর বাংলার দুলাল কালীপদ ছিল বাংলার বাইরে—কাবুলে। ওর জীবনের কাহিনীর সঙ্গে হয়তো নেতাজীর পলায়ন-কাহিনী জড়িয়ে আছে কিম্বা হয়তো ও ভারতের মুক্তি-সাধনার একটা নতুন পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল, অথবা ওর কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না দেশত্যাগ করার—দেশকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া! কিন্তু দেশ ওর কাছে কি দাবী করেছিল, জানতে হলে অনেক আগের ইতিহাস জানতে হবে।

লোকটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্। পঠদ্দশায় কবিতা লিখতো এবং কয়েকটা কাগজে তার কিছু ছাপাও হয়েছিল। বিশ বছর বয়সের পর ওর বাবা বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করে দিলেন, আর সাড়ে একুশের মধ্যে ওর স্ত্রী ওকে একটি কন্যারত্ন দান করে ইহলোক হতে বিদায় নিল। ছোটভাই তারাপদ তখন কলেজ ছেড়ে রেলের চাকরীতে ঢুকেছে। কালীপদ দেখলে, মহা সুযোগ! দেশের মুক্তি-সাধনায় প্রত্যক্ষ যোগদান সে করতে পারে নি এর পূর্ব্বে, এবার করলো এবং এমন ভয়ানকভাবে করলো যে বৃটিশ-সিংহের কেশর প্রায় ছেঁড়ে ছেঁড়ে! অতএব একদিন ভোররাত্রে কালীপদ তাদের গোপন আড্ডায় শয়ঙ্কঙ্কন পরে রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গেল। বাবা মারা যাওয়ার খবরটা জেলে বসেই পেয়েছিল—কিন্তু আর কোনো খবর কেউ-ই ওকে জানায় নি? সাতটি বছর বাংলার বাইরে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ খেয়ে যেদিন ওর মেয়াদ উত্তীর্ণ হোল এবং বাইরে বেরিয়ে এল—সেদিন ভেবে দেখলে—কোনো একটা ছোটখাটো যায়গায় ওর দেশ নেই—কোনো বন্ধন কোথাও আছে বলে ওর মনে পড়ল না—ভুবনত্রয়কে ও এখন স্বদেশ বলে ভাবতে পারে, অন্ততঃ সারা ভারতকে

স্বদেশ ভাবতে কিছুই ওর আপত্তি হতে পারে না। অতএব চলে গেল পাহাড়ে—তারপর কাবুলে গিয়ে রয়ে গেল! সাড়ে ছয়মাসের মেয়েটার কথা ওর মন থেকে কখন মুছে গেছে একেবারে।

আরো দশ বছর! সুদীর্ঘ দশটা বছর ওর চোখের উপর বয়ে গেল জলের ধারার চেয়েও সহজে। এই পুরো দশটা বছর সে কি যে করেছে তা জানবার আমাদের দরকার নেই—শুধু জানলেই হবে যে কবিতা লেখা সে ভুলে গেছে, গান সে আর গাইতে পারে না। কলেজে একদিন ভাল অভিনয় করতো সে—কিন্তু এখন অভিনয় করার কথা শুনলে নাক সিটকায়—অর্থাৎ লোকটার মনের যা-কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি-শক্তি সব ঘুমিয়ে গেছে—জেগে আছে শুধু একটা অতি বলবান বন্য মানুষ, মায়ের-কোলে-ঘুমিয়ে-থাকা মৃগশাবককে বর্ষা ছুড়ে মারতে যে তিলমাত্র দ্বিধা করে না! স্নেহ দয়া মায়ার যে ধার ধারে না, জীবনকে যে রক্ষা করে জীবনের জন্যই—আর কিছুর জন্য নয়।

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনেক পোষ্ট-অফিসের ছাপ গায়ে নিয়ে অনেক জায়গা ঘুরে একদিন একখানা খামের চিঠি গিয়ে পৌঁছালো কালীপদর সেই কাবুলের আস্তানায়। নেতাজীর পলায়নকাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে তখন হুলুস্থুল; দেশের মুক্তির জন্য তখন দেশবাসী জীবন-মরণ যুদ্ধে মেতেছে। মন্ত্রীমিশনের আগমন-প্রত্যাশায় গান্ধীমহারাজ ঘন ঘন বাণী ছাড়ছেন "বিশ্বাস করো—ওদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করো।" কাগজ-ওয়ালাদের কলমে কলমে তখন দেশের স্বাধীনতার অগ্নিগাথা ঝরছে। স্বাধীনতা না এলে বিশ্বে যে প্রলয় ঘটে যাবে, একথা বলতেও তারা কুণ্ঠিত হচ্ছে না—ঠিক সেই সময় কালীপদর হাতে এল চিঠিখানি।

সুদূর কাবুলের নোংরা একটা ঘরে বসে কালীপদ চিঠিখানা হাতে নিয়েই চমকে উঠলো! কে লিখেছে চিঠি তাকে? কেন লিখেছে?

কি জন্য তার এই নির্বিকল্প প্রবাসজীবনে চিঠির লোষ্ট্রাঘাত? কিন্তু চিঠিখানা তো কোনো বিপদের সঙ্কেতও হতে পারে! খুলে দেখতে প্রথমটা ওর ভয়ই করছিল, অথচ এতদিন পরে একখানা চিঠি—যেন জীবনে এই প্রথম;—আগ্রহ, ঔৎসুক্য আর উৎকণ্ঠায় মনটা ভরে তুললো। ঘরে আর কেউ ছিল না। কালীপদ সাবধানে খুলে ফেললো চিঠিখানা—মেয়েলী হাতের লেখা—নীচে নাম সই—'কৃষ্ণা'!

কে এই কৃষ্ণা! কালীপদ চিঠিখানা না পড়ে তার জীবনের অরণ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিল—কৃষ্ণাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু চিঠির প্রথম সম্বোধনেই প্রকাশ পেল—কৃষ্ণা কে। কালীপদর লোহার মত অন্তরটা ধক্‌ধক্ করে নেচে উঠলো—হাতদুটো কাঁপছে ওর! কঠিন বন্য নির্মম বাঁধনহারা কালীপদ মুহূর্তে বাঙ্গালী বনে গেল—নীড়বাসী 'বাবা' বনে গেল।

—'বাবা!'

দীর্ঘ-প্রবাসী পিতার একমাত্র কন্যা চিঠি লিখেছে জীবনে এই প্রথম। মনের তন্ত্রীতে কে যেন একটা আনন্দের সুর বুলিয়ে গেল। পৃথিবীতে তাহলে এখনো বেঁচে থাকবার মত অবলম্বন আছে—এখনো আছে এমন একটি অন্তর, যেখানে কালীপদ আশ্রয় পেতে পারে! চিঠির অর্ধেকটা পড়তেই কালীপদর স্নায়ুগুলো আবেগে এলিয়ে পড়বার উপক্রম করছে—ভাঙা টুলখানায় বসে সে একটু সামলে নিলো, তারপর আবার পড়লো—একবার, দুবার, তিনবার। তারপর কতবার যে পড়লো,—পড়ে আশ মেটে না। ওর একটা মেয়ে আছে, যে মেয়ে একান্তই ওর আত্মজা—যার নাম কৃষ্ণা—যে....

কালীপদ থেমে গেল। ভাবতে লাগলো—'কৃষ্ণা' নামটা কে দিয়েছে তাকে! সে কি কালোবরণ হয়েছে কালীপদর মতই? হয়েছে

তো ভালো হয়েছে। কালীপদর মেয়ে কালীপদর মতই তো হওয়া উচিত। কিন্তু ওর মা তো কালো ছিল না। কৃষ্ণা নিশ্চয় তার মা'র মত ফর্সা না হলেও খুব কালো হয় নি। কিন্তু কৃষ্ণা যখন তার নাম, তখন কালোই তার গায়ের রং হবে, নইলে 'শুক্লা' নামও তো হতে পারতো। কিন্তু কৃষ্ণা চমৎকার নাম—কৃষ্ণ সখী দ্রৌপদীর নাম—দ্রৌপদী—যাজ্ঞসেনী ! দীর্ঘদিন পরে কালীপদ আবার তার প্রথম যৌবনের কাব্যকুঞ্জে ফিরে এল যেন। যেন ওর বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে ! মাত্র একটা মেয়ের চিঠি, তার অনুপ্রেরণায় এতখানি শক্তি ! আশ্চর্য !

কৃষ্ণা লিখেছে—সে কাকার কোলে বড় হয়ে উঠলো—তার বয়স এখন আঠারো। জন্মাবধি সে বাপকে দেখেনি—তার বড় ইচ্ছে ক'রে দেখতে, 'বাবা' বলে ডাকতে।

মুক্তি পাবার আগে তার বাবা যে-জেলে ছিল সেই ঠিকানাতেই কৃষ্ণা চিঠি লিখেছিল—সরকারের সুযোগ্য কর্মচারীরা সে-চিঠি কালীপদর কাবুলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশ্য চিঠিখানার উপর অনেক ধকল গেছে, সেটা তার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়—তবু ওরা পাঠিয়ে তো দিয়েছে। সে বুঝলো, সরকার এখনো তার খবর রাখেন। আজন্ম সরকার-বিদ্বেষী কালীপদ আজ সরকারী ডাকবিভাগের উপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণা বাবাকে বাড়ী যেতে লিখেছে। একটি সতেরো আঠারো বছর বয়সের মেয়ে তার বাবা আসবার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে চিঠি লিখে। চিঠি লেখার তারিখ দেখলো কালীপদ ; প্রায় তিনমাস আগে লেখা চিঠিখানা। উঃ ! পুরো তিনটে মাস দেরী করেছে এই কাবুলে চিঠিখানা পাঠাতে ! সরকারী কর্মচারীদের কোনো যোগ্যতা নেই !

কালীপদ রেগে উঠলো। কিন্তু না—ওরা পাঠিয়েছে—তাঁদের অসীম অনুগ্রহ—কালীপদ আবার কৃতজ্ঞ হোল।

দশ বছরে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছে কালীপদ—বেশ কিছু টাকা, যে-অঙ্কের টাকা বাংলাদেশের কোন গ্রামে এসে পৌঁছালে ছোটখাটো সম্পদ বলা চলে—কিন্তু কৃষ্ণার জন্য টাকা পয়সা জমায় নি কালীপদ, টাকার জন্যই টাকা জমিয়েছে, কৃপণের মত জমিয়েছে ঐ টাকা। টাকার জন্য অনেক ফিকির করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু টাকাটা যখন বেশ মোটা হয়ে জমে উঠলো তখন কালীপদ ভাবতো কি করবে সে ঐ টাকা নিয়ে। জমাবার নেশা চেপে গিয়েছিল, তাই তখনো সে জমিয়েই চলছিল—কদর্য বস্তীতে থেকে, পেটে না-খেয়ে, গায়ে না-পরে জমিয়ে এসেছে টাকা। মাঝে মাঝে টাকার হিসাব করতো আর হাসতো—'অনেক টাকা তোমার জমেছে কালীপদ, এবার একটু বড়-মানুষী করে নাও—জীবনটাকে দিনকয়েক ভোগ করে নাও'—বলতো সে নিজের মনেই। তার অবচেতন মনে ভোগের বাসনা নিশ্চয় ছিল, নইলে সে একথা বলতো কেন! কিন্তু তার চেতন স্বত্বায় ভোগের লিপ্সা নিবে গিয়েছিল—জেলের হাড়গোড়-ভাঙা খাটুনী আর জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি ওকে মুক্ত করে দিয়েছিল পার্থিব বাসনা কামনা থেকে। তাই চেতন মনে সাধারণ কালীপদ ভাবতো, টাকাটা ভালো কোনো হাসপাতালে দান করে যাবে—নেতাজীর আজাদহিন্দ ফৌজ-ভাণ্ডার গঠিত হবার পর সে এই মাসদুত্তিন ভাবছে—ঐ ফণ্ডেই দান করবে টাকা—আজ ভাবলো ভাগ্যিস দান করে নি! তার কৃষ্ণা—তার আত্মজা দুহিতা রয়েছে।

পিতার কর্তব্যের আহ্বান কালীপদকে ত্বরান্বিত করে দিল। কাবুলের কারবার গুটিয়ে তাই সে বাংলার মাটিতে নেমেছে এসে আজই সকালে।

কালীপদ ভাবছিল—জীবন-যুদ্ধের সৈনিক সে। জীবনকে টিকিয়ে রাখবার জন্য দীর্ঘকাল সে সাধনা করেছে এবং আজ তার সাধনা,—তার জীবন-সাধনা সার্থকও হয়েছে—সার্থক করেছে ঐ মেয়েটি—ঐ কৃষ্ণা।

কাবুলের হাড়ভাঙা শীতে সে বহুদিন আগেই ভবলীলা সাঙ্গ করতো ; ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তার জীবন এখনো টিকে আছে, এবং কাবুলের স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায় সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে—এটা তার কন্যা কৃষ্ণার ভাগ্য নয়—তার নিজেরই সৌভাগ্য! দীর্ঘকাল পরে, জীবনের প্রান্তে এসে সে একটি মেয়ের বাবা হবে—একটি স্নেহনীড়ে তার আশ্রয়লাভ হবে—একটি পুষ্পপেলব বালিকা তার চোখের উপর নেচে নেচে ঘুরে বেড়াবে—আঃ!

দীর্ঘকাল পরে কালীপদের কণ্ঠে গান বেজে উঠলো :

……নেচে নেচে বেড়াবি মা রামধনুরঙ শাড়ী পরে—
আয়, আয় মুক্ত কেশে আয়……

রামধনুরং শাড়ী তো কৃষ্ণার জন্য আনা হয় নি! কালীপদ হাতের সুটকেশটা আর পিঠের বোঁচকাটায় একবার ঝাঁকানী দিল—কিন্তু শাড়ী আছে। রামধনুরং না হোক, আরো অনেক রংএর শাড়ী আছে—শাল আছে—সোনাও আছে কিঞ্চিৎ। কালীপদর কালো মুখখানা হাসিতে লাল হয়ে উঠেছে!—কিন্তু—কিন্তু কৃষ্ণা কি তাকে চিনতে পারবে! কৃষ্ণা বড় হয়েছে—কাকার কোলে মানুষ হয়েছে, হয়তো কাকাকেই বাবা বলে জেনেছে এতদিন। আজ তার সত্যিকার বাবাকে কি চোখে দেখবে কৃষ্ণা! সে তো আর দোলনায় শোয়া মেয়ে নয়—ফ্রকপরা খুকীও নয়, শাড়ী পরা তরুণী। সে কি কালীপদর কোলে এসে উঠবে আজ! সে কি কালীপদর কাবুলী চেহারা আর নোংরা বেশভূষা

দেখে ভয় পেয়ে তফাতে সরে যাবে না! না যাবে না। কৃষ্ণাই তাকে চিঠি লিখেছে আসতে, নইলে তো কালীপদ জানতোই না যে কৃষ্ণা নামে কেউ তার আছে! সাড়ে ছয় মাসের মেয়েটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল কালীপদ। কিন্তু তারাপদর উচিৎ ছিল আরো অনেক আগে কৃষ্ণার খবর তাকে জানানো। সে জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় গেল, এ-খবর আপন ভাই হয়ে তারাপদর কি নেওয়া উচিত ছিল না? নিশ্চয় ছিল—তারাপদ খুবই অন্যায় করেছে।

করেছে অন্যায়—কিন্তু মেয়েটাকে তো মানুষ করে তুলেছে। আঠারো বছরের করেছে তাকে। পিতৃস্নেহে পালন করেছে এই দীর্ঘ দিন! তারাপদ সত্যি ভাই—ভাই লক্ষ্মণ! কতদিন ওদের খবর নেয়নি কলীপদ। বড় বড় চোখে জলের বিন্দু জমা হচ্ছে ওর। কাবুলি মনটা আবার কোমল হয়ে বাংলার মনে নেমে আসছে নাকি! মাটির গুণ—বাংলার স্নেহশ্যাম মাটীর গুণ।

কিন্তু কালীপদ কৃষ্ণাকে কেড়ে নিতে যাচ্ছে না তো তারাপদর কাছ থেকে! আঠারো বছর যে কৃষ্ণাকে মানুষ করেছে, কৃষ্ণার উপর তারই তো দাবী বেশি! হ্যাঁ—নিশ্চয় বেশি। তবু কৃষ্ণা কালীপদকে চিঠি লিখেছে আসতে! হয়তো বাবাকে তার দরকার—হয়তো কেন, নিশ্চয় দরকার। কালীপদ হাঁটতে লাগলো!

দূরে গ্রাম দেখা যায়—মন্বন্তর আর মহামারীতে বিধ্বস্ত গ্রাম—কিন্তু কালীপদ ওসব খবর রাখে না। পয়সা খরচ করে খবরের কাগজ কিনবার মত লোক ছিল না সে এতদিন। কয়েকটা লোক যাচ্ছে গ্রামান্তরে। শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা—মেয়েগুলো আরো রোগা। কাবুলী কালীপদর মনে ধাক্কা লাগলো একটা। বাংলার মানুষরা খেতে পায় না নাকি! এরা তো দুচার দিনেই মরবে মনে হয়। কৃষ্ণাও

কি এমনি শীর্ণ—এমনি না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে গেছে? কৃষ্ণাকে দেখবার তাড়ায় কালীপদর পা-দুটো প্রায় ছুটতে লাগলো। ঐ তো গ্রাম, আর দশ মিনিটেই পৌঁছে যাবে কালীপদ।

মন্দার গ্রামটা বেশ বড়; ওর পাশ দিয়ে হিঙ্গুল নদী বয়ে গেছে, দূরে নীলাভ পাহাড় আর বন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শেষ প্রান্তে গ্রামটা। বিহারের আবহাওয়াই এখানে বেশী, তবু যায়গাটা বাংলা এবং বাংলার আইনকানুন এখানে বিশেষভাবেই চলতি—কাজেই মন্বন্তর, মহামারী, রেশন, এবং অরন্ধণের উপবাস থেকে এগ্রাম বাদ পড়েনি। নদীর ধারে গ্রাম, তাই ফসল এখানে প্রচুর ফলে, কিন্তু বাংলাদেশে যার ফসল তার ক্ষেত নয়, এবং যার ক্ষেত তারও ফসল নয়। তবুও চাষী-প্রধান গ্রামটা তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর কাটিয়ে তিপ্পান্নর গোড়ায় এসে পড়লো—যখন নেতারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হবার অশঙ্কায় ঘন ঘন বাণী ছাড়ছেন এবং পয়সাওয়ালারা ঐ একই আশঙ্কায় ঘন ঘন শস্য গোলাজাত করে ফেলছেন; দর চড়ছে, দুর্ভিক্ষ হবার আর দেরী নেই। যে দুর্ভিক্ষ না হয়েও পারতো, সেটা লম্বা লম্বা 'বাণীর' চোটেই হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের দরকার তারাপদর কুঁড়েঘরখানা। মন্দার গ্রামের মাঝামাঝি বামুন-পাড়ায় ওদের বাড়ী। ছিল বিঘে দুই আড়াই যায়গার উপর বাড়ীখানা কিন্তু যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-বড়লোক অশ্বিনী চক্রবর্তী তারাপদর কাছ থেকে অর্ধেক অংশ মাস দু'য়েক আগে কিনে নিয়েছে। কিনেছে সামনের দিকটা এবং সেখানে তার পাকাবাড়ী তৈরী আরম্ভ করে দিয়েছে। পিছনের অংশে তারাপদ একখানা মেটে ঘরে বাস করে।

ঘরটা আড়াই কাঠার বেশী নয়। তাছাড়া একটা ছোট রান্নাঘর—বাকীটা উঠোন। চারদিক কাঁটার বেড়া দেওয়া। উঠোনে একটা পাত্‌কো আছে, আর আছে অনেকগুলো গাছ—ফুল, ফল, লতার গাছ। বাড়ীর সামনের অংশে যে বড় ঘরখানি ছিল—কালীর সেইটাই মনে আছে, কিন্তু সে ওখানে পৌঁছে দেখলো—সে ঘর নেই, তার বদলে একটা পাকা ঘর তৈরী হচ্ছে তার ভিত্‌টাতে। অশ্বিনীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। কালীপদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না—ভাবলো, তারাপদই নিশ্চয় কিছু পয়সা করেছে এবং বাড়ী তৈরী করাচ্ছে, কিন্তু অশ্বিনী এখানে দাঁড়িয়ে কেন! অশ্বিনী কালীপদর থেকে বয়সে কিছু বড়। কালীপদ তাকে মুহূর্তে চিনতে পারলো কিন্তু অশ্বিনী তাকালোও না ওর পানে। কালী একটা রাজমিস্ত্রীকে শুধুলো তারাপদর বাড়ীটা কোন্ দিকে?

—ঐ হোউ দিকে—বলে মিস্ত্রী কন্নিটা তুলে সরু একটা পথ দেখিয়ে দিল। ঐ পাকাবাড়ীর জন্য জমাকরা ইটগুলো ডিঙিয়ে কালীপদ কোনক্রমে পিছনের দিকটায় এসে দেখলো, কাঁটার বেড়া দেওয়া যায়গাটায় বাঁশের তৈরী ফটক, তাতে তরুলতার গাছ লতিয়ে উঠেছে। ঠিক বৈরাগীর আখড়ার মত চেহারা বাড়ীটার। কালীপদ ভাবলো, কার নাম ধরে সে ডাকবে—কৃষ্ণা! নাকি তারাপদ? কৃষ্ণা যদি না আসে! কালীপদর প্রথম ডাক তার কন্যার কানে ব্যর্থ হবে? না—বিশ বছর আগের কবি কালীপদ আবার বললো—না! সে ডাক দিল—তারাপদ আছ বাড়ীতে? তারাপদ!

আধমিনিট দাঁড়িয়ে রয়েছে কালীপদ—যেন কত যুগ! আবার ডাক দেবে নাকি? কিম্বা বাড়ী সে ভুল করেছে? কিন্তু না, কে যেন আসছে! নীলাম্বরী পরা মেয়ে একটি—কালীপদ ফটকের ফাঁকে দেখতে

গেল—মাথায় ঘোমটা নেই, স্নানসিক্ত চুলের অরণ্যে সূর্য্যালোক ঝিলিক মারছে—কিন্তু গাছের আড়ালে মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না কালী। ঐ ও প্রান্ত থেকে আসছে মেয়েটি—ধীর মন্থর ওর গতি—কেন? কুরঙ্গীর মত ছুটছে না কেন?

—কাকে ডাকছেন?

মেয়েটি ফটকের ওপাশ থেকেই শুধুলো।

—তোমাকেই ডাকছি মা—খোল!—কালীর মুখে একটা অপরিসীম তৃপ্তির হাসি; কিন্তু মেয়েটি ফটক না খুলেই বললো,

—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

—আমি?—আসছি কাবুল থেকে—বলতে গিয়ে কালীপদ থেমে গেল। তার বাড়ী ভুল হয় নি তো! সত্যি সে কৃষ্ণার সঙ্গেই কথা বলছে তো! শুধুলো,

—তোমার নাম কি কৃষ্ণা? তুমি তো তারাপদর ভাইঝি!

—হ্যাঁ—আপনি....?

—খোলো মা,—আমি তোমার বাবা,—তোমার চিঠি পেয়ে ফিরে এলাম।

ফটকটা কখন খুললো আর কখন যে কৃষ্ণা কালীপদর বুকের উপর এসে পড়েছে, কালীপদর স্মরণ নেই। কৃষ্ণার চোখের জলটায় যখন তার জামা ভিজে বুকের পাঁজরায় লাগলো, তখন ওর খেয়াল হোল, দু'জনে পথেই দাঁড়িয়ে আছে। সুটকেশটা হাত থেকে পড়ে গেছে, আর চশমাটা চোখের জলে এমন ভিজেছে যে কালীপদ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটাকে টেনে নিয়ে কালীপদ ফটকের ভেতর ঢুকে পড়লো—তারপর সুটকেশটা আনতে আবার গেল বাইরে। কৃষ্ণা ততক্ষণে খানিকটা সামলে দাঁড়িয়েছে।

ভাতপোড়ার গন্ধে বাড়ীটা মসগুল হয়ে উঠেছে। ছুটলো কৃষ্ণা রান্নাঘরে। না—ভাত ধরেনি, ফেন উথ্‌লে উনুনে পড়েছে, তারই গন্ধ। হাঁড়িতে খুব খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে কৃষ্ণা ছুটে বেরিয়ে এল। বাবা তখন এসে এ ঘরের দাওয়ায় উঠে পিঠের বোঁচ্‌কাটা নামাচ্ছে। বুকের পকেটে কৃষ্ণার লেখা চিঠিখানা চোখের জলে ভিজে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণা জামাটা খুলতে খুলতে বললো—কাকা কারখানায় গেছে বাবা—বারোটা নাগাদ ফিরবে।

—কাকী—তোর কাকী কৈ? তোর খুড়তুতো ভাইবোন?

—নেই—কাকা তো বিয়ে করেনি!

—বিয়েই করেনি?

—না—কি করে করবে! তুমি জেলে যাবার পর নাকি ঠাকুরদা মারা যায়, তারপর আমাকে নিয়ে কাকার খুবই নাকি কষ্টে কেটেছে। আমি সে-সব জানি না বাবা—কাকাও বলে না, তবে গাঁয়ের লোক কিছুকিছু জানে।

কালীপদ বসলো একটা চৌকীতে। তারাপদ তার ভাই, কিন্তু এমন মহান ভাই, জানতো না কালীপদ। কৃষ্ণার জন্য তারাপদ এত বড় স্বার্থত্যাগ করেছে! আজীবন কুমার থেকে গেল? আশ্চর্য ত্যাগ!

কৃষ্ণা গ্লাসে চিনি ভিজিয়ে শরবৎ তৈরী করছে। দুটো গ্লাস নিয়ে ঢালা ওব্‌রা করছে সরবৎটা। হাতে ওর কাঁচের চুড়ি আর কানে দুটো জরী-বসানো সস্তা দুল। এতেই অনবদ্য হয়ে উঠেছে মেয়েটা! ওর মা'র থেকেও সুন্দর হয়ে উঠেছে ও। কৃষ্ণা নাম কেন দিল ওর কাকা? নামটা শুক্লা হলে কিছুই বেমানান্‌ হোতো না। কিন্তু কৃষ্ণা ভালই নাম। খুবই ভাল নাম। কালীপদ নির্নিমেষ চোখে মেয়ের চোখের কোণার বাঁকানো ভঙ্গীটি দেখতে লাগলো—ঠোঁটের

মাঝখানের খাঁজটুকু—গালের মসৃণ লাবণ্য—কানের কাছের ছোট ছোট চুলগুলি—গলার সূক্ষ্ম রেখা কয়টি। কী চমৎকার মেয়ে কৃষ্ণা! কালীপদর মেয়ে—যে কালীপদর কেউ কোথাও ছিল না—সুদূর কাবুলে ঘোড়ার আস্তাবলের মত একটা নোংরা যায়গায় যে শুকনো রুটি আর পোকা-খাওয়া ফল খেয়ে দিন কাটাতো; মরবার পর যে কালীপদকে আগুনে পোড়াবার লোক থাকবে না ভেবে মরতে ভয় করতো—সেই কালীপদর মেয়ে ও! সত্যি তো! স্বপ্ন দেখছে না তো কালীপদ!

কৃষ্ণা সরবতের গ্লাসটা দিতে এল কাছে, কালীপদ দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে পাঁচ বছরের খুকীর মত করে কোলে বসিয়ে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—মা—মা—তুই সত্যি তো আমার মেয়ে? আমি স্বপ্ন দেখছি না কৃষ্ণা? সত্যি বল!

মেয়েটার চোখ উপ্‌চে জল গড়াচ্ছে। গ্লাসের সরবতের খানিকটা পড়ে গেল। বাপের কথার উত্তর না দিয়ে সে বাকী সরবৎটুকু বাবার ঠোঁটের আগায় ধরে বললো—খাও বাবা।

কালীপদ একচুমুকে শেষ করে দিল সরবৎটুকু। জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—আজন্মের প্রত্যাশিত অমিয়। মানুষ কেন বেঁচে থাকে, কালীপদর থেকে আজ কেউ বেশী জানে বলে মনে করে না কালী। মানুষ বেঁচে থাকে এই এক ফোঁটা স্নেহের জন্য! এর থেকে বড় বন্ধন, এর থেকে বড় উদ্দেশ্য, এর থেকে বড় সাধনা মানুষের কি আর আছে?

কালীপদ মেয়েটার ভিজে চুলগুলো দিয়ে মুখ মুছে নিল একবার। ওর মা'র থেকেও লম্বা আর কালো চুল হয়েছে—ওর মা'র থেকেও মুখখানা সুন্দর হয়েছে। কালীপদ তাকিয়েই রইলো মেয়েটার দিকে!

—ভাত নামাতে হবে বাবা।—বললো কৃষ্ণা। ওর মুখের হাসি এই প্রথম ফুটলো; কালীপদ ওকে ছেড়ে দিয়ে বললো—যা, নামিয়েই চলে আয় এখানে।

—রান্নার এখনো সব যে বাকী বাবা?

—থাকগে বাকী—যা হয়েছে, তাই খাব আজ।

—কাকা সেই ভর্তি দুপুর রোদে আসবে বাবা, একটু ডাল না হলে কিছুই খেতে পারে না—মাছ তো নাই, তুমি কি খাবে বাবা?

—যা তুই দিবি মা—বলে কালী চাইলো মেয়ের পানে, বললো,—চল্ রান্নাঘরে—আমি বসে বসে দেখিগে।

কালীপদ সত্যি মেয়ের হাত ধরে সেই ছোট্ট রান্নাঘরে এসে উঠলো। কৃষ্ণা বললো—ঘরটায় বড্ড গরম বাবা! আর যা কালিঝুলি!

—হোক! তোর বাবা ওর থেকে অনেক বেশি কালি মেখেছে মা—ভাবিস কেন?

কালীপদ বসে পড়লো উনুনের কাছেই। কৃষ্ণা রান্না করছে আর গল্প বলছে। দুঃখের জীবনের গল্প তার, হেসে হেসেই বলছে কৃষ্ণা। তার কাকা তাকে নিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে—ধানজমিগুলোকে বেচতে হয়েছে এক এক করে। এতটুকু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কারখানার কাজে যেতে হয়েছে, কৃষ্ণার অসুখে অফিস কামাই করবার জন্য রেলের চাকরীতে জবাব হয়ে গেল। তারপর কিছুদিন বেকার থাকার পর এই কারখানার চাকরী—মাইনে খুব কম, কিছুই জমে না! শেষকালে অশ্বিনীবাবুকে বাড়ীর নিজের অংশটা কাকা সেদিন বিক্রী করে দিল—কাকা কেঁদেছিল সেদিন সারা রাত—আর সেই রাত্রেই কৃষ্ণা চিঠি লিখেছিল তার বাবাকে!

—কেন মা—এত কষ্টেও যে বাড়ী বেচেনি, সেটা সেদিন বেচলে কেন ?

—কেন আবার, গাঁয়ের লোক কাকাকে যা-তা বলে। 'অত বড় ভাইঝির বিয়ে দিতে পার না—মুখ দেখাও কোন লজ্জায়' - এই সব।

—বিয়ের ঠিক করেছে কিছু ?

—ওসব আমি জানি না বাবা—কাকা এলে শুধুবে—বলে কৃষ্ণা সলজ্জ হেসে উঠে গেল ওঘরে। হ্যাঁ, কৃষ্ণা বড় হয়েছে। এতক্ষণ সে খেয়ালই ছিল না কালীপদর। বড়ই তো হয়েছে কৃষ্ণা, বেশ বড়—বিয়ে তো এবার দিতেই হবে। এতকাল পরে একমাত্র কন্যাকে কাছে পেয়ে কালীপদ তাকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেবে! বুকখানা মোচড় দিয়ে উঠলো কালীপদর। নিশ্বাসটা হয়তো অনেকক্ষণ আটকে ছিল—সবেগে বেরিয়ে এল—বুকখানা খালি হয়ে যাচ্ছে যেন।

নিশ্চুপ বসে রইল কালীপদ। কৃষ্ণা ফিরে এসে ডালে ফোড়ন দিচ্ছে। বললো—তুমি এতকাল কি করছিলে বাবা ? কোথায় কোথায় ঘুরলে ?

—বলবো মা—সে অনেক কথা—অনেক দেশ-বিদেশের কাহিনী। তুই কতটা পড়েছিস মা ?

—পড়েছি। কাকা পড়ায় আমাকে। বাংলা তো ভালই শিখেছি, বাবা, ইংরাজীও পড়েছি কিছু কিছু! গল্প কবিতা পড়তে পারি আর খবরের কাগজও পড়ি আমি—কাকা শোনে।

—তোর কৃষ্ণা নামটা কে রাখলো রে মা ? কালী প্রশ্নটা করেই মেয়ের পানে চাইলো!

—কেন বাবা ? ভাল নাম নয় ? আমার খুব পছন্দ বাবা ঐ নামটি। কাকার কাছে শুনেছি—তুমি জেলে যাবার আগে 'প্রবাসীতে' একটা কবিতা পাঠিয়ে গিয়েছিলে, কবিতার নাম "কৃষ্ণা"—তোমার যাবার পর সেই কবিতা ছাপা হয়—তাই দেখে কাকা আমার নাম রাখে কৃষ্ণা। কবিতাটা তোমার মনে আছে বাবা ?

—না, মা—কবিতার কথা একদম ভুলে গেছি—কিন্তু তোর কাকা তোর নাম ঠিকই রেখেছে—আমারই পছন্দ-করা নাম।

—কবিতাটাও খুব সুন্দর বাবা—আমার মুখস্ত আছে—শুনবে ?

"কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারের অন্তরালে কে হাসিছে হাসি !
বিবস্ত্রা তুমি নহ কি কৃষ্ণা—লাঞ্ছিতা সতী-অশ্রুরাশি ?
কুরুক্ষেত্রে শোণিতের স্রোতে দুঃশাসনের রক্ত মাখি'
কবরী তোমার বাঁধনি কি আজো ?—প্রতিহিংসায় উগ্র আঁখি
আজো কি তেমনি প্রত্তি নারী বুকে অবিশ্রান্ত অনল ঢালে—
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা বিদ্রোহীবুকে বহ্নি জ্বালে... ?"

—মুখস্থ আছেরে মা তোর !—কালীপদর বিস্ময় বোধ হচ্ছে। এতো বিস্ময় জীবনে কমই অনুভব করেছে কালীপদ। তার একটা কবিতা,—তার একটা অতি তুচ্ছ কবিতা মুখস্থ করে রেখেছে তারই মেয়ে—তারই আত্মজা দুহিতা !—কী মিষ্টি যে লাগছে ওর কণ্ঠের আবৃত্তি! মানুষ অমৃতের সন্ধানে ফেরে—অমর হতে চায়—কিন্তু সে কেন বোঝে না অমৃত তার গৃহনীড়েই সঞ্চিত আছে—অমরত্ব আছে তার সন্তানের মধ্যে ! কালীপদ দুচোখ বুজে দুকান খুলে শুনে গেল কবিতাটি। তার হারানো সম্পদ যেন তার উত্তরাধিকারী রক্ষা করছে, এমনি অনুভাব জাগছে মনে ওর।

—জানো বাবা—কাকা প্রতি শনিবার এই কবিতা আমাকে দিয়ে বলায় আমাদের মেয়েদের মিটিংএ…. ।

—মেয়েদের মিটিং ? কিসের মিটিং রে মা ?

—ওহোঃ ! তোমাকে বলাই হয় নি বাবা ! কাকা যে দেশসেবক। ঐ কারখানার শ্রমিকদের নেতা কাকা। জানো বাবা, হপ্তায় দু'দিন এইখানে, ঐ উঠোনে মিটিং হয়, অনেক রাতে ! আর আমাদের মেয়েদের মিটিং হয়—শনিবার বিকেলে। ওদের কাছে কাকার এত খাতির বাবা যে রাজাও অত খাতির পায় না ! কাকার পাল্লায় পড়ে কারখানার মালিকরা খুব সোজা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন……..

কিন্তু কালীপদ শুনছিল না। ওর মনের চিন্তাটা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে অকস্মাৎ। দেশসেবা খুব ভাল বস্তু হ'তে পারে—কিন্তু বিপদ যে অনেক ওপথে ! তারাপদ তার একমাত্র ভাইঝির নিরাপত্তার সম্বন্ধে সচেতন তো নয়ই—উপরন্তু তাকে দিয়ে মেয়েদের মিটিংএ কবিতা বলায় ! —বক্তৃতা করায় ! যদি কোনো বিপদ ঘটে কোনো দিন ? নাঃ—কালীপদ তার মেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবে—ছোট লোকদের সঙ্গে মিশে তারাপদ যা ইচ্ছে করুক—কৃষ্ণার গায়ে তার আঁচড়ও যেন না লাগে। কালীপদর ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণা বললো,—কাকা আমার সত্যি নেতা হবার মত মানুষ বাবা—কাকা মনে করলে এই জেলাটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কাকা এতো ভালমানুষ যে, দেখনা, অশ্বিনী বাবুকে বাড়ীটা বেচে দিল। ধনিকদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কাকা নিজেই বলে ; দলের সবাই বারণও করেছিল—কিন্তু কাকা বললো, —'টাকার যখন দরকার, এছাড়া উপায় কি ? চুরি ডাকাতি ত করতে পারি না। ধনিক ততদিন থাকবেই যতদিন শ্রমিক-শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে ওদের লুপ্ত না করে।'

ডাল নেমে গেছে। কৃষ্ণা উঠে ওঘরে যাচ্ছে। কালীপদ বললো,
-হুঁ—একবাটি চা কর তো মা, খাই।

নিস্তব্ধ রাত্রে একটি একটি করে লোক আসতে লাগলো উঠোনে। কালীপদ ঘুমিয়ে গেছে কিন্তু কৃষ্ণা আছে জেগে। তারাপদ এখনো বাড়ী ফেরে নি। অবশ্য ভাইএর সঙ্গে দুপুরে তার দেখা হয়েছে, তবে কথা বিশেষ হয় নি—তারাপদ অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল কালীপদ কিন্তু উত্তরটা তারাপদ এড়িয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসার জন্য কালীপদর শরীর ক্লান্ত এবং রাত্রিও অনেক হয়েছে। সে ঘুমিয়ে গেছে কন্যার হাতের সেবাযত্ন—তার—"ঘুমাও বাবা—লক্ষ্মী বাবা, ঘুমিয়ে যাও"—বলার মধুর আব্দার শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছে কালীপদ—বেশ গভীর ভাবেই ঘুমুচ্ছে।

উঠোনটা ভরে উঠলো শ্রমিকের দলে। কৃষ্ণা অভ্যর্থনা করছে তাদের। কিন্তু কেউ-ই সরব নয় এরা। ওদের বাক্য বিনিময় হচ্ছে ইঙ্গিতে। হয়তো আজকার অধিবেশনটা অত্যন্ত জরুরী এবং অত্যন্ত গোপনীয়। কৃষ্ণাকে নিশ্চয় অধিবেশনের কথা জানিয়ে গিয়েছে তার কাকা, নইলে সে এত রাত অবধি জেগে আছে কেন! প্রায় সকলেই এসে গেল সাড়ে-বারোটার মধ্যে। কিন্তু তারাপদ এখনও পৌছায় নি; সবাই অপেক্ষা করছে। একশ' জনের উপর মানুষ উঠোনের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। একশ' ফিট দূর থেকেও কেউ বুঝতে পারবে না যে ওখানে এত লোক রয়েছে। ওদের নিয়ম-শৃঙ্খলার সত্যি প্রশংসা করতে হয়।

তারাপদও এসে পৌছালো একটা সাইকেলে—ওর পেছনে আরেক জন—সেও সাইকেলে। সাইকেল দুটো সাবধানে ঠেসিয়ে রেখে ওরা চলে এল মিটিংএর মাঝখানে। এতক্ষণে কৃষ্ণা একটা রক্ত পতাকা তুলে দিল একটা বাঁশের ডগার মাথায়। হাত তুলে সবাই সম্মান জানালো সেই পতাকাকে

ওদের অধিবেশন আরম্ভ হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর ওদের অত্যন্ত নীচু—কথাও খুব কম বলছে ওরা—বেশির ভাগ কথাই ইঙ্গিতে আর মুখের অদ্ভুত শব্দে চলছে, কিন্তু মাঝে মাঝে উত্তেজিত কথাও বেরিয়ে পড়ছে কারো কারো ঃ—"আর অপেক্ষা নয়"—"এবার মরণ পণ"—'করেঙ্গে কি মরেঙ্গে'—ইত্যাদি কথা উচ্চারিত হচ্ছে বেশ জোরেই।

—আমি বলছি—আর তিনটে দিন তোমরা সবুর করো—তারাপদই বললো কথাটা!

—বেশ—কিন্তু তুমি কি মনে করো, তিনদিনের মধ্যে আমাদের দাবী মিটাবে ওরা?

—না—আমাদের সর্ত্তগুলো যাচাই করতে ওদের আরো তিন দিন সময় চাই!

—পনর দিন তো হোল!

—তা হোক—এ তিনদিন বোঝার উপর শাকের আঁটি—কিন্তু তারপর মনে রেখো, মৃত্যুভয়েও পিছুতে পারবে না!

—আমরা কোনো দিনই পিছুই না।

—ঠিক?

—ঠিক—ঠিক—ঠিক!

অনেকগুলো শব্দ উঠলো একসঙ্গে। সভা ভঙ্গ হোল। এক মিনিটের মধ্যেই উঠোনটা জনশূন্য হয়ে গেল—রইল তারাপদ, কৃষ্ণা আর

অশনি। অশনি তারাপদর হাত—ঐ কারখানাতে। চাকরী করে। সবাই চলে গেলে পর অশনি নীচু গলায় শুধালো,

—আমি কি যেতে পারি এবার ?

—হ্যাঁ—শোনো, দাদা এসেছে—আমার দাদা—গত আঠাশ সালে যার জেল হয়েছিল।

—ও—কোথায় তিনি ?

—ঘুমুচ্ছে—শোনো, ঐ যে সামনের জমিটা বিক্রী করে দিলাম, দাদা শুনে খুবই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু আমি বলেছি তাঁকে যে কৃষ্ণার বিয়ের জন্য টাকার দরকার, তাই বেচেছি !

—সেটা তো সত্যি নয় ?

—কিছুটা সত্যি !—তারাপদ আধ মিনিট ভাবলো—তারপর বললো—ও ছাড়া আর কিছু বলা তখন উচিত হোত না—দুপুর বেলা অত সময়ও ছিল না আমার। কিন্তু কাল ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। টাকার আমাদের বড্ড দরকার অশনি, দাদা হয়তো কিছু টাকা এনেওছে, কিন্তু আমাদের মতে আর পথে সে মোটে বিশ্বাস করে না এখন আর। যদি দরকার হয়, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও গিয়ে উঠতে হবে।

একটা মুহূর্তের জন্য অশনির অন্তরটা কেমন যেন রক্তরাঙা হয়ে উঠলো, বললো—আর কৃষ্ণা দেবী ?

—সে থাকবে তার বাপের কাছে !

অশনির অন্তরটা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল।

—হয়তো কালই আমি যেতে পারি—আচ্ছা, তুমি যাও আজ !

অশনি একবার চাইলো দুজনার পানে, তারপর ধীরে ধীরে এসে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর তারাপদ কৃষ্ণাকে বললো—রাত হয়ে গেছে মা কৃষ্ণা, যা, শো গিয়ে !

—যাই—তুমি আর কিছু খাবে না কাকা ?

—না—বলে তারাপদ এসে বারান্দার একপাশে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো। কৃষ্ণাও এলো ভেতরে—কিন্তু ওর পা যেন চলতে চায় না—মন যেন কোন্ অতল তিমির-তলে ডুবে যাচ্ছে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা নিজের বিছানায় শুলো, কিন্তু অন্ধকারের অন্তরে যে ভগবান জাগ্রত থাকেন, তিনি দেখছেন—ওর চোখে জল।

কালীপদ ঘুমুচ্ছিল নিঃসাড়ে। শরীর খুব ক্লান্ত ছিল ওর। কিন্তু নতুন যায়গায় নিদ্রা মানুষের প্রায়ই একটানা হয় না। তারপর কদর্য্য বিছানায় শুতে অভ্যস্ত কালীপদ আজ কৃষ্ণার হাতের তৈরী সাদা ধপধপে নরম বিছানায় শুয়ে যেন অতিরিক্ত আরামের অস্বস্তি অনুভব করছিল। ঘণ্টা তিনেক ঘুমোনোর পর হঠাৎ তাই ওর ঘুমটা গেল ভেঙে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখতে পেল উঠোন-ভর্ত্তি লোক—তার দলপতি স্বয়ং তারাপদ এবং কৃষ্ণাও সেখানে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসাবেই রয়েছে মনে হয়। তারাপদর বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সে এখনো বিশেষ কিছু শোনে নি! রেলের চাকুরী যাওয়ার পর তারাপদ নদীর ওপারের ঐ বিরাট্ কারখানার চাকরী নিয়েছে। সেখানে শ্রমিক সঙ্ঘ তৈরী করেছে আর শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এতে এমন কিছু দোষ আছে বলে তখন মনে করেনি কালীপদ—কিন্তু এখন এই গভীর রাত্রে তার বাড়ীর উঠোনে ঐরকম একটা গুপ্ত সভা, ফিস্‌ফাস্ ইঙ্গিত ইত্যাদি দেখে সে বিশেষ রকম ঘাবড়ে গেল। তারপর ওদের সভা-শেষের কথাগুলি শুনে সে বুঝতে পারলো—গভীর কোনো একটা ষড়যন্ত্রে তারাপদ লিপ্ত আছে।

সভা ভঙ্গের পর অশনির সঙ্গে তারাপদর কথাও শুনলো সে—মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য তাহলে তারাপদ বাড়ী বিক্রী করেনি—বিক্রী করেছে এই শ্রমিক সঙ্ঘের প্রয়োজনে, কিম্বা এই রকম কোনো কিছুর জন্য! কালীপদর কাবুলী মনটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। উত্তেজনায় উঠে বসলো সে বিছানায়। কোন্ উদ্দেশ্যে তারাপদ বাড়ীর অর্দ্ধাংশ বিক্রী করেছে?—বিক্রী করবার কী অধিকার তার আছে? বাড়ী পৈত্রিক—এখনো তাদের দুইজনের সম্পত্তি, সেটা ভাগাভাগি না-হওয়া পর্য্যন্ত তারাপদ তো তার অংশ বেচতে পারে না! সামনের দিকটা অশ্বিনীবাবু কিনেছে, কিন্তু কালীপদ ঐ সামনের দিকটাই নিজের ভাগে পেতে চায় এবং দরকার হলে মামলা করে কালীপদ আদায় করবে অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে ঐ অংশটা! কাল সকালেই সে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবে। ভাবতে ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো কালীপদর কাবুলী-মন। যে কালীপদ জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের এক পার্ব্বত্য প্রান্তে প্রব্রজ্যা নিয়েছিল, যার জীবনে কোনো আশার আকাঙ্ক্ষা এতোটুকু ঝিলিক্ মারে নি আজ দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর, সেই কালীপদ ঘোরতর সংসারীর মত ভাবতে লাগলো, অশ্বিনীবাবুকে কোন্ প্যাঁচে ফেলে জব্দ করা যেতে পারে—তারপর সামনের ঐ জায়গাটুকুতে কি রকম কায়দায় বাড়ীখানি সে বানাবে—কিন্তু এসব ভাবনাকে অতিক্রম করে ওর পিপাসাটা প্রবল হয়ে উঠছিল। নুতন আগন্তুক সে এ বাড়ীতে, জল কোথায় আছে, জানে না—বাধ্য হয়ে ডাক দিল—কৃষ্ণা! ঘুমুলি রে মা?

—না বাবা, যাই—সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল কৃষ্ণা। কিন্তু ওর গলার আওয়াজটা ভারী ভারী,—হয়তো ঘুম্ ধরেছে, কিম্বা—কি জানি, মেয়েদের গলার স্বর বহু রকমের হয়ে থাকে—বহুকাল শোনে নি

কালীপদ। ঘুমের সময় মেয়েটাকে না ডাকলেই ভালো হোত, কিন্তু কৃষ্ণা উঠে এসে দাঁড়ালো, বললো—কি বাবা ?—ঘুম ভেঙে গেল ?

— হ্যাঁ মা—জল দে তো এক গ্লাস !

—জল আমি দিয়ে রেখেছি বাবা—ঐ যে—বলে কৃষ্ণা এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে ! কোমল একটা হাতের মত জ্যোৎস্নার রেখা এসে পড়েছে জানালা দিয়ে—তারই দীপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট একটি গোল তেপায়ায় একটি মাজাঘসা গেলাস—তার উপর একটা কাচের প্লেট চাপা দিয়ে জল রেখেছে কৃষ্ণা। গেলাসটা তুলে এনে দিল ওর হাতে, —খাও বাবা !

জল তো নয়—অমৃতধারা। কাবুলের রাত্রিতে জলপিপাসা পেলে কালীপদকে কি ব্যবস্থা করতে হোত, মনে পড়ে গেল। মেয়েটার শাড়ীর আঁচলটা মেঝেতে লুটিয়ে যাচ্ছে—কালীপদর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল সেটা সড়সড় করে—কে যেন কোমল পুষ্পরাশি দিয়ে পূজো করছে ওর দুটি পা, জলটা চোঁ চোঁ করে খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে বললো, —এতো রাত অবধি জেগে আছিস কেন মা ? তোর কাকা ঘুমিয়েছে ?

—হ্যাঁ বাবা—আমারও ঘুম পাচ্ছে—তুমি ঘুমাও।

—যা !—কালীপদ বিছানায় শুলো। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল কৃষ্ণা ; কৃষ্ণার বিছানাটা বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার তো ? না কি খুব নোংরা ছেঁড়া বিছানায় শোবে কৃষ্ণা ! কালীপদর দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। হয়তো ঘরের সব ভাল বিছানাগুলো বাবার জন্য পেতে দিয়ে কৃষ্ণা ছেঁড়া চটে শুয়ে আছে। তাই তার ঘুম আসছে না।—কিন্তু না, কালীপদর মনে পড়ে গেল, কৃষ্ণার না ঘুমোবার কারণ রয়েছে। ঐ মিটিংটার জন্যই ওদের দেরী হয়েছে, আর কৃষ্ণা ছেলেমানুষ, মিটিংএর কথাবার্তা শুনে মনটা ওর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হয়তো !

কালীপদ শুলো বিছানায়! রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে উঠোন থেকে। রাত যত বাড়ে গন্ধটা যেন ততই বাড়ে ঐ ফুলগুলোর—কী চমৎকার গন্ধ! উঠোনের গাছপালা আর কাঁটার বেড়ার পানে চাইল কালীপদ—জ্যোৎস্না ফুটেছে—উঠোনটা মনোরম হয়ে উঠেছে—আবছা ছবির মত মনে হচ্ছে; এতো সুন্দর দেখাচ্ছে যে কালীপদর মনে হোল—উঠে খানিকটা বেড়িয়ে আসবে নাকি বিশ-বছরের রোমান্টিক কালীপদর জীবনে আবার ফিরে এলো কালীপদ—তখন এই উঠোনে ফুলের গাছ ছিল না—ধান শুকোবার জন্য উঠোনটা ফাঁকা রাখা হোত—গোবর দিয়ে নিকিয়ে মসৃণ করে রাখা হোত. কিন্তু তারও একটা সৌন্দর্য্য ছিল—আর সেই সুন্দর উঠোনে ছিল একটি সুন্দরী বধূ—কৃষ্ণার মা! কালীপদ একবার মনে করতে চেষ্টা করলো তার মৃতা পত্নীর মুখখানি—না, সে পারলো না—তার মালিন্য-সুন্দর মুখখানা কৃষ্ণার কুমারী-স্নিগ্ধ মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্বে আজ একটিমাত্র মেয়ের মুখ মনে আসছে কালীপদর—সে কৃষ্ণা। এই বিশ্বসংসারে কৃষ্ণা ছাড়া আর কেউ আছে বলে মনে করতেও চেষ্টা করছে না সে। কৃষ্ণা তার মা'র স্মৃতিকণা, কালীপদর অন্তরে যার স্মৃতি চিরজাগ্রত থাকবার কথা ছিল; কিন্তু কালীপদ একেবারে ভুলে গিয়েছিল। বিবাহিত জীবনের কোনো কথাই কোনোদিন ও ভাবতে চেষ্টা করেনি এই দীর্ঘ আঠারো বছর। আজ সেই হারানো স্মৃতিটা অতিশয় প্রখরভাবে জ্বলছে, তাই কালীপদর মনের চোখে ধাঁধি লেগে যাচ্ছে যেন।

কিন্তু কৃষ্ণাকে সে পেয়েছে—তার মা'র কথা ভেবে দুঃখ করবার কোনোই প্রয়োজন আজ নাই কালীপদর—যদিও দুঃখ তার হচ্ছে। কালীপদ নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে তার কাছে, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা

অপার্থিব স্নেহের বন্ধন কালীপদর জন্য রেখে গেছে। নিজে সে না থাক্, সে এমন কিছু রেখে গেছে—কালীপদর কাছে যা অতুলনীয় অমূল্য, অমৃত-স্বরূপ।

কৃষ্ণা কি ঘুমিয়ে গেল নাকি! বিয়ের সময় তোলা ওর মা আর কালীর একখানি ফটো যেন ছিল মনে হচ্ছে। কৃষ্ণা কি সে ফটোটা যত্নে রেখেছে! সকালেই শুধুবে কালীপদ—আজ ঘুমাক কৃষ্ণা। সারাদিনটা কি প্রাণান্ত খাটনিই না খাটে! নাঃ, ওকে অত কাজ একলা করতে দেবে না কালীপদ, ঝি রেখে দেবে কালই একটা। টাকা কিছু আছে—আরো, আরো যদি বেশি টাকা থাকতো? লক্ষ লক্ষ টাকা পেলেও আজ কালীপদর আশা মিটবে না, অথচ এই কালীপদই কয়েকদিন পূর্ব্বে ভাবতো, টাকাগুলো নিয়ে সে করবে কি! আশ্চর্য্য মানুষের মন—কালীপদ হাসলো।

গভীর রাত্রির একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য আছে। অসুস্থ ছেলের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মা যেমন প্রশান্ত মুখে বলেন—'ভয় কি, সেরে যাবি—ঘুমো।' অথচ মায়ের উদ্বেগই থাকে বেশী ছেলের চেয়ে—ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে কালীর। কৃষ্ণা ঘুমুচ্ছে—কৃষ্ণার ভবিষ্যতের জন্য সব রকম ভাল ব্যবস্থাই করে দেবে কালীপদ—কিন্তু কি করে করবে—কেমন করে করবে? আরো, আরো, অনেক টাকা যদি থাকতো কালীপদর! থাকবে—থাকতে হবে—কালীপদ এইখানেই এমন একটা কিছু ব্যবসায় করবে যাতে অবিলম্বে মহাধনী হয়ে উঠতে পারবে সে। পুঁজী তার আছে—তার জন্য আটকাবে না।

কিন্তু কালীপদ একদিন ভালো লেখাপড়া শিখেছিল, তাই অন্য একটা দিকও না ভেবে সে পারলো না। এই কিছুক্ষণ আগে সে দেখেছে—পুঁজীবাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত আক্রোশ—ধনিক ও বুর্জোয়াদের

সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য—আভিজাত্যের অসারতার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা এবং তার বক্তা আর শ্রোতাদের মধ্যে ছিল তারই আত্মজা দুহিতা, যার জন্য কালীপদ ধনী হতে চায়—অভিজাত হতে চায়—অতি সাধারণ হয়ে থাকতে চায় না। কিন্তু কালীপদ হেসেই উড়িয়ে দিল এ ভাবনা। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিহীনদের এই যে আক্রোশ, এর মূলে রয়েছে পুঁজি তাঁদের না-থাকার ঈর্ষা। তারাও প্রত্যেকে পুঁজিপতি হতে চাইছে—না—তারা সবাই সমান হতে চাইছে—সারা পৃথিবীকে সবাই সমান ভাবে ভাগ করে নিতে চাইছে—অর্থাৎ ওরা চাইছে যে কারো থেকে কেউ বেশি সুখে, বেশি আরামে থাকতে পাবে না—বেশি ভাল খাবার খেতে পাবে না;—তারপর ওরা দাবী করবে, বেশী স্বাস্থ্যবান এবং বেশী সুন্দর হতে পাবে না—বেশী বুদ্ধিমান বা বেশী চিন্তাশীল হতে পারবে না—এমন কি বেশী খিদে এবং বেশী ঘুমও হয়তো ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে! কিন্তু কালীপদ এখনো ঠিকমত জানে না কি ওরা চায়!—ওরা যাই চাক না, কালীপদর মত এবং পথ ভিন্ন—তাকে ধনী হতে হবে—তার একমাত্র কন্যাকে গরীব রাখতে সে পারবে না। কালীপদ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেল।

উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল কালীপদর। কৃষ্ণা ঘরের কাজ করছে, ক্লান্ত বাবা বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে দেখে সে ডাক দেয় নি। তারাপদ এত সকালেই বেরিয়ে গেছে। কৃষ্ণা গাড়ুতে জল, দাঁতনকাঠি, জিবছোলা সব ঠিক করে রেখে দিয়েছে। কালীপদ উঠেই দেখতে পেল। সকালে উঠে ঈশ্বরের নাম বহুকাল করেনি কালীপদ—আজ যেন আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা

দুর্গা'…কিন্তু কালীপদ চিরকালের নাস্তিক। একদিন দেশমাতা ওর পূজ্যা দেবী ছিল, তারপর এতদিন ও নিজেরই পূজা করে আসছিল—অর্থাৎ লোকাতীত কোনো কিছুর উপর কিছুমাত্র আস্থা ওর ছিল না। আজ কিন্তু মনে হোল—ঈশ্বর করুণাময়, নইলে কালীপদর মতন একটা ছন্নছাড়া মানুষের জন্য এমন স্নেহের অমৃত তিনি সঞ্চিত রাখলেন কেন? তিনি আছেন—তিনি মানুষকে সব সময় কৃপা করছেন।

হাতমুখ ধুয়ে এসে কালীপদ দেখলো—চা-জলখাবার নিয়ে কৃষ্ণা বসে রয়েছে। কালীপদ শুধুলো—তোর কাকা কি এর মধ্যে কাজে গেছে মা?

—না বাবা, কাকা অশ্বিনী বাবুদের বাড়ী গেল। এখুনি আসবে। চা খাও!

—কেন? সকালেই অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে কি জন্যে?

—কি জানি, টাকাকড়ি কিছু পাওনা আছে হয়তো—বলে কৃষ্ণা চা এগিয়ে দিল।

কালীপদ বুঝলো—কৃষ্ণা সবই জানে, বলতে চায় না। কাকাকে যে কৃষ্ণা অত্যন্ত ভালবাসে, এটা কালী গত কালই টের পেয়েছে। আর কৃষ্ণা এতকাল তো তার কাকাকেই পৃথিবীতে একমাত্র আত্মীয় বলে জেনে এসেছে, ভালবাসবে না কেন! কিন্তু অশ্বিনীবাবু কি বাড়ী কেনার টাকা আজো আদায় দেয় নি তারাপদকে! ভাবতে ভাবতে চা খাচ্ছে কালীপদ, তারাপদ ফিরে এল।

—কোথায় গিয়েছিলি রে?—শুধুলো কালীপদ ভাইকে।

—অশ্বিনীর ওখানে—বলে বসলো তারাপদ, তারপর বললো—খুকীর বিয়ের জন্যই বাড়ীটা বেচেছি আমি। আমার আর কোনো উপায় ছিল না দাদা!

—কত টাকায় বেচলি ? টাকা সব পেয়েছিস তো—নাকি বাকি আছে ?

—মাত্র পাঁচশো টাকা দাম হোল অৰ্দ্ধেকটা বাড়ীর। দুশো টাকা পেয়েছি, এখনো তিনশো বাকি আছে !

—সে কি রে ! দলিল রেজিষ্টারী হয়েছে ?

—না—তাই বলতে গিয়েছিলাম যে কালপরশুর মধ্যে যেন রেজিষ্টারী করিয়ে নেয়। তোমাকেও একটা সাক্ষী হতে হবে ঐ দলিলে।

কালীপদ মিনিটখানেক চুপ করে রইল, তারপর আস্তে ঢোঁক গিলে বলল,—কিন্তু বাড়ী যদি আমরা না বেচি ? বাড়ীটা পৈতৃক—এখনো তোতে আমাতে ভাগ তো হয় নি। ঐ অংশটাই যদি আমি দাবী করি ? তার চেয়ে যে টাকা যা দিয়েছে, ফিরিয়ে নিক, বাড়ী আমাদের বেচার দরকার হবে না।

—কিন্তু—তারাপদ একটু ভেবে বললো—দলিল লেখাপড়া হয়েছে, দুশো টাকা আমি নিয়েছি, আর অশ্বিনীবাবু কোঠাবাড়ী করবার জন্য ভিৎ খুঁড়ছে—এখন কি ওরকম কথা বলা ভালো হবে দাদা ?

—নিশ্চয় ভাল হবে। তুই না বলতে পারিস, আমি বলবো। বাড়ী বিক্রী করা হবে না !—কয়েক ঢোক চা ঘন ঘন খেয়ে কালীপদ আবার বললো,—খুকীর বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে ? পাত্র কোথাও ঠিক করেছিস্ ?

কৃষ্ণা উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। তারাপদ কি যেন ভাবছিল, বলল,—পাত্র ? অত কম টাকায় রাজা-জমিদার কোথায় পাব ! আমারই একটি জানা-শোনা ছেলে আছে, এখানেই চাকরী করে। তারই হাতে দিতে চাইছিলাম ; অবশ্যি এখনো কিছু পাকা হয় নি !

—কেমন ছেলে ? কত টাকা মাইনে পায় ?

—ছেলে মজুর। হপ্তায় টাকা পনর করে রোজগার করে। তবে ভাল কাজ শিখছে, ওয়েল্ডিংএর কাজ—ভবিষ্যতে ভাল রোজগার করবে। আর এদিকে আই. এ. পাশ।

প্রায় একটা মিনিট কালীপদ গম্ভীর হয়ে রইল—চা খাওয়া হয়ে গেছে—তবু সে চায়ের বাটিটা ধরে আছে মুখের কাছে। তারাপদই বললো আমতা আমতা করে,

—ছেলেটি ভাল বলেই আমার ইচ্ছে খুকীকে তার হাতে দেওয়া—তুমিও দেখবে তাকে।

—নাঃ—কালীপদর কণ্ঠস্বরটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কঠোর হয়ে বেরুলো; কিন্তু ছোট ঐ 'না' শব্দটুকুর অর্থ তারাপদ তখনো বুঝে নি, সে ভাবলো পাত্রটিকে দেখবার ইচ্ছা দাদার নেই—তাই 'না' বলেছে। খুসী হয়েই সে তাই বললো,

—আমার মনে হয়—খুকী এতে সুখী হবে—আর মেয়ের সুখের জন্যই বিয়ে দেওয়া।

- না—গম্ভীর আওয়াজ বেরুলো কালীপদর গলা থেকে। তারাপদ এতক্ষণে 'না' শব্দটার অর্থ আন্দাজ করতে পারছে যেন। কিন্তু কিছুই তার ভাবতে হোল না। কালীপদ বললো—ওয়েল্ডিং মিস্ত্রীর হাতে মেয়ে দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নিজে তুমি ঐ সব মিস্ত্রীদের নিয়ে দল পাকিয়ে বেড়াচ্ছো,—লীডার হয়েছো—তাই তোমার মনে এই রকম ছোট কল্পনা জাগে। মিস্ত্রী মানেই ছোটলোক।

—মিস্ত্রী মানে মানুষ—ছোটলোক কথাটা তুমি প্রত্যাহার করো দাদা। মেয়ের বিয়ে তোমার যেখানে ইচ্ছে দিতে পার—কিন্তু মানুষকে হতশ্রদ্ধা করো না।—তারাপদর কণ্ঠে জ্বালা।

—শ্রদ্ধাভাজন হবার কোন্ কাজ করছো তোমরা! দল পাকিয়ে কতকগুলো বড় বড় কথা—তাও সবই রাশিয়ার কয়েকটা পুঁথী থেকে ধার করা—তাই দিয়ে তোমরা মনে করো, পৃথিবী শাসন করছো? ভুল! ওর কোনো সার্থকতা নেই।

—আছে—তারাপদ ধীরে ধীরে বললো—শ্রমিকের দাবী অগ্রাহ্য করবার শক্তি আজকার শ্রমযুগে কারো নেই। নিখিল বিশ্ব-শ্রমিক-সম্মেলনে····

—থামো তারাপদ—কালীপদ চীৎকার করে উঠলো—নিখিল বিশ্ব-শ্রমিক সম্মেলনের সঙ্গে পরাধীন ভারতের অশিক্ষিত নির্ব্বোধ শ্রমিকদের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, যোগসূত্রও নাই। আর সেটা থাকলেও তোমরা চতুর্ভূজ হোতে না। কিন্তু যাক সে কথা—কৃষ্ণার বিয়ে আরো ছয়মাস বা একবছর পরে দিলেও কিছু ক্ষতি হবে না; উপস্থিত জরুরী দরকার বাড়ীর সামনের দিকটা অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া।

—যদি তিনি না রাজী হন!

—রাজি তাকে হতেই হবে, কারণ আমাদের দুভাইএর মধ্যে বাড়ী এখনো ভাগ হয় নি, কাজেই তোমার অংশ কোন্টা, তাও ঠিক হয় নি। বিক্রী করবে তুমি কেমন করে? যদি অশ্বিনীবাবু টাকা না ফেরত নেন—তাহলে, তিনি বাড়ীর এই পিছন দিকটা নেবেন—সামনের জমি আমি ছাড়বো না।

বলেই কালীপদ উত্তেজিত ভাবে চায়ের বাটিটা সজোরে নামালো মাটিতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কোথায় রে মা কৃষ্ণা, আমার ফতুয়াটা দেতো!

কৃষ্ণা আস্তে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে, মুখখানা নীচু দিকে। ওর চুলগুলো খোলা রয়েছে। হয়তো স্নান করবার জন্য তেল মাখছিল।

কালো কোঁকড়া চুল ঢেউ খেলে যাচ্ছে পিঠের উপর। চলার ভঙ্গীটা ধীর, তাই শান্ত-সমাহিত ভাব দেখাচ্ছে ওকে। অন্তরের চিন্তা অন্তঃশীলা। কালীপদর মনটা অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য উত্তেজিত ছিল—নইলে কৃষ্ণার এই মূর্ত্তি দেখে সে নিশ্চয় গান ধরতো—"আয় মুক্ত কেশে আয়........"

কৃষ্ণা বাবার ফতুয়াটা বের করে দিল এসে। গায়ে চড়িয়ে কালী বললো—তুই কাজে যাবি কখন ?

তারাপদ সাইকেলের চাকায় হাওয়া দিতে দিতে বললো—এই তো যাচ্ছি।

—ফিরবি কখন ?

—বারোটায়।

কালী আর কিছু শুধুলো না, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—মা-মণি !—তারাপদ ডাকলো।

—কাকা !—কৃষ্ণা এসে দাঁড়ালো ওর কোলের কাছে। কাঁদছে নাকি মেয়েটা ! সাইকেলের যন্ত্রগুলো ফেলে দিয়ে তারাপদ ওর চিবুকে হাত দিল—তুলে দেখলো মুখখানি—বললো,—মুখ শুকিয়ে কেন মা ! ভয় কি রে—ভাবনা কি তোর ! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তোর কোনো অমঙ্গল হতে দেব না।....মা ! কৃষ্ণা ! খুকু !

—জানি কাকা !—বলতে বলতে কৃষ্ণা বসে পড়লো তারাপদর পায়ের কাছে। ওর জুতোতে সাইকেলের চাকার কাদা লেগে গেছে—কৃষ্ণা আঁচল দিয়ে সেই কাদাটুকু মুছে নিল—দুটো জুতোই মুছে দিল কৃষ্ণা আঁচল দিয়ে।

—তোর একফোঁটা চোখের জল মুছতে আমি হাজার বার মরে বাঁচতে পারি মা-মণি !

কোনো উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণা ওর পায়ের মোজার দড়িটা কসে বাঁধছে, হাফ্‌প্যান্টের কিনারা ছিঁড়ে গেছে—ছেঁড়ায় হাত দিয়ে দেখলো, বললো,—আজ এসেই এটা খুলে দিও কাকা, সেলাই করতে হবে—আর হাফ্‌প্যাণ্ট দুটো আজই হয়ে যাবে আমার। এক গজ টিকিন এনো কাকা, তোমার বালিশটা ছিঁড়ে গেছে।

—টিকিন যে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না মা! অন্য কোনো কাপড় এনে দেব।

—বেশ, একটু শক্ত দেখে নও।

—শক্ত কি আর কিছু আছে রে মা মণি! দেড়শ বছরের ইংরাজ-রাজত্বে শক্ত আর কিছু নাই, মেরুদণ্ডও শক্ত নাই, মানুষগুলোই কুঁজো হয়ে গেল—আচ্ছা মা, আসি আমি।

তারাপদ সাইকেল নিয়ে বেরুলো। কৃষ্ণা বাঁশের ফটকটা বন্ধ করে এসে কুয়োতলায় গেল স্নান করতে। সারা বাড়ীটায় ও একা। কাঁটার বেড়া আর লতাতরুর ঘন যবনিকা ওকে অন্তঃপুরের আব্রুতে রেখেছে। নিশ্চিন্তমনেই নিত্য স্নান করে কৃষ্ণা—আর স্নান করে অনেকক্ষণ ধরে। এই একটামাত্র বিলাসিতা আছে ওর—সেটা ওর ডাল-ভাতের থেকেও বেশী দরকার। কিন্তু কৃষ্ণা আজ কুয়োতলায় এসে দাঁড়িয়েই রইল। জলেভেজা মাটিতে গাঁদাফুলের চারাগাছ জন্মেছে। অপরাজিতা লতাটায় এবার কোনো অবলম্বন দিতে হবে, নইলে ওটা বাড়তে পারছে না। ওর নাম অপরাজিতা কেন? কে দিয়েছে ওরকম অর্থহীন নাম, যদি অবলম্বন না পেলে ও বাড়তে না পারে? অপরাজিতা কোথায় ও? প্রতি পদে যাকে অবলম্বন খুঁজে চলতে হয় সে আবার অপরাজিতা কিসের? ও নাম ওর পক্ষে বিদ্রূপ। যেমন 'কৃষ্ণা' নামটা! কোনোরকমেই ও নাম মানায় না কৃষ্ণার। যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা, পাণ্ডব-

প্রেয়সী কৃষ্ণা, কৃষ্ণ-সখী কৃষ্ণা—যে কৃষ্ণার অপমানের আগুনে কুরুকুল ধ্বংস হয়ে গেল—ভারতের বীরত্ব-গৌরব অস্তমিত হয়ে গেল, তার বিরাট স্মৃতিকে সজাগ রাখবার জন্য বাংলার এই নগণ্য পল্লীতুলালীর নাম রাখা হয়েছে কৃষ্ণা। কিন্তু কেন? কেন এই স্মৃতিপূজা? অতীত ঐতিহ্যের গৌরব-গাথায় স্বপ্ন-মগন ভারতের কি অধিকার আছে এই স্মৃতিপূজা করবার এমন নির্ব্বোধের মত! শুধু নাম রেখে স্মৃতিপূজা—পয়সা খরচ তো হয় না নাম রাখতে; অথচ বাহাদুরী মেলে! আত্মপ্রসাদ লাভ হয়; চমৎকার ব্যবস্থা! নাম রেখে এই স্মৃতিপূজার মত নির্লজ্জতা আর কিছু আছে বলে মনে হয় না কৃষ্ণার। হৃতসর্ব্বস্ব দেশবাসী আজ একবারও ভেবে দেখে না—কৃষ্ণার বস্ত্র উন্মোচনের অপচেষ্টার জন্য একটা বিরাট ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে! অথচ আজ ঘরে ঘরে নারী বিবসনা—বস্ত্রহীনা! একটুকরা স্বাধীন জমি পাবার জন্য পঞ্চপাণ্ডব সর্ব্বস্ব বলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নি—আর—আজ সর্ব্বস্ব হারিয়েও ভারতবাসী ভাবে, বেশ আছে। শুধু নাম দিয়ে এই স্মৃতির সম্মান যেন বা শক্তিহীনের দন্তবিকাশের মতই করুণ, কদর্য্য!

কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল কৃষ্ণার! হেসে ফেললো। দিন-কয়েক আগে কাগজে পড়েছে—কলকাতার নাম নাকি বদলে "সুভাষ-নগর" করবার প্রস্তাব করেছেন জনৈক দেশভক্ত। সুভাষের স্মৃতিরক্ষার অছিলায় নিখরচায় একটু নাম করবার আর ভালো উপায় কিছু নাই। সুভাষের নামে নতুন একটা বিশাল নগর ওরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না—ওরা সুভাষের নামে বিরাট একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে না, যে প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ সুভাষ তৈরী করা যায়—ওরা সুভাষের কণ্ঠের বাণীকে আর কার্য্যের আদর্শকে মেনে চলতে পারে না পর্য্যন্ত—পারে শুধু বিনামূল্যে বিশাল—ঐতিহাসিক-গৌরবদীপ্ত, পরাধীনতার সহস্র দুঃখ-

স্মৃতি-জড়িত সুভাষের জন্মমৃত্তিকার নামটা বদলে দিতে। চমৎকার! কে আবার নাকি বলেছেন——কলকাতাকে গান্ধীনগর নামে অভিহিত করা হোক। আরো চমৎকার। কোন সম্পর্কে বাংলার অতি খ্যাত এবং অপখ্যাত নগরীর নাম গান্ধীজির নামে অভিহিত হবে!—শুধু কি বিনামূল্যে সেটা করা সম্ভব বলেই?—কৃষ্ণা নিজের মনেই হেসে উঠলো। ওর নিজের নামটা ওর কাছে বিদ্রূপ মনে হয়। মনে হয়—স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতমা এক নারীর নামগ্রহণ করবার কোনো অধিকারই তার নাই। সে পরাধীন জাতির এক নগণ্যা কন্যা—তুচ্ছ এক শ্রমিকের গৃহনীড়বাসিনী দুঃখিনী কন্যা—যার নাম হওয়া উচিত ছিল····কি নাম হওয়া উচিত ছিল, ঠিক করতে পারে না কৃষ্ণা, কিন্তু 'কৃষ্ণা' নাম নিশ্চয় হওয়া উচিত নয় ওর!

জলের বালতিটা তুললো আস্তে কৃষ্ণা। যে ভাবনাটা এই কয়েকটা মিনিট ওর ভাবা উচিত ছিল, সেই ভাবনাটা এড়াবার জন্যই সে 'অপরাজিতা' নাম নিয়ে এতখানি ভেবে সময় কাটালো, এই সত্য ওর মনে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু সেই নিতান্ত নিজের ভাবনাটা ওকে ছেড়ে কথা কইবে না। বালতির জলে পদ্মকলির মত হাতের মণিবন্ধদুটো ডুবিয়ে লাল গামছাটা ও ভিজিয়ে নিচ্ছে। খোলা চুলের কয়েকগাছা পড়লো বালতির জলে। কৃষ্ণা ঘাড়টা সজোরে ঝাঁকি দিয়ে ঘুরিয়ে চুলগুলো সামলে নিচ্ছে—ঘাড়ে কেমন যেন একটু ব্যথা লাগলো আচমকা।

এমনি করে মুচড়ে ওর মনকে ফেরাতে হবে। ব্যথা নিশ্চয় লাগবে। হয়তো ঝিন্ ঝিন্ করে উঠবে মাথাটা, মন হয়তো মানসিক সত্তায় থাকবে না, অন্তর হয়তো যন্তরের মত চলবে, যেমন চলে ঐ কারখানার বড় বড় লোহার চাকাগুলো—তবু ঘোরাতে হবে মনকে! সেই দুর্ভাগ্যের জন্য কৃষ্ণা প্রস্তুত হোক—কৃষ্ণা পরিচিত হোক!

কিন্তু কৃষ্ণা তা না করেও পারে। যদি তার নামের সত্যই কোন অর্থ থাকে তাহলে কৃষ্ণা পারবে তার মনকে মনের মতই রাখতে; অন্তরকে যন্ত্রে পরিণত করতে দেবে না সে—কিন্তু না, কৃষ্ণা হয়তো পারবেনা....হয়তো....

দেরী হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা বালতি বালতি জল তুলে স্নান করলো। শুভ্র, কোমল, মসৃণ অঙ্গে ওর তারুণ্যের বিজয়-লেখা। জলধারা ওর তনিমার রেখায় রেখায় নৃত্যশীলা হয়ে উঠছে। সকালের সোনালী সূর্য্যকিরণ ওকে হোমশিখার মত জ্বালিয়ে দিচ্ছে যেন। ও যেন মাতা ধরিত্রীর গর্ভ থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এলো আকাশের তলায়, অরণ্যের অঙ্কে। নির্জ্জন উঠানের নিস্তব্ধতায় ওর স্নান-পূত দেহমন উন্মথিত করে কার যেন গভীর বাঁশীর আহ্বান বেজে উঠলো—সে কৃষ্ণা, সে কৃষ্ণসখী, সে যাজ্ঞসেনী! যে যজ্ঞ সে আরম্ভ করেছে তাতে পূর্ণাহুতি হবে, নইলে তার নাম হয়ে যাবে ব্যর্থ, জীবন হয়ে যাবে মৃতের অপেক্ষাও মৃত! কৃষ্ণা দীপ্ত সূর্য্যের পানে চেয়ে প্রার্থনা করলো—

হে বিশ্বশক্তির আধার। আমায় শক্তি দাও, আমায় সক্ষম করো, সার্থক করো।

আকাশচুম্বী চিমনীগুলো অনবরত ধোঁয়া ছাড়ছে—দিন নাই, রাত নাই, ওদের বিশ্রামও নাই। অবিরাম, অবিশ্রান্ত চলেছে কারখানার কাজ। অসংখ্য শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করে এই বিরাট কর্ম্মশালার মালিকরা নিশ্চিন্ত বসে আরাম করেছে এতদিন, আজ হঠাৎ নির্জ্জীব সেই ক্রীতদাসগুলোর কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধের আওয়াজ উঠলো, —"শ্রমের সময় নিয়ন্ত্রিত করা হোক, শ্রমিকের সুখদুঃখের পানে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকানো হোক—শ্রমজীবীকে আরাম-আনন্দ লাভের

অধিকার দেওয়া হোক—” চমকে উঠলো ঐ মালিকরা। এই দীর্ঘদিন ওরা ভুলে গিয়েছিল—'কারখানায় যন্ত্র ছাড়া আর কোনো জীব আছে—জীবন আছে।' জীবন যেন ওদেরই, আর বাকী সবই যন্ত্র। যন্ত্র আবার দাবী জানাবার স্পর্দ্ধা দেখায় কেন?—কোন্ সাহসে? রুখে উঠলো মালিকের দল—কিন্তু জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ওঁদের আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ওদের দাবী অস্বীকার করবার উপায় নাই—ওরা জীবন-যুদ্ধের সৈনিক—ওদের জয় হবেই।

মিঃ চাটার্জ্জি এই কারখানার একজন বড় সেয়ারহোল্ডার এবং ডাইরেকটার অর্থাৎ মালিক। কলকাতার প্রকাণ্ড প্রাসাদে বসে তিনি সেদিন খবর পেলেন চুরুট টানতে টানতে—শ্রমের যন্ত্রগুলো চীৎকার করছে—কারখানা বন্ধ করে দেবে, এমন ভয়ও নাকি দেখাচ্ছে। ভ্রূদুটো নিদারুণভাবে বাঁকা হয়ে উঠলো তাঁর, চুরুটে শেষ টান মেরে বললেন, —আচ্ছা, আমি দেখছি গিয়ে।

পরদিন পৌঁছালেন তিনি এখানে এসে। জবরদস্ত জাঁদরেল মানুষ। কারখানার বড় বড় কর্ম্মচারীরা তটস্থ হয়ে উঠলো—কেরাণীগুলো সন্ত্রস্ত, কলগুলো পর্য্যন্ত শশঙ্কিত; কিন্তু যে শ্রমিক-যন্ত্রের আস্পর্দ্ধাকে দমন করবার জন্য তাঁর আগমন—সে গ্রাহ্যও করলো না। মিঃ চাটার্জ্জি ডাকলেন যন্ত্রের প্রধানকে। সাইকেলটা বাইরে ঠেসিয়ে রেখে তারাপদ এসে দাঁড়ালো সামনে। মাথা না নুইয়ে নমস্কার করলো হাত তুলে। মিঃ চাটার্জ্জি প্রতিনমস্কার না করেই শুধুলেন—কে তোমাদের শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী—তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—তারাপদ বললো নীচু গলায়।

—কি চাও তোমরা?

—আজ্ঞে, আমাদের দাবী লিখিতভাবে জানানো হয়েছে!

—সে দাবী অন্যায়ভাবে করেছ তোমরা। তোমরা কি মনে করো, কারখানার যা-কিছু লাভ সব তোমাদের দিয়ে আমরা মাথা মুড়িয়ে বাড়ী চলে যাই—?

—আজ্ঞে না, আমরা অতিসামান্য চেয়েছি—বেঁচে থাকবার জন্য যা দরকার তাই শুধু চেয়েছি।

—তোমাদের যা দেওয়া হচ্ছে, তাতে তোমরা ভালভাবেই বেঁচে আছ, দেখা যাচ্ছে।

মিঃ চাটার্জির কণ্ঠস্বরটা বিদ্রূপে বিষাক্ত শোনালো, কিন্তু তারাপদ সেটা অগ্রাহ্য করেই বললো—বাঁচার অর্থটা এখানে একটু গভীর স্যার। আমি মানুষের মত বাঁচার কথা বলছিলাম।

—ওঃ! তোমরা তাহলে অতিমানুষের মত বেঁচে আছো...হাঃ হাঃ হাঃ!

ব্যঙ্গটা আবার অগ্রাহ্য করে তারাপদ বললো বিনীত কণ্ঠেই,—আজ্ঞে হ্যাঁ—মাটির পৃথিবীতে অতিমানুষের তো প্রয়োজন নেই। তাই আমরা মানুষের পর্য্যায়ে আসতে চাইছি—শুধু সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে, যে মানুষের আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে—আনন্দ-বেদনা আছে, আত্মীয়-পরিজন আছে, আরাম আছে, অবসাদ আছে, আর আছে আপনাদের মতো মন—হৃদয়!

—বেশ; তারজন্য কি করতে হবে?

—করবার অনেককিছুই আছে, কিন্তু অত সব তো আপনারা করবেন না। তাই যৎসামান্য কিছু করবার কথা আমরা ঐ কাগজে লিখেছি—আশা করি....

—থামো...তোমাদের এই লেখা কাগজের দাবী মিটিয়ে ফেলা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অসম্ভব—কারণ তোমাদের দাবী অযৌক্তিক,

অসঙ্গত, আর তোমাদের মনে রাখা উচিত যে চোখ রাঙিয়ে কিছু আদায় করা যায় না।

—আমরা চোখ রাঙিয়ে কিছুই চাইনি স্যার—তবে আপনাদেরও মনে রাখা উচিত যে চোখ রাঙিয়ে চিরকাল মানুষকে শাসন করা যায় না—ধাপ্পা দিয়ে প্রভুত্বকে কায়েমী করা সম্ভব নয়—আরো মনে রাখা উচিত........

—চুপ করো—ভদ্রভাবে কথা বলবে......মিঃ চাটার্জি দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন। তারাপদ থামলো না, বললো—আরো মনে রাখা উচিত, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই শ্রেণীবিভাগ মেকী, ভুয়ো—একে টিকিয়ে রাখবার মত কোনো যুক্তির বর্ম্ম আজ আর নেই আপনাদের। পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষ বুঝেছে—তারা একশ্রেণীর মানুষ, শুধু মানুষ। ক্রীতদাস করে রাখবার যুগ চলে গেছে স্যার, কলের পুতুল বন্‌বার যুগও পার হয়ে এলো মানুষ। আজ দিকচক্রে দেখা যাচ্ছে নতুন যুগের মানুষকে, যারা শ্রেণীগত বৈষম্য ভেঙে ফেলবে, সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সমাজকে গঠন করবে মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে ওজন করে!

—তুমি তো বেশ বক্তৃতা করতে পারো হে! নাম কি তোমার?

—পারি স্যার। কারণ, মানুষ হিসেবে আপনাতে আমাতে তফাৎ অতি সামান্য। আপনি যেটা পারেন না, সেটাও হয়তো পারি আমি; পারি, কারণ আমি জীবনের যোদ্ধা—জীবনকে রক্ষা করবার জন্ত আমাকে যুদ্ধ করতে হয়।

—বেশ, বেশ, তোমার নামটা........

—তারাপদ গাঙ্গুলী।

—অল্‌রাইট!—টেক ইওর সীট্ প্লিজ, মিঃ গাঙ্গুলী! বসুন। কথাটা আজই শেষ করে ফেলি।

তারাপদ বসলো না, বললো—থাক স্যার, ধন্যবাদ—বলুন কি বলবেন।

—বসুন না—হ্যাঁ, বাড়ীতে কে কে আছেন? ছেলেমেয়ে?

—একটা ভাইঝি'মাত্র।

—মাত্র! আপনি ব্যাচিলার নাকি? বেশ, ভাইঝির বিয়ে দিয়েছেন?

—না—কিন্তু আমি ভাইঝির কথা বলতে এখানে আসিনি স্যার।

—আরে, তাতে কি? মানুষ মানুষের সুখদুঃখের খবর নেবে না? কতবড় ভাইঝি?

—বড়ই—বিয়ে দিলেই হয়। তবে বিয়ে দেবার মত অবস্থা তো হচ্ছে না—তাই........

—সেই জন্যই তো শুধুচ্ছি! শুনুন, কতটাকা খরচ হতে পারে তার বিয়েতে?

তারাপদর চোখদুটো একমুহূর্ত্তের জন্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। সে বুঝলো মিঃ চাটার্জি ঘুসের ফাঁদ পাতছেন। তারাপদর অভাবের ফাটলে আকস্মিক ভাবে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু তারাপদ জানে—এই ভাবেই বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন—স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, সবকিছুই এরা ব্যর্থ করে, বিধ্বস্ত করে; এই ঘুষটাই ওদের হাতের বড় অস্ত্র—নইলে আজ পৃথিবী হয়তো সাম্যবাদের শুদ্ধ পবিত্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। ঘুষ আর মিথ্যার কদর্য্যতা দিয়ে এরা সেই পবিত্রতাকে পঙ্কিল করে দিচ্ছে বারম্বার। সে ধীরকণ্ঠে বললো,—টাকা হয়তো কিছু খরচ হবে স্যার। কিন্তু তার জন্য আমি ভাবছি না—তাকে একজন জীবন্ত লোকের হাতে দিতে চাই—যে লোক সকল সময় জীবন্ত থাকবে মানুষ হয়ে, কারখানার কলে আর মালিকের কৌশলে যন্ত্র হয়ে যাবে না।

—সে রকম ছেলে পাচ্ছেন না?—চাটার্জির ঠোঁটের ফাঁকের হাসিটা বাঁকা হয়ে উঠছে।

—পাওয়া একটু কঠিন স্যার—মানুষকে কলের মানুষ করবার জন্য পৃথিবীজুড়ে মালিকদের ষড়যন্ত্র চলছে। মালিকিয়ানাকে মুছে ফেলতে না পারলে মানুষের তো মঙ্গল নাই স্যার!

—মালিকিয়ানা আপনারা মুছেই ফেলতে চান নাকি?

—কালের স্রোতে মুছে যাবে স্যার। যে ফাঁকী আর ধাপ্পাবাজির যাদুমন্ত্রে এই দীর্ঘকাল গণচেতনাকে সুপ্ত রেখেছিলেন মালিকরা—তার যাদুর দিন শেষ হয়ে এল। নবজাগ্রত পৃথিবীতে আজ গণমনের জয়-দুন্দুভি বাজছে—সে আওয়াজ শুধু সংগ্রাম-সংঘাতের আওয়াজ নয়—সে আওয়াজ আগামী যুগের আগমনী গান।

—সৃষ্টিটা বদলেই ফেলতে চান—কেমন?

—না স্যার, সৃষ্টিকে তার সৃজনশক্তির ক্রমবিকাশের পথে চলতেই হবে—ক্রমবিকাশ, অর্থাৎ ক্রমোন্নতি—। বিবর্ত্তনের মধ্যে বনমানুষ মানুষ না হতে পারে, কিন্তু মানুষ যে বনমানুষ নয়, এটা বুঝবার দিন এসে গেছে। চাল-ছোলা-ছাতু খাইয়ে যাদের খাঁচায় পুরে ক্ষমতার অহঙ্কার দেখিয়ে এলেন দুনিয়ার রাজা-বাদশারা—তাঁদেরও বুঝবার দিন এসেছে যে দুনিয়াটা তাঁদেরই একার নয়—বরং তাঁদের ভাগে পড়ে অতিসামান্য অংশ। কিন্তু এত কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না।

—বলুন—বলুন! আপনার কথা বলবার কায়দায় আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি!

—আপনাদের মুগ্ধ করবার কাজ আমার পূর্ব্বপুরুষদের কেউ কেউ করেছিলেন স্যার। তাঁদের মধ্যে ঈসপ, বীরবল গোপাল ভাঁড়ের নাম বিখ্যাত করে রেখেছেন আপনারা, কিন্তু ভুলে যাবেন না স্যার,

পৃথিবীর ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে ঈশপের ক্রীতদাসত্বের আর গোপাল-ভাঁড়ের ভাঁড়ত্বের অবদান গণচেতনায় অমর হয়ে রইল। আজ তাই এই বিবর্ত্তন, এই বিদ্রোহ। একে সৃষ্টির বিকাশ-প্রচেষ্টা বলে যদি মেনে না নিতে পারেন তো আপনাদের দুর্ভাগ্যস্রোত কোথায় গিয়ে থামবে, আমাদের জানা নাই। কিন্তু আমি চললাম এবার, নমস্কার!

—দাঁড়ান! আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা, কিন্তু যে সুরে কথা আপনি বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে—যে কোনো প্রলোভন আপনি জয় করতে পারবেন। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি—যাদের জন্য আপনি এই মরণের খেলায় মেতেছেন, এতখানা রিস্ক করছেন নিজের সৌভাগ্যের, তারা যে কোনো মুহূর্ত্তে আপনাকেই আক্রমণ করতে পারে, আপনাকেই ধ্বংস করে দিতে পারে?

—জানি স্যার! তার কারণ, অশিক্ষায় আর অপ-শিক্ষায় তাদের মনকে আপনারা প্রায় যন্ত্রের কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। মানুষের জ্ঞান আর গুণ কেড়ে নিয়েছেন তাদের কাছ থেকে। তাদেরই লেলিয়ে দিয়ে আমাকে ধ্বংস করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন না হতে পারে—কিন্তু আবার ওরা জাগবে, আমার মতন আরো অনেক আসবে সেদিন, তারাই চালাবে ঐ জীবন্ত অনলস্রোত। তাদের জাগ্রত ধারাকে যান্ত্রিক করবার শক্তি আজ আর নেই আপনাদের। যদি থাকতো, তাহলে কলকাতার কোঠাবাড়ীর আর মোটরগাড়ীর আরাম ছেড়ে আপনি আজ এখানে আসতেন না!

—কোঠাবাড়ী আর মোটরগাড়ী আমাদের সর্ব্বত্রই থাকে। এটা আপনার জানা উচিত।

—থাকে—সেটা কায়েমী রাখবার জন্যই এতো ছুটোছুটি করছেন!

—কিন্তু যারা সেটা কায়েমী রাখছে তাদেরও আলো-হাওয়া পেয়ে বেঁচে থাকা দরকার।

—বেশ, তারা বাঁচুক, কিন্তু তাদের দাবী যে অতিরিক্ত, মনে হচ্ছে।

—অতি সামান্য দাবী স্যার—মানা-না-মানা আপনাদের ইচ্ছাধীন। আমাদের কথা আমরা বলেছি।

—কিন্তু একটা কম্প্রোমাইজ........

—মরণের সঙ্গে জীবনের কম্প্রোমাইজ হয় না স্যার। হলেও তাকে সুস্থ হওয়া বলা চলে না—জীবন্মৃত বলা চলে। কিন্তু আমরা আর জীবন্মৃত হয়ে বাঁচতে চাইছি না—নমস্কার।

তারাপদ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মিঃ চ্যাটার্জি বেল টিপলেন; বেয়ারা এলে ম্যানেজার সাবকে সেলাম দিতে বললেন। ম্যানেজার কাছাকাছিই ছিল - এসে দাঁড়ালো মিঃ চাটার্জির সম্মুখে।

—বসুন—ঐ যে লোকটা, তারাপদ নাকি নাম, ওইতো সর্দ্দার, না? হিষ্ট্রী কি ওর—মানে, ওর পারিবারিক ইতিহাস? পলিটিকেল যদি কিছু থাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ও রেলে চাকরী করতো! কে জানে কি জন্য চাকরী যায়। তারপর এখানে এসে ঢোকে কারখানার ফিটার হয়ে। লোকটা কাজ খুবই ভাল জানে—তাছাড়া, মানুষের ওপর কর্ত্তৃত্ব করবার শক্তি ওর অসাধারণ। যাকে বলে ডাইনামিক পারসোনেলিটি। ও এখন ফ্যাকটারীর লেবার-ইন-চার্জ!

—হুঁ! ওর বাড়ীর খবর?

—ব্যাচিলার লোক। একটা ভাইঝি আছে, বিয়ে হয়নি। বয়স বছর আঠারো উনিশ।

—মাইনে কত পায় ?

—নব্বই টাকা, আর ওভার-টাইম ইত্যাদিতেও টাকা ত্রিশ রোজগার করে।

—নেশা-ভাঙ্গ করে কিছু ?

—তাতো জানি না স্যার ! তবে লোকটা যথেষ্ট শিক্ষিত। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত। নেশা করে না বোধ হয় !

—শিক্ষিত লোকেরাই বেশী নেশা করে ম্যানেজারবাবু! মদের নেশা নয়—মেয়েমানুষের নেশাও না হতে পারে—নামের নেশা! বুঝলেন !

—আজ্ঞে !

—নামের নেশা ! এর চেয়ে বড় নেশা নেই আর। টাকার নেশাই আগেকার যুগে সেরা নেশা ছিল, কিন্তু এযুগে নামের নেশাই সবথেকে বড় নেশা হয়ে উঠেছে। অত উগ্র আর কোনো নেশা নেই।

—ম্যানেজার কথাগুলো শুনলো মাথা নুইয়ে। বোকার মত তাকিয়েই রইল কিছুক্ষণ। মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—সে-নেশাও যদি এখনো না ধরে থাকে তো ধরিয়ে দিতে হবে। ও যেন অবিলম্বে বুঝতে পারে যে প্রচুর নাম করবার মত শক্তি ওর আছে। নামের প্রলোভন ছাড়া ওকে জব্দ করা যাবে না—কারণ ও ব্যাচিলার। ভাইঝির জন্যও ভাবছে না বিশেষ। ওর কথার মধ্যে মানুষের শাশ্বত দাবীর যে ঝঙ্কার উঠছে—ওটাকে নষ্ট, ইন্‌সিন্‌সিয়ার করতে না পারলে আমাদের মুস্কিলে পড়তে হবে—বুঝলেন ?

—আজ্ঞে·······ম্যানেজার বোকার মত চেয়েই রয়েছে।

—মানে—আমাদের প্রমাণ করে দিতে হবে যে ওর কথাগুলো শুধু কথাই ! ওর আন্তরিকতাকে কমিউনেল এওয়ার্ড দিয়ে ফুটো করে

দিতে হবে—পাকিস্থান—হিন্দুস্থান—শিখস্থানে ভাগ করে দিতে হবে——আর নাম জাহির করবার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ওকে নামী ব্যক্তি—এমন কি মানুষ থেকে মহামানবের পর্য্যায়ে তুলে ফেলতে হবে। তখন ও তার মহামানবত্ব বজায় রাখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে—আন্তরিকতা যাবে অতলে তলিয়ে!

—ঠিক! ব্রিটিশ পলিসী!—ম্যানেজার বুঝতে পেরে ওয়াকিবহালের মত আত্মপ্রসাদের প্রসন্ন হাসিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো।

—ঠিক! দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে তুমি প্রচারপত্রের ঠেলায় ফেলে মহামানব করে তোল—ব্যস্—দেশ গোল্লায় গেলেও তার মহামানবত্বকে রাখতেই প্রানান্ত হবে সেই সন্ন্যাসীর। বুঝলেন? ওকে মহামানব করবার উপায়টা ভেবে বের করে ফেলুন—অবিলম্বে!

—আমার মাথায় তো কিছু আসছে না স্যার।

—ভাবুন, ভাবুন—দেড়শ বছর ইংরাজ রাজত্বে বাস করেও এটুকু শিখলেন না তো পলিটিকস্এর শিখলেন কি?

চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই ছিল হাসির ধমকে সেটা এতো জোরে ঘষলেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি যে পালকা কাঠিটা ভেঙে গেল—কিন্তু বারুদটা তবুও জ্বলে—টেবিলেই পড়্ল আগুন। মিঃ চ্যাটার্জ্জির গায়েও তো পড়তে পারতো!

স্নান করে খেতে বসলো কালীপদ। কৃষ্ণা যত্ন করে রান্না করেছে; দীর্ঘ দিন এত ভালো রান্না খায়নি কালীপদ—তাছাড়া কৃষ্ণার হাতের রান্না যেমনই হোক, অমৃতের চেয়ে মিষ্টি লাগার কথা। কিন্তু কালীপদ কি যেন ভাবছিল, খাচ্ছিল না।

—রান্না ভালো হয় নি বাবা?—কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত।

বাবা তার এতোকাল কোথায় কি ভাবে থেকেছে আর কিরকম খাস্তাদিতে অভ্যস্ত হয়েছে, কৃষ্ণা এখনো সবিশেষ জানতে পারে নি। বাবার খাওয়ার হয়তো অসুবিধা হচ্ছে, হয়তো কৃষ্ণার রান্নায় নুন বেশী কিম্বা কম হয়েছে, হয়তো লঙ্কা বেশি হয়ে গেছে।

—খুবই ভালো হয়েছে মা। কতকাল যে, সেই তোর মা'র যাওয়ার পর থেকে এরকম রান্না খাইনি আর·······বলতে বলতে কালীপদ মেয়ের মুখের পানে চাইলো। উজ্জ্বল টানাটানা ছুটি চোখ নির্ণিমেষ হয়ে চেয়ে আছে কালীপদর কালো মুখখানার দিকে। কী ঔৎসুক্য, আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা সেই চোখে! প্রথম যৌবনের কবি কালীপদ অনুভব করতে লাগলো, ঐ চোখদুটির অন্তরালে কৃষ্ণার মা জীবন্ত রয়েছে—জাগ্রত রয়েছে। হেসে সে আবার বললো,

—তোর মা খুব ভালো রান্না করতো খুকী—তোর রান্না তার মতই হয়েছে!

—না বাবা, ভালো রাঁধতে আমি পারি না! কে শেখাবে বলো। যা কিছু আমি শিখেছি, কাকার কাছে এখনো নুনের মাপ করতে পারি না!

—কিন্তু নুন ঝাল-মশলা সবই ঠিকঠিক হয়েছে মা খুকু!

—তুমি খাচ্ছ না যে?

—খাচ্ছি! অশ্বিনীবাবুরা বাড়ীটা ছাড়তে চাইবে কিনা, তাই ভাবছিলাম।—ওর সঙ্গে দেখা হল না।—

বলে কালীপদ ভাতের গ্রাস মুখে তুললো। সেটা গিলে বললো, —হ্যাঁরে মা খুকু? বাড়ী বিক্রীর টাকাটা কি করলো তোর কাকা, জানিস?

—আমি অতসব কি করে জানবো বাবা!

—শুনলাম, তারাপদ সব টাকাটাই ওদের শ্রমিক-সঙ্ঘ না কি, তারই জন্য খরচ করেছে, অথচ আমায় বললো, তোর বিয়ের জন্য টাকা দরকার। এই রকম মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিল তার ?

কৃষ্ণা চুপ করে রইলো। ওর হাতে ছিল সুপারী কাঁটা। জাঁতি আর সুপারী, সেইটাই কাটবার জন্য আনত হোল কৃষ্ণা। কালীই বললো —বাড়ী বিক্রী করে শ্রমিক-সঙ্ঘের খরচ চালাতে হবে—এরকম কোনো নির্ব্বোধই করে না কৃষ্ণা ! বরং ঐসব শ্রমিক-টমিকের দলে পাণ্ডাগিরি করে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দুপয়সা রোজগারই করে সবাই !

—ছিঃ বাবা ; তুমি কী সব বলছো !—কৃষ্ণার ধমকটা লজ্জার প্রলেপে সুমিষ্ট শোনালো, কিন্তু ওর অভ্যন্তরে একটা জ্বালা রয়েছে যেন। কালী বললো—আমিও একদিন স্বদেশী করেছি মা খুকু ! ঐ সব শ্রমিক আন্দোলন আর পল্লী উন্নয়নের ব্যাপার জানি আমি। কাজ ওতে কিছুই হয় না, কয়েকটা ধূর্ত্ত লোক অশিক্ষিত নির্ব্বোধ কতকগুলো লোকের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে নিজেরা বেশ দু'পয়স রোজগার করে নেয়। তারা সুবিধাবাদী—সুযোগসন্ধানী !

জাঁতীতে সুপারী কাটা বন্ধ হয়ে গেল কৃষ্ণার। আধ মিনিট সে চেয়ে রইল তার কাবুলফেরৎ বাবার মুখপানে। কালীপদ আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কৃষ্ণা বললো—সকলেই সে-দলে পড়ে না বাবা। সুযোগ-সন্ধান অনেকেই আছে, কিন্তু সুযোগ পেয়েও নেয় না, এমন লোকও আছে। কাকা আমার সেই দলের লোক। আর যে সব সুবিধাবাদীদের কথা তুমি বলচো, তারা এই হতভাগা দেশেরই হতভাগ্য মানুষ—অশিক্ষায় আর অপশিক্ষায় যাদের অমানুষ করে তোলা হয়েছে। এক দিন যে দেশের মানুষের মধ্যে সত্য আর ন্যায় সবথেকে বেশী সম্মান পেত, চরিত্রের জন্য যে জাতি জগতের শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছিল—আজ

স্বাধীনতার অভাবে পরাধীনতার অভিশাপে সেই জাতির এই অবস্থা। কিন্তু একে মেনে নিলে তো চলবে না, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেই হবে!

কালীপদ ঐটুকু মেয়ের মুখে এই রকম বড় বড় কথা শুনে ভাতের গ্রাসটা গিলতে ভুলে গেছে। সুগঠিত ওর চিবুকটির সুদৃঢ় ভঙ্গীটা দেখছে কালীপদ।

—মন থেকে মনুষ্যত্বের ছোঁয়াচটুকু পর্য্যন্ত মুছে দিতে চায় যারা; যারা আজ শোষণের শেষ সীমায় এসেও শাসনের ভ্রূকুটি দেখিয়ে বলে—"তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা আছি—আমরা থাকবো"—তোমার ঐ সুযোগ-সন্ধানীর দলকে তারাই সৃষ্টি করেছে;—তাদের সেই গভীর চক্রান্ত........কৃষ্ণা আঁচল থেকে সুপুরীটা তুলে নিল।

—বল মা কৃষ্ণা, কি বলছিলি?—কালীপদর মুখের হাসিটা বিস্ময়ে স্তব্ধ রয়েছে!

—বলবার কিছু নেই বাবা! মুক্তি সংগ্রামে তুমি পরাজিত হয়েছো বলেই আর কেউ যে মুক্তি-সংগ্রামে সৈনিক হবে না, একথা মনে করবার কারণ নেই। শ্রমিক আন্দোলন বা পল্লীউন্নয়নের পাণ্ডারা বহুক্ষেত্রেই সুবিধাবাদী হয়েছে—এটা ইতিহাস, কিন্তু কলঙ্কের ইতিহাস; তাকে গৌরবে মণ্ডিত করবার জন্য কি আগামী যুগের সন্তানকে আমরা ডাকবো না বাবা?—কলঙ্কের ইতিহাসটাই জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে?—

কালীপদ নির্ব্বাক বসে রইল মিনিটখানেক। কৃষ্ণা আস্তে আস্তে বললো,

—খেয়ে নাও বাবা, খাচ্ছ না যে!

—তোর কাকার নিষ্ঠায় তুই এতখানি বিশ্বাস করিস কৃষ্ণা!

—হ্যাঁ! করি। আমার কাকা—আমার কাকা পৃথিবীর উপরের মানুষ; কিন্তু বাবা, তুমি তার দাদা,—তুমি মুক্তি-সন্ধানী সৈনিক; এতোকাল তোমার আদর্শের গৌরবকে বুকে বয়ে কাকার হাত ধরে আমি চলে এসেছি। কোথাও ভয় পাইনি বাবা, কোথাও হোঁচট খাইনি। তুমি আমার সেই আদর্শের গৌরবকে মলিন করে দিওনা বাবা!

ওর চোখদুটোতে কী ও! জ্বলন্ত বহ্নি, উদ্যত অশনি, ধ্বংসের শূল! কালীপদ আবার চেয়ে দেখলো কৃষ্ণার শেষকথার করুণ রেশটি 'বাবা' কথার টানের সঙ্গে সারা ঘরটায় স্নিগ্ধ প্রশান্তি ছড়িয়ে দিল। ওর করুণ হাসিটা এতো মধুর! ওর মা তো এমন করে কথা বলতে পারতো না। কালীপদর মনে পড়ে গেল কৃষ্ণার মায়ের সমস্ত অবয়ব, হাসি, কথা—কান্না। কৃষ্ণার সঙ্গে তার মিল তো দেখা যাচ্ছে না, কৃষ্ণা যেন বিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে বহুদূর পথ এগিয়ে গেছে; নিয়তির রহস্যচক্রের পরিণতপ্রায় পাত্র কৃষ্ণা। ওর দেহের মৃত্তিকা যজ্ঞবেদীর ঘটপাত্রের যোগ্য হয়ে উঠলো। সাধারণ পানীয় জল রাখবার কলসী তো সে নয় আর!

কিন্তু কালীপদ একদিন যথেষ্ট চিন্তা করেছে দেশ নিয়ে—দেশের স্বাধীনতা নিয়ে—স্বাধিকার নিয়ে। বড় বড় কথা শুনে বিস্মিত হবার লোক সে নয়, তবু নিজের এতোটুকু মেয়ের মুখে শোনা এই কথাগুলো আজ ওর বিস্ময় জাগালো। সে ভাবতে লাগলো—বাংলাদেশের সব মেয়েই কি এমনি করে ভাবতে শিখেছে, এতোখানা এগিয়ে গেছে চিন্তাশীলতায়? কিম্বা, কৃষ্ণাই এই শিক্ষা পেয়েছে তার কাকার কাছে—অথবা এসব কথার অন্তর্নিহিত শিক্ষা কিছুই এরা পায়নি—বই পড়ে পড়ে তোতাপাখীর মত কথা বলতে শিখেছে! সারা বাংলা দেশে কৃষ্ণার মত কথা-বলা মেয়ে যদি দশ-বিশটা জন্মে থাকে আর কথার সঙ্গে যদি

তাদের অন্তরের যোগ সত্যি হয়, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসতে দেরী হতে পারে কিন্তু স্বাধিকার প্রায় এসে গেছে বললেই চলে। নিজের উপর পূর্ণ অধিকার, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জানা এবং জানানোর মধ্যেই স্বরাট্ কথাটার সংজ্ঞা রয়েছে—কালীপদর মনে পড়লো "আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করতে পারার নামই স্বরাট্ হওয়া"—কিন্তু কৃষ্ণার মত ছোট একটা মেয়ে এতখানি শক্তি কি করে পেতে পারে! সে শুধুলো আস্তে—এসব কথা তুই শিখলি কোথায় কৃষ্ণা? তোর কাকার কাছে?

—হ্যাঁ, কাকার কাছে; কিন্তু বাবা, এসব শেখবার জন্য আজকাল আর শিক্ষকের দরকার হয় না। পরাধীনতার অসহনীয় জ্বালায়, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর দাপটে মানুষগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে।—উঠো না বাবা, দৈ দেব—কৃষ্ণা উঠে তার নিজের হাতে পাতা দৈ-এর পাথরটা নিয়ে এলো, হাসিতে মুখখানা অনুরঞ্জিত, অনুরণিত, অথচ অনুচ্ছ্বসিত। চামচে করে দৈ দিতে দিতে বললো,—প্রকৃতির নিয়মে জীবন নিজকে রক্ষা করতে চায়—পৃথিবীর ইতিহাসে জীবন কখনো পরাজয় স্বীকার করেনি বাবা—নিজেকে অমর করবার সাধনায় সে আজও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে—দেশ বদলেছে, কাল বদলে গেছে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে; বিপ্লব এসেছে, বিপর্য্যয় ঘটেছে বহু সহস্রবার, তবুও জীবন নিজেকে রক্ষা করে আসছে প্রাকৃতিক নিয়মে।—কৃষ্ণা একটুখানি থামলো, গুড় দিল একটুখানি বাবার দৈ-এ, তারপর বললো—জীবনকে রক্ষা করবার জন্যই এইসব কথা আজ আমাদের ভাবতে হচ্ছে বাবা, নইলে পৃথিবী থেকে আমরা মুছে যাব। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, আমাদের সুবিপুল কৃষ্টিধারা, আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির সব কথাই ওরা ভুলিয়ে,

দিয়েছে; জোঁকের মত ব্যথাহীন নিঃশব্দ শোষণে আমাদের দেহমনকে নিস্তেজ, পাণ্ডুর করে এনেছে; জীবনকে জীবন্মৃত করে তুলেছে; এখনো যদি আমরা না জেগে উঠি তাহলে প্রকৃতির নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে বাবা,—এই জাগরণ তাই অনিবার্য্য—ইনএভিটেব্ল!

—তুই কি বলতে চাস্, এই জাগরণ প্রকৃতির নিয়মেই ঘটেছে?

—নিশ্চয় বাবা! জীবনকে রক্ষা করবার দায়ীত্ব জীবনের মধ্যেই রক্ষা করছেন প্রকৃতি! আদিম দিনের অতিকায় প্রাণীদের জীবন আন্ধকার যুগের আবহাওয়ার মত করে গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নিয়মেই, নইলে তো সবই ধ্বংস হয়ে যেত! হাজার হাজার বছর আগে যখন পঞ্চনদের তীরে মানুষ সভ্যতার সামগান রচনা করতো—সুখ আর ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল তাদের অন্তর-বাহির, তখনকার কোনো মানুষ যদি হঠাৎ আজ তার কঙ্কাল থেকে জেগে উঠে দেখে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন, তাহলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকবে না; কিন্তু বাবা, তাকে যদি স্তরে স্তরে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে আজকার এই জাগ্রত বৈজ্ঞানিক, কূটবুদ্ধি রাজনীতিক আর কৌশলী যোদ্ধার মধ্যে তারই জীবন-প্রবাহের ঢেউ রয়েছে, তাহলে বিস্ময় তার যতই হোক—বিশ্বাস তাকে করতেই হবে।

—আমাদের এই জাগরণ........

—হ্যাঁ, আমাদের এই জাগরণ জীবনকে রক্ষার প্রয়োজনের তাগিদের পরিণতি,—প্রকৃতির দান—এ অমোঘ, এ অনিবার্য্য; একে অস্বীকার করছে যে অর্ব্বাচীন শাসনশক্তি সে যতই প্রচণ্ড হোক, তাকে ভেঙে যেতেই হবে। জীবন বাঁচবে, জীবনকে বাঁচাবার সাধনায় জীবনই চিরদিন জাগ্রত থাকে—তোমার খাওয়া হয়ে গেল বাবা? কি খেলে, কিছুই যে খেতে পারলে না বাবা!

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরের করুণতা কালীপদর চিন্তাস্রোতকে নিম্নমুখী করে আনলো! বললে সে—খুব খেলাম মা, অনেকদিন এত বেশি খাইনি; চল্, হাত ধোবার জল দে........আচ্ছা কৃষ্ণা!

—বাবা!—জলের ঘটিটা তুলে নিয়ে কৃষ্ণা আসছে ওর হাতে জল দিতে।

—মানুষকে বাঁচতে হবে, কিন্তু বাঁচবার জন্য খুব সামান্যই প্রয়োজন হয় মা....

—স্বাধীন মানুষ সেকথা বলতে পারে বাবা! যার অনেক আছে, অনেক পেতে যে পারে, সেই বলতে পারে—তার কিছু চাই না। আর বাঁচার জন্য সামান্য প্রয়োজন হলেও বাঁচবার অধিকারের জন্য অনেক বেশী কিছুর প্রয়োজন বাবা। স্বাধিকারে বেঁচে থাকার নামই বাঁচা—নইলে স্বার্থের খাতিরে যারা এই বিরাট দেশের বলিষ্ঠ জাতটাকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে এনেছে কোকেন-খোরের মত,—তাদের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। সেই সত্যটাই আজ বুঝেছি আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে। বহু কর্ম্মী, সৈনিক, বিপ্লবী, মনীষীর মধ্যে প্রকৃতি তাঁর বিদ্রোহের বাণী শুনিয়ে আসছিলেন, কিন্তু এতই অসাড় হয়ে ছিল আমাদের দেহ মন যে জাগতেই চাইছিল না—তাই রূঢ়তম আঘাত এলো—সে আঘাত আমাদের পাঁজরে পাঁজরে আগুন জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু স্বাধিকারে নয়, আমাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তাদের মর্জ্জি মাফিক, তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে, তাদের আত্মশ্লাঘার অহঙ্কার দেখাবার জন্য। আমাদের জাগরণ তাদের সেই অহঙ্কারের মূলে আঘাত হান্‌ছে—তাই আরো কঠিন হয়ে উঠছে ওদের ক্রোধ, ওদের কূটনীতি। কিন্তু আমরা

বাঁচবো, আমাদের জীবন-দেবতা রুদ্রবীণায় সুর তুলেছে—প্রাপ্যবরান্ নিবোধত........!

মুখটা ধুতে গিয়ে কালীপদ চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড মেয়ের মুখপানে, তারপর হাতমুখ ধুয়ে একটা পান নিয়ে শুতে যাচ্ছে। কৃষ্ণা বাবার মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য বিছানা পেতে রেখেছে। আসবার সময় কালীপদ বললে,—তুই খাবি কখন মা ?

—কাকা আসুক বাবা ; তুমি শোও গে, যাও !

কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তিন চার হাজার। এত বড় বিরাট একটা কারখানা চালাবার জন্য যা কিছু দরকার, এর মালিকরা তার ত্রুটি রাখে নি। শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার ব্যবস্থাও তারা গোপনে করে রেখেছে। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর ভেতর এই শ্রমিকের দল এমন কঠোর নিয়মবদ্ধ শক্তি গঠন করলে কী ভাবে, চ্যাটার্জি সেইটাই ভাবছিল বসে বসে। ওর ম্যানেজার নিত্যানন্দবাবু কারখানার পুরানো লোক, পাকা লোক—তা ছাড়া প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক। এতবড় কারখানার তিনি ম্যানেজার—সাহেবী চালেই থাকেন—চেহারাটিও বেশ সাহেবের মত না হলেও সুটপরা মূর্ত্তি তাঁর মন্দ দেখায় না ; কিন্তু বাংলোয় তাঁর হিন্দুয়ানী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা থেকে আরম্ভ করে মাসে মাসে গিন্নীকে দিয়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্য সঞ্চয়ে পর্য্যন্ত উঠে আসে। সেখানে তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, আর কারখানায় তিনি কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রীত কর্ম্মী, শাশক—সংযতবাক্। যারা দুটোদিকই জানে তারা বলে লোকটি 'মিষ্টিক্।

একটিমাত্র ছেলে তাঁর। সে ছেলেও আবার তাঁর মনের মত নয়—তাঁর ইচ্ছায় কোনোদিন সে চলে নি। বাপের সঙ্গে বিদ্রোহ

করতেই যেন সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। পড়াশুনো সে অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছিল—ছেড়ে না দিলেও সুবিধে হোত না—কারণ পড়াশুনোর চাইতে ডানপিটেমির দিকেই তার ঝোঁক বরাবর বেশী। কিন্তু তাতেও ম্যানেজার ঘাবড়াতেন না। ছেলেটা কলেজেই কীসব সরকারবিরুদ্ধ কাজ করে জেলে গেল—পাকা দুটি বছর খেটে এল। ছাড়া পেয়েই আবার কীসব যে করে বেড়াচ্ছে নিত্যানন্দবাবু আপ্রাণ চেষ্টাতেও জানতে পারছেন না। অনেক অনুনয়-বিনয় করে তিনি তাকে কারখানাতেই একটা কাজ নিতে রাজি করালেন। কিন্তু কাজ সে কিছুই জানে না। তাই তাকে এ্যাপ্রেন্টিস রাখতে হোল কিছুদিনের জন্য। অবশ্য এলাউন্স বাবদ নিত্যানন্দবাবু ভালই আদায় করে নেন কোম্পানীর কাছ থেকে। কিন্তু ছেলে সত্যি কিছু শিখছে কি না, সে-খবর রাখা দুরূহ ব্যাপার তাঁর পক্ষে। যাই হোক, ছেলেটাকে তবু কাজে লাগিয়ে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে ছেলের কোনো খোঁজই পাচ্ছেন না। কারখানায় সে নিয়মিত এসেছে—কিন্তু ডেকে পাঠিয়েও নিত্যানন্দবাবু তাকে পান নি। তিনি ভাবছিলেন ছেলের কথাটাই। ওঘরে চ্যাটার্জি চুরুট জ্বাললেন, নিত্যানন্দ দেশলাই ঠোকার শব্দ শুনলেন। তাঁরও একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, হঠাৎ ডাক এল—ম্যানেজারবাবু!

—ইয়েস্ স্যার্—মুহূর্ত্ত বিলম্ব হোল না নিত্যানন্দবাবু মনিবের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। এই রকম অসাধারণ চটপটে কর্ম্মী বলেই তাঁর এখানে এতো নাম, এতো খাতির, কিন্তু আজ একটু মনমরা হয়ে আছেন নিত্যানন্দবাবু।

—কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলেন?

—কিসের স্যার! ও—তারাপদকে জব্দ করবার কথা?

—না, জব্দ করা ঠিক নয়—জব্বর করার কথা। শক্তিকে নষ্ট করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় ম্যানেজারবাবু, তাকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তারাপদ শুধু যে নিজে শক্তিশালী, তাই নয়—সে ডাইনামো, তার থেকে শক্তি উৎপন্ন হতে পারে।

—হ্যাঁ, লোকটা সত্যি শক্তিমান। ওর পারশোনেলিটি....

—জানি! সেইটেকেই কাজে লাগাতে চাইছি। কিন্তু উপায় কিছু ঠিক করতে পারলেন?

—আজ্ঞে না স্যার লোকটা অসাধারণ বুদ্ধিমান আর অসাধারণ....

—কি!

—তেজস্বী! ওকে ঘুষঘাস দিয়ে পাকড়ানো যাবে না স্যার!

—ঘুষের রকম-ফের আছে ম্যানেজারবাবু! ওর সঙ্গে কার বেশি বন্ধুত্ব এখানে, জানেন কি? কার সঙ্গে ও শলা-পরামর্শ করে?

—তাতো জানি না স্যার! লোকটা পড়ে খুব। পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের নাম ওর ঠোঁটের আগায়। কিছুদিন আগে কারখানার মধ্যে ও একটা লাইব্রেরী করবার জন্য আবেদন করেছিল—ম্যানেজিং কমিটি তখন 'টাকা নেই' বলে অগ্রাহ্য করে দেন। কিন্তু লাইব্রেরী ও করেছে। কে জানে কেমন করে বই সংগ্রহ করলো—প্রায় হাজারখানেক বই এর মধ্যেই হোয়ে গেছে। তাছাড়া দেখুন না, দরখাস্তে কত রকম দাবী করেছে ওরা—মানে ঐ তারাপদরই মাথা থেকে সব বেরিয়েছে। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, বাজার, জল, ওষুধ, ডাক্তারখানা—কোটিটাকার ব্যাপার!

ম্যানেজার থামলো। চুরুটে লম্বা টান দিয়া চ্যাটার্জি শুধুলেন,

—বাংলার কোন্ কোন্ লেখক ওর ফেভারিট্, জানেন?

—না স্যার! বাংলার কোনো লেখক সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই!

—এটা খুব উচ্চশ্রেণীর মানুষের কথা নয় ম্যানেজারবাবু। জ্ঞান কিছুটা সঞ্চয় করবেন। যাক্—আপনার ছেলে তো এ্যাপ্রেন্টিস এখানে—তাকে দিয়ে খবর নিন তো, তারাপদর দুর্ব্বলতাটা কোথায়, কোন্ দিক দিয়ে তাকে জব্বর করে তোলা যায়?

ম্যানেজার মুস্কিলে পড়লো। একটু ভেবে বললো—ছেলেটা বড্ড বেয়াড়া স্যার, এরকম স্পাইং করতে সে মোটে রাজি হবে না।

—আপনার কথাতেও না!

—আমার চৌদ্দ পুরুষের কথাতেও না। এখানে থাকতেই চাইছিল না সে। তার মা অনেক কান্নাকাটি করে রেখেছে। ওর দ্বারা কোনো উপকার পাওয়া যাবে না।

—তাহলে? আপনি আমার কাছে আনুন তো তাকে আমিই বলে দেখি।

ম্যানেজার আর দাঁড়ালেন না ওখানে। নিজের ঘরে এসে বেয়ারাকে দিয়ে বলে পাঠালেন ছেলেকে, যেন সে অবিলম্বে মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে।

উল্টি বেলা, অর্থাৎ বিকাল সাড়ে পাঁচটা। ছটার সময় কারখানার সিটি পড়বে। মিঃ চ্যাটার্জি তখনো বসে আছেন তাঁর ঘরে। একখানা সাইকেল এসে দরজায় থামলো। আধমিনিট পরেই একটি যুবক এসে দাঁড়ালো মিঃ চ্যাটার্জির সমুখে। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ যুবকটি। চোখের দৃষ্টিতে একটা সতেজ চিন্তাশীলতা। অভিবাদন করে বললো,

—আমায় আপনি ডেকেছেন স্যার!

—হ্যাঁ, তুমিই ম্যানেজারবাবুর ছেলে ? ডেকেছি তোমায়।

—আদেশ করুন—যুবকের মুখ নত, কিন্তু ঠোঁটের হাসিটা তথাপি দেখা যাচ্ছে।

—তুমি এখানে এ্যাপ্রেন্টিশ—আশা করি ভবিষ্যতে এখানেই কাজ করার আশা রাখ !

—না স্যার ! ভবিষ্যতে এমনি কিম্বা এর থেকে বড়ো একটা কারখানা গড়তে চাই !

তোমার উচ্চাকাঙ্খার কথা শুনে খুশী হলেম ; কিন্তু কারখানা গড়তে আর চালাতে সত্যিকার ক্যাপিটেল দরকার—এটা নিশ্চয় তুমি অস্বীকার করো না ?

—না—কিন্তু ক্যাপিটেল তো রয়েছে আমাদের। আমাদের ক্যাপিটেলকেই তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন এক্সপ্লয়েট্ করে ক্যাপিটেলিষ্ট হচ্ছে। আমাদের শ্রমই আমাদের ক্যাপিটেল !

—বুঝলাম, তুমি মার্কসপন্থী।

—আজ্ঞে না, আমি কোনো পন্থীই নই। মার্কস্ বা লেনিনের মতবাদ আমি পড়েছি, কিন্তু, আমার দেশের মাটির যোগ্য পন্থা আমি আবিষ্কার করতে চাই।

—অর্থাৎ ?—মিঃ চ্যাটার্জি সবিস্ময়ে তাকালেন ওর দিকে।

—অর্থাৎ আমাদের দেশে যে শ্রমশিল্পের বিভাগ বণ্টন ছিল তারও মূলে ছিল সাম্যবাদ ! রাজার থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছতম প্রজাটির পর্য্যন্ত বৃত্তি অর্থাৎ শ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল—যার ভগ্নাংশের প্রমাণ আজো বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মের নাপিত পুরুত ছুতোর কামারের সহযোগিতার মধ্যে পাওয়া যায়। বৃত্তিভোগী সেই সাম্যবাদী দলকে উচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পুরুষানুক্রমে অর্জিত শিক্ষার পটুতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা

হয়েছে ; সিডিউল কাষ্ট আর অনুন্নত শ্রেণীর ছাপ মেরে সেই বিরাট সাম্যবাদী সমাজকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে ; অখণ্ড সমাজ-জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে উচ্ছৃঙ্খল গণ্ডীতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে.... ।

—থামো থামো ! ধান ভানতে শিবের গীত গাইছো তুমি—মিঃ চ্যাটার্জি বিরক্তির স্বরে বললেন কথাগুলো । মিনিটখানেক চুপচাপ, পরে বললেন,—এখানে তুমি শিক্ষার্থী হয়ে ঢুকেছ কেন ? তোমার বাবাকে খুশী করার জন্য ?

—আজ্ঞে না । কারুকে খুশী করবার জন্য আমি কিছু করি না । বাবা আমার মধ্যে যা-কিছু ইন্‌ভেষ্ট করেছেন—দাদন দিয়েছেন, তার সবটাই তিনি সুদে-আসলে ফেরৎ পেতে চান । কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে এই সুদী কারবার তুলে দিয়েছি....

—বাপের ওপর ছেলের কর্ত্তব্য আছে ।

—সে কর্ত্তব্যটা আমিই তাঁর মধ্যে ইন্‌ভেষ্ট করবো—দাদন দেব । তাছাড়া আরো ওপরের কর্ত্তব্য আছে দেশের মানুষের ওপর, বিদেশের মানুষেরও পর, বিশ্বের লোকের ওপর । কর্ত্তব্যের শেষ হয় না স্যার—ওটা বেড়েই চলে । তাই সবথেকে বড় কর্ত্তব্য আছে নিজের ওপর ।

—ঠিক বুঝলাম না ।

—খুব সহজ স্যার ! আমাকে অবলম্বন করেই যখন আমার এই জগৎটা, তখন আমি থাকলে তবে তো আমার জগৎ । তাই আমার ওপর কর্ত্তব্য করলেই জগতের ওপর করা হবে—যেমন ধরুণ....

—তোমার এই 'আমিটি' এলো কোত্থেকে ? কোথায় এর উৎপত্তি ?

—সে খবরে কি দরকার স্যার ? আপনার এই বিরাট কারখানা কাদের রক্ত দিয়ে গড়ে উঠেছে, কাদের শ্রমশক্তিকে অন্যায়ভাবে অপহরণ

করেছে, তার খবর কি রাখেন আপনি ! এর ওপর কর্ত্তব্যই আপনার কাছে বড় হয়ে উঠেছে—কিন্তু ওর গঠনকারীরা····

—থাক—ভেবেছিলাম, তোমাকে দিয়ে একটা জরুরী কাজ করাবো ; তুমি নিত্যানন্দবাবুর ছেলে—নিত্যবাবু আমাদের বহুদিনের বিশ্বাসী লোক...

—হ্যাঁ, স্যার, ওঁর এবার রায়বাহাদুর হওয়া উচিত। অমন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—নেমকের নকর !

—আচ্ছা, যাও তুমি····

—আচ্ছা স্যার, নমস্কার !

চলে গেল যুবকটি ! মিঃ চ্যাটার্জি রূঢ়দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর বেরিয়ে যাওয়া দরজাটার দিকে ! ম্যানেজারবাবু নিজের ঘরে বসে সবই শুনছিলেন, এতক্ষণে ওঠে এসে করযোড়ে বললেন,

—দেখলেন স্যার, কী রকম ছেলে জন্মেছে !

—ছেলে খারাপ নয়। ওর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আমাকেও বিপর্য্যস্ত করে দিচ্ছিল।

নিত্যানন্দবাবুর মুখে একটা প্রসন্ন হাসি মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়েই মিলিয়ে গেল। মুখখানা কাচুমাচু করে তিনি বললেন,

—ওর দ্বারা কী উপকার হবে স্যার আমাদের ?

—হবে ! ওর দ্বারাই মানুষের উপকার হবে। পৃথিবীর এই গণজাগরণকে আর ধাপ্পা দিয়ে রোখা যাবে না নিত্যানন্দবাবু। মানুষের মনে ব্যাক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর ব্যষ্টিস্বাধীনতার বান ডেকেছে। সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে আবার নূতন করে গড়বে তারা—ঐ নবজাত তরুণের দল····

—তাহলে ঝামেলা বাধানোর আর কি দরকার আছে স্যার ! শ্রমিকদের দাবী মিটিয়ে ফেলুন !

—অধিকাংশ দাবীই মেটাতে হবে। তবে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র—হ্যাঁ শুনুন!

নিত্যানন্দবাবু আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন উদ্‌গ্রীব হয়ে!

—তারাপদকে বলে পাঠান, রাত্রি নটার সময় যেন বাংলোয় আমার সঙ্গে দেখা করে। ধর্ম্মঘট কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না। এসময় একদিন কারখানা বন্ধ, মানেই বিস্তর টাকা লোকসান, বুঝলেন?

—যে আজ্ঞে! ম্যানেজার চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চ্যাটার্জি আবার শুধুলেন,

—আপনার ছেলের সঙ্গে তারাপদর কোনো যোগ আছে কি?

—কি জানি স্যার, হয়তো আছে!

—হয়তো নয়, নিশ্চয় আছে! সে বুঝতে পেরেছিল, আমি তাকে তারাপদর বিরুদ্ধে লাগতে চাই, তাই ঐসব আগ্‌ড়ম-বাগ্‌ড়ম কথা বলে আমার মেজাজ খারাপ করবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু....

মিঃ চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ থামলেন, চুরুটটা জ্বালালেন, বললেন,

—কিন্তু ওর বোঝা উচিত যে আমি ওর বয়স পার হয়ে এসেছি; আর আমিই এই কারখানার পত্তন থেকে এতখানি উন্নতির মূলে রয়েছি।

মিঃ চ্যাটার্জি কি বলতে চান বুঝতে না পেরে ম্যানেজার নীরবে অপেক্ষাই করতে লাগলেন। চ্যাটার্জ্জি কয়েকটান চুরুট টেনে বললেন,

—ওকে আমার দরকার হবে ম্যানেজারবাবু! ওর শক্তিকে আমি আমার কাজে লাগাবোই! আচ্ছা নমস্কার!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি উঠলেন। বেরিয়ে গেলেন টুপিটা হাতে নিয়ে। ম্যানেজার নিত্যানন্দ তখনো দাঁড়িয়ে সেই ঘরে। চ্যাটার্জ্জির ঝকঝকে টেবিলটার উপর চকচকে দোয়াতদানীতে তাঁর মুখের প্রতিবিম্ব পড়েছে



মুখখানা অদ্ভুত,—পুত্রের জন্য পিতার দুশ্চিন্তা আর পুত্রের প্রশংসায় পিতার গৌরবদীপ্তি দুটোতে মিলে মুখখানার অদ্ভুত ছবি এঁকেছে দোয়াতদানীর গোল গ্লাসে ; গ্লাস গোল হওয়ার জন্য ছবিটা বেঁটে-বক্র হয়ে সার্কাসের ক্লউনের থেকেও হাস্যকর দেখাচ্ছে! নিত্যানন্দবাবু নিজেকে দেখলেন সেই ছবিতে ; হেসে উঠলেন।

কারখানার সিটি বেজে গেল। দিনের কর্ম্মীরা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। রাত্রের কাজ এখনি আবার পূরোদমে আরম্ভ হবে। ম্যানেজার ঘরের জানালাপথে দেখতে লাগলেন—লোকগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে যে যার বাড়ীর দিকে। শুষ্ক, বিবর্ণ মুখ ; ক্লান্ত দেহটাকে কোনরকমে টেনে চলেছে ওরা। ওরাও মানুষ—ওদের উপরেও কর্ত্তব্য আছে আমাদের —অর্থাৎ এই কারখানার মালিকের। ম্যানেজার নিত্যানন্দ এই কথা আজ ভাবলেন। কেন ভাবলেন—ভেবে দেখতে গিয়েই মনে পড়ে গেল তাঁরই ছেলের বলা কথাগুলো, বিরাট মানবসমাজের একটা বড় অংশকে সত্যি যেন ক্রয় করে রেখেছে এই সব শিল্পপতিরা ; ম্যানেজারও সেই ক্রীতব্যক্তিদের একজন—আজ যেন সেই সত্যটা অনুভব করতে লাগলেন উনি! তাঁরই ছেলে তাঁর মধ্যে পারসোনেলিটি ইন্‌ভেষ্ট করে গেল নাকি? হবেও বা।

নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই পারিপার্শ্বিককে রক্ষা করা প্রয়োজন—প্রকৃতির পরিবর্ত্তনকে পরিপূর্ণ মনে মেনে নেওয়া প্রয়োজন, নইলে মানুষের জীবন ব্যর্থ—পঙ্গু হয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষের জীবন কি সত্যই মুক্তির পথে চলেছে? প্রশ্ন জাগলো নিত্যানন্দবাবুর অন্তরে। মুক্তির সন্ধানে যাত্রা করেছে মানুষ অতীতের কোন এক অজানা দিন থেকে, কিন্তু মুক্তির পথ সে পেয়েছে বলে ইতিহাস তো সাক্ষ্য দেয় না! মুক্তির পথ পেলে মানুষ তো নিশ্চিন্ত-

ভাবে এগিয়ে যেত,—যুগে যুগে পথের পরিবর্ত্তন করবার জন্য তার প্রাণ মাথাঠুকে মরতো না। এই যে আজকার সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এই পথই কি ঠিক পথ! মুক্তির পথ?

ম্যানেজার ভাবতে ভাবতে বেরুলেন ঘর থেকে। ছোট একটু বাগান আছে অফিসঘরের সুমুখে, তার মধ্যে একটা ইউক্লিপ্‌টাস গাছ লম্বা হয়ে আকাশ পানে মাথা বাড়িয়েছে। হাওয়ায় দুলছিল গাছটি মুক্ত স্বাধীন জীবনের আনন্দে। ও মুক্ত—ঐ আদিম জগতের অধিবাসীর আদিম জীবন মুক্ত স্বাধীন—কিন্তু ওর····প্রগতি নেই। ও জড় আর চেতনতার মাঝখানে ঝুলছে। ওর মুক্তি এবং স্বাধীনতার গৌরব ওকে জাগ্রত রাখতে পারে না। কিন্তু মানুষের মুক্তি স্বতন্ত্র মুক্তি জন্মগত অধীকারের মুক্তি, জরা মরণ থেকে মুক্তি! মুক্তি কথাটা অত সোজা নয়—তবু মানুষ মুক্তির সন্ধানে ছুটেছে রাষ্ট্রগত সমাজগত ব্যক্তিগত সন্ধানে।

কে জানে কিছু পাবে কিনা।

রাত অনেকটা হোল, কাকা এখনো ফেরেনি। কৃষ্ণা বসে বসে ভাবছিল। ভাবছিল আরো অনেক কথাই, তার জীবনের কথা, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই আঠারো বছর বয়সের কত স্মৃতি, সুখ, দুঃখ, ব্যথা আনন্দ—সবকে জড়িয়ে তার কাকা। কাকাকেই মা-বাবা-দাদার মত পেয়েছে সে জীবনে। কাকাকেই সে পেয়েছে একমাত্র অবলম্বন রূপে। বাবার কথা সে জানতো না, জানবার দরকারও ছিল না তার, কাকাই বলে দিয়েছিল তার বাবা জেলে আছে, হয়তো এখনো বেঁচে আছে। তাই বাবাকে চিঠি লিখেছিল কৃষ্ণা!

কিন্তু—আরো অনেক কথাই ভাবছিল কৃষ্ণা। বাবার সঙ্গে কাকার বিরোধ লাগবার সূচনা যেন আরম্ভ হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছিল তার।

যদিও ওদের দুভাইএ এখনো ভালোকরে কোনো কথাবার্ত্তাই হয়নি তবু কৃষ্ণার মনে হচ্ছিল ; এর মধ্যে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়ার ভাব যেন রয়েছে ! বাবা যেন কাকাকে ঠিক বিশ্বাসের চক্ষে দেখছে না—কাকা যেন বাবাকে ঠিক বাইরের লোকের মত মনে করছে—যেন এসেছে, দুদিন পরে চলে গেলেই ভালো—ঠিক এই রকম ভাবটা ! কে জানে 'কি ঘটবে !'

কৃষ্ণা নিতান্ত ছোটমেয়ে নয়—যে বয়সে বাঙালীর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সংসার আয়ত্ত করতে পারে কৃষ্ণার প্রায় সেই বয়স। তার চোখে বাবা কিম্বা কাকার ব্যবহারটা যেমন 'ধরি মাছ নাছুই পানি গোছের !' অথচ কৃষ্ণা আশা করেছিল, ওদের দুভাইএর মধ্যে জমাট ভাব জমে উঠবে। কৃষ্ণা ওদের মাঝখানে ঠিক দুই চুম্বকের মাঝে আর্ম্মেচারের মত ঘুরে বিদ্যুৎজ্বালিয়ে চলবে পৃথিবীতে। ঠিক অতখানা আশা না করলেও কৃষ্ণা ভেবেছিল, বাবা তার দেশভক্ত সন্তান, মুক্তি সন্ধানী সৈনিক, আর কাকা তার মানুষের ব্যথা বেদনা অশ্রুমুছাবার জন্য জীবনপনকারী মহামানুষ। মানবশক্তির এই দুটি মহত্বকে একত্র মেলাতে পারলে কৃষ্ণার গৌরব হবে অক্ষয় ! কৃষ্ণার জীবন হবে সার্থক—কিন্তু সেই পৌরাণিক যুগের কৃষ্ণাই কি পেরেছিল অমিত পরাক্রম দুর্য্যোধনের সঙ্গে জ্ঞান-সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় যুধিষ্ঠিরের মিলন ঘটাতে ? পারেনি বরং তারই জন্য বাঁধলো ভাইএ ভাইএ বিবাদ। ভারতের ভ্রাতৃবিবাদ ঐখান থেকেই সুরু—ঐ ভ্রাতৃবিরোধ না লাগলে ভারতে হয়তো সত্য যুগের ন্যায়ের রাজত্ব আবার সুরু হোত। কিন্তু তার বদলে হোল ক্ষাত্র-শক্তির বিলোপ—এর মূলে ছিলেন কূটচক্রী শ্রীকৃষ্ণ ! কেন তিনি এই ভাবে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিয়ে ভারতের ক্ষাত্রশক্তিকে দুর্বল করে দিলেন ! ভারতকে বিভক্ত করে দিলেন খণ্ডে খণ্ডে, আজকার ইতিহাস খুঁজে তার হদিশ পাওয়া যায় না, কিন্তু মনে হয়, আপনার প্রভুত্বকে কায়ামী রাখবার জন্যই

তিনি ঘটিয়েছিলেন ঐ বিরোধ—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কৃষ্ণার—শ্রীভগবান রূপে পূজিত সেই অদ্বিতীয় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এসব কি চিন্তা করছে কৃষ্ণা—পাপ হবে যে!

কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা কৃষ্ণা কাকার কাছ থেকে পেয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো তথ্যকে, তত্ত্বকে, ইতিহাসকে উপকথাকে বিশ্লেষণ করে তার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করাকে সে পাপ বলে মনে করে না। তার মনে প্রশ্ন জাগছে আজ—এতবড় একজন রাজনীতিজ্ঞ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ কেন ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিয়ে ভারতের সর্ব্বনাশ করে গেছেন? তার পূর্ব্বে রাম লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেমই ছিল আদর্শ! মহাভারতের যুগেও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর রাজ্যলাভের জন্য কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি—আপত্তি হোল দুর্য্যোধনের আমলে। দুর্য্যোধন অতি মন্দলোক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে রফা করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কঠিন হোত না। ওদিকে দুর্ব্বল পাণ্ডব-পক্ষে আপনার সকল রকম সাহায্য দান করে, এমন কি অর্জ্জুনের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিয়ে সম্পর্কটি পাকা করে তিনি কুরুকুলকে ধ্বংস করলেন। বিশাল ভারতের বীরকুলও সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল—রইল যে কজন, তারা শ্রীকৃষ্ণের দাস হয়েই রইল। ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যে এই বিপর্য্যয় কেন যে তিনি ঘটিয়ে গেছেন, কে জানে!

ভ্রাতৃবিরোধ তার পর থেকে এমনি প্রভাব বিস্তার করেছে যে প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।' তার পূর্ব্বে কিন্তু ভাই ভাই একঠাঁই-ই ছিল। এক মায়ের জঠরে, এক বাপের বিষয়ে, এক পরিবারের গণ্ডীতে তারা সুখেই বাস করতো।

পরাধীন ভারতের পরানুগৃহীত জীবন আজ বৈদেশিক বুলি আউড়ে বড় বড় সভা ডাকে—বক্তৃতা করে—'বিশ্বের মানব এক হও, বিশ্বের মজুর এক হোল' বলে চীৎকার করে, কিন্তু তার ঘরের মধ্যে তার ভাইএর

সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে যে সে এক হয়ে চলতে পারে না—সে কথা কি সে ভেবে দেখে? এমনি এক আশ্চর্য্য শিক্ষা এদেশে চলেছে, এদেশের প্রাচীন নৈতিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে অবলুপ্ত করে এমন কৌশলী শিক্ষা বিস্তার করা হয়েছে যে বাপের নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে ছেলের নৈতিক মানদণ্ডের পর্ব্বত প্রমাণ তফাৎ। বাবা যেটাকে কর্ত্তব্য বলে মনে করেন, ছেলে সেইটাকেই অকর্ত্তব্য মনে করতে শিখেছে। পরিবার-গত একত্বের বন্ধনকে ভেঙে ফেলবার জন্য প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের শিক্ষাপ্রদ্ধতিকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। হাজার রকম "ইজ্‌মে" কীটকীর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করতে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ একটা ইজ্‌মএর সঙ্গে অন্যটার তফাৎ ধরতে না পেরে স্বকল্পিত এক অদ্ভুত 'ইজ্‌ম' নিয়ে মেতে উঠছে। ধর্ম্মবাদকে লুপ্ত করা হয়েছে—নীতিবাদকে উপহাসের বস্তু করে তোলা হয়েছে—আদর্শবাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই। এই শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তারা এবং পরিচালকরা ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আমাদের শৈশবজীবনের প্রথম স্তর থেকেই।

কিন্তু এর প্রতিকার যাঁরা করতে পারেন—নেতারা—তাঁরা কি এসব কিছু ভাবেন না! কি জানি, ভাবেন কি না! স্বাধীনতা হীনতায় মানুষ শুধু যে মননশীলতার সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলে, তাই নয়, পরের চিন্তাটাকে নিজের চিন্তা মনে করে উল্লসিত হয়। যে চিন্তাধারা অপর দেশের, অপর জাতির, অন্য জলবায়ুর উপযুক্ত, পরাধীন দেশের মানুষরা সেই পররাষ্ট্রের চিন্তাধারাকেই নিজের মৌলিক চিন্তা মনে করে গ্রহণ করতে চায়—পরাধীনতার এইটাই হোল সবথেকে বড়ো অভিশাপ। স্বাধীনতার আর যে কোনো সার্থকতাই থাক না কেন—স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি অর্জন করাই তার সব থেকে বড়ো সার্থকতা—কিন্তু…

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল এইসব কথা ; ওর ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। ক্লান্তি বোধটা মানসিক। মনটা যেন ওর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে এই একটা দিনের মধ্যেই। বাবা গেছে সহরে—বলে গেছে—অশ্বিনীবাবু বাড়ীটা ফেরৎ দিতে চাইবেন না—অথচ ওবাড়ী ভাগ যখন হয়নি তখন তারাপদর অধিকার নেই সামনের অংশ বিক্রী করবার। সহরে গিয়ে উকিলের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে কালীপদ আগামী কাল মামলা দায়ের করে ফিরবে। দেখে নেবে—অশ্বিনীবাবু কি করে ঐ জমিতে বাড়ী তৈরী করান !—সেই একগুঁয়ে সাঁওতাল কালীপদ আবার জেগে উঠেছে।—যে কালীপদকে কৃষ্ণার মা চিনতো তারাপদও চেনে, কিন্তু কৃষ্ণা সে কালীপদকে কখনো দেখেনি। বাবার বেরুবার সময় কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে বলেছিল—থাক্‌গে বাবা, আমরা তো এদিকটায় বেশ আছি—খামোখা মামলা করে লাভ কি !

উত্তরে কালীপদ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে শুধু বলেছিল,

—ও জমি আমার চাই-ই !

সে মূর্ত্তি কৃষ্ণা জীবনে ঐ প্রথম দেখলো। ওর বাবার মূর্ত্তি—যে বাবার জন্য কৃষ্ণা তার তরুণ জীবনের বহুপ্রহর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যয় করেছে, বহু চিন্তার অনিদ্রাকে প্রশ্রয় দিয়েছে—বাবা যদি তার থাকতো ! ভেবে কিন্তু বাবার আজকার এই যোদ্ধবেশ কৃষ্ণাকে যেন মিইয়ে দিল! কালীপদ চলে যাওয়ার পর সে ঘরের কাজে মনকে লিপ্ত করবার চেষ্টা করলো, কোনো কাজে মন লাগানো যায় না। কাকা দুপুরে খেয়ে বেরিয়ে গেছে, ফিরবে রাত্রে। কৃষ্ণা রান্না করে বসেই আছে, সাড়ে নটা বাজলো—কাকা তার এখনো ফিরচে না। কৃষ্ণা যত কথা ভাবছিল বসে বসে, তার মধ্যেও ক্ষণেক্ষণে জেগে উঠছিল তার বাবার সেই মুখখানা জ্বলন্ত চোখদুটো।



কিন্তু কৃষ্ণার কাকার মুখখানাও মনে পড়ছিল: সেই সঙ্গে। দুটো মুখে কী প্রকাণ্ড প্রভেদ! হোলইবা বাবা—কৃষ্ণা ভাবতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করলো না যে কাকার সৌম্য সুন্দর মুখের সঙ্গে বাবার মুখের তুলনাই হয় না। কিন্তু তার বাবার মুখে এমন একটা দৃঢ়তার ছাপ আছে যা কৃষ্ণা আর কারো মুখে কখনো দেখেনি। কৃষ্ণার মনে পড়ল, ঐ তার বাবা একদিন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সৈনিক হয়ে অমিত বিক্রম বৃটিশ-সিংহকেও বিচলিত করে তুলেছিল; পরাধীনতার নিষ্ঠুর নিগড়কে সবলে চূর্ণ করবার জন্য তার বাবা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে গিয়েছিল—জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল—ফাঁসী কাষ্ঠের ভ্রূকুটিকেও ভয় করেনি! আজ তার কেন এতখানি পরিবর্ত্তন! কে ঘটিয়েছে এই পরিবর্ত্তন? কে তার চরিত্রের সেই সুদৃঢ় বিশেষত্বকে এমন করে কেড়ে নিয়েছে!—কৃষ্ণা ভেবে ঠিক করতে পারলো না!

উনিশ শো পাঁচ সাল থেকে বিপ্লববাদের ইতিহাসটা আর একবার পর্য্যালোচনা করলো কৃষ্ণা। উনিশ শো পাঁচ, উনিশ শো চোদ্দ, উনিশ শো কুড়ি, নন্‌কো-অপারেশন, লবণ আন্দোলন, অগাষ্ট-আন্দোলন........ কিন্তু অতদূর যাবার কি দরকার! কৃষ্ণার মনের পটে ভসে উঠলো কয়েকজন বিখ্যাত বিপ্লবীর ছবি, সারা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম যুগের প্রবর্ত্তক,—তাঁদের মধ্যে যাঁরা কারাগারে কিম্বা ফাঁসীকাঠে মৃত্যুবরণ করেছেন—তাঁরা নমস্য হয়েই রয়েছেন জাতির মনের মধ্যে, কিন্তু যাঁরা ফিরেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পরিবর্ত্তিত হয়ে ফিরেছেন। সে পরিবর্ত্তন হয়তো বাহ্যিক, হয়তো তার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত দেশপ্রেম চিরজাগ্রতই রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে আজ তাঁরা প্রায় সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে এসেছেন। কেউ কেউ অবশ্য এখনো তেমনি উগ্র, তেমনি অসাধারণ, তেমনি জ্বলন্ত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত

কম। কেন হয় এই পরিবর্ত্তন? জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন যৌবনকে যাঁরা দেশমাতৃকার বেদীমূলে বলি দিয়ে এলেন, তাঁরাই কেন জীবনের অপরাহ্ণের পাণ্ডুর ক্ষণটা পরপদলেহনের বিলাসিতায় ব্যয় করতে ছোটেন। এই অভিশাপ, স্বাধীনতা-হীনতার এই অভিশাপ জাতিকে দিনে দিনে দুর্ব্বল করে আনছে। আজ যে তরুণ জীবনের সর্ব্বশক্তি দিয়ে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচন করবার জন্য ব্যগ্র, উন্মুখ, আত্মদানেচ্ছুক, কয়েক বছর পরে সেই হয়তো সরকারী চাকরীর বিরাট গদিতে বসে তারই মত একজন দেশসেবকের দণ্ডবিধান সমর্থন করবে। এমনি ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে থাকবে। এর প্রতিকার নেই!

বাবার গৌরবে গরবিনী কৃষ্ণার মুখখানা আজ অন্ধকার। কিন্তু কাকা তার শক্তিমান। কাকাকে সে চেনে। কাকা অটল, অবিচল থাকবে তার নিষ্ঠায়, আর অবিচল থাকবে কৃষ্ণা স্বয়ং। জীবনের সর্ব্বশেষ ক্ষণটিকেও কৃষ্ণা স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় দান করে যাবে। কৃষ্ণার ওষ্ঠপ্রান্ত দৃঢ় হয়ে উঠলো।

—কৃষ্ণা!

কে ডাকে! কৃষ্ণার কাণে আওয়াজটা ঠিকই পৌঁছেছে, কিন্তু আর একবার ডাক শোনবার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দরজার থেকে আবার ডাক এল, —কৃষ্ণা! দরজা খোল!

—যাই—কৃষ্ণা উঠে আসছে! একলাঘরে আছে সে। কণ্ঠস্বরকে ভালো করে না চিনে দরজা খোলা তার নীতি নয়। চেনা কণ্ঠস্বর, এমনকি, কৃষ্ণার বিশেষ রকম চেনা কণ্ঠ, তবু কৃষ্ণা এই লোকটির সঙ্গে কাকার অসাক্ষাতে কখনো কথা কয় নি! সেই কথা মনে পড়ে ওর গতি একটু মন্থর হোল, কিন্তু আবার ভাবলে, ওর পেছনে কাকাও হয়ত আছে। কিন্তু না, কাকা থাকলে কাকাই ডাক দিত—মা-মনি!

—কাকা নিশ্চয় এখনো ফেরে নি! কাকার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়ে উঠলো কৃষ্ণার। হঠাৎ তার পায়ের গতি অত্যন্ত বেড়ে গেল, যেন ছুটছে। গেটটা খুলেই বললো—কাকা আসেন নি?

—না, তাঁর আসতে দেরী হবে—বলতে বলতে অশনি এসে ঢুকলো উঠোনে। সাইকেলটা ঠেসিয়ে রেখে বললো—তোমার বাবা কোথায়?

—সহরে গেছে; আজ ফিরবে না—কৃষ্ণা গেট আবার বন্ধ করে দাঁড়ালো। অশনি ম্লান চন্দ্রালোকে একবার চাইলো কৃষ্ণার সর্ব্বাবয়বের পানে। কৃষ্ণা আনত মুখে দাঁড়িয়েছিল। সুন্দর! আকাশের মত অনায়াস, পৃথিবীর মতই পরিচিত; কিন্তু ও আবার আকাশের মতই রহস্যময়ী, পৃথিবীর মতই মূক! অশনি আধমিনিট পরে বললো, —তোমার বাবা সহরে কেন গেলেন? কী এমন দরকার পড়লো হঠাৎ?

—আমি সব ঠিকমত জানি নে। বাবা এসেই বলবেন! কিন্তু কাকার কেন দেরী হবে?

কৃষ্ণা কথা পালটাতে চায়, বুঝলো অশনি, বললো,

—আমাদের মালিক মিঃ চ্যাটার্জ্জি ওঁকে দেখা করতে বলেছেন নটার সময় তাঁর বাংলোয়!

—ও, কিন্তু কাকা একা কেন গেল! আপনি সঙ্গে যেতে পারলেন না!

—তোমার কাকার শক্তিতে কি এতোটুকু বিশ্বাস নেই তোমার! —হাসলো অশনি—বললো, একা গেছেন তো হয়েছে কি? মিঃ চ্যাটার্জ্জি বাঘভালুক নন—বাংলোটাও বনজঙ্গল নয়!

—আপনি জানেন না—কৃষ্ণা ফুঁপিয়ে উঠলো যেন—ধনিকরা বাঘ-

ভালুকের থেকে বেশী ভয়ঙ্কর—কাকাকে একা ছেড়ে দেওয়া আপনার খুব অন্যায় হয়েছে!

—হুঁ—অশনি একটু থেমে বললে—তুমি কি মনে করো, আমি যেতে চাইলেই তোমার কাকা আমায় নিয়ে যেতেন? মিঃ চ্যাটার্জি তাঁর সঙ্গে একা দেখা করতে চান, গোপনে।

—কিন্তু আমাদের দাবীর মধ্যে গোপনতা কিছু নেই। রাত ন'টার পর নির্জনে বাংলোর মধ্যে কাকাকে কেন তিনি ডাকলেন? —কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত, তীক্ষ্ণ এবং করুণ!

—সর্ত্তগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা হবে হয়তো!

—সে-আলোচনা দিনের বেলা আফিসঘরেই তো হতে পারতো! আপনি যান—আপনি কাকাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন........যান আপনি!

অশনি হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কৃষ্ণার কথার ধাক্কায় যেন নড়ে উঠলো,—আমায় তিনি একটা খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন........শোনো,—একটা ঢোক গিললো অশনি!

—বলুন শীগ্‌গির!—কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর উৎকন্ঠিত।

—কাকা জানেন না নিশ্চয়ই যে তোমার বাবা সহরে গেছেন। তোমার বাবাকেই তিনি বলতে বলেছেন যে উনি আজ রাত্রে এখানে ফিরবেন না!

—কেন? কেন ফিরবেন না? কোথায় থাকবেন তিনি!

—কোথায় থাকবেন সেটা এখনো ঠিক করেন নি—তবে এতোবড়ো পৃথিবীতে থাকবার যায়গার অভাব হবে না!

—খুব হয়—থাকবার যায়গারই অভাব হয় আমাদের! পৃথিবীতে যে ধনিকের দেড় কাঠা যায়গার দরকার সে দেড়শো' বিঘে অকারণে

আটকে রেখেছে, আর যার মাথা গুঁজবার যায়গা চাই দেড়হাত মাত্র, তার জন্য খোলা আছে আকাশের তলা!

—কিন্তু সেটা খুব খারাপ যায়গা নয় কৃষ্ণা, উদার মুক্ত আকাশের তলা!

—মুক্ত কোথায়! ওরা আইন করেছে, ওদের সৌখীন সঁহরের মুক্ত আকাশতলে ওরাই থাকবে। আমরা আশ্রয় নিতে গেলেই ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে।

—ওদের সৌখীন সহর ছাড়াও তো আকাশের বিস্তার অনন্ত কৃষ্ণা।

—কিন্তু মুক্তি সেখানেও বিস্তৃত নয়। আজ আর পৃথিবীর কোনো যায়গা মুক্ত নয়, স্বাধীন নয় আমাদের জন্য। পৃথিবী জুড়ে ওরাই বাস করছে। ওদের হাত থেকে কেড়ে নিতে না পারলে আমাদের জন্য একহাত আকাশও মুক্ত নেই! যে আকাশটুকু আমাদের জন্য রয়েছে, সেটুকু বন্দী, বন্ধবায়ুতে বিষাক্ত—কিন্তু কেন আপনি সময় নষ্ট করছেন! যান, কাকাকে ডেকে আনুন........আমার বিশেষ ভাবনা হচ্ছে।

—ভাবনার কিছু নেই! কিন্তু উনি আজ আসবেন না, আমায় বলে পাঠালেন!

—কেন! কেন আসবে না কাকা? বাবার সঙ্গে এমন কিছু কথা তো হয় নি তার।

—না—কিন্তু উনি বুঝেছেন, তোমার বাবার সঙ্গে একঘরে বাসকরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কোনকিছু বলাবলি-হওয়ার অপ্রীতিকর অবস্থাটা এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি আজ থেকেই সরে থাকতে চান!

—আর আমি? আমায় রাখবে কোথায় কাকা!

—তুমি তোমার বাবার কাছেই থাকবে, এই কথা উনি তোমায় জানাতে বললেন! আচ্ছা, আমি চললাম।

অশনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তারপরও গেটটা খোলাই রয়েছে।
—কৃষ্ণা কাঠের মত দাঁড়িয়ে তখনো উঠোনে।

মনিবদের কেউ এলে এখানে থাকবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। মস্ত বড় বাংলো বাড়ী, সামনে প্রকাণ্ড বাগান। গাড়ী রাখবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি তো আছেই—বেশির মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটা পুকুর, তার মাঝখানটা দ্বীপের মত করে তাতে একটি ছোট একতালা ঘর। ঘরখানি সুন্দরভাবে সাজানো—দেখলেই বোঝা যায়, সুরুচিসম্পন্ন সৌখীন কোনো বিলাসীর প্রমোদভবন। প্রমোদও যে এখানে মাঝে মাঝে না হয় এমন নয়, তবে সে কদাচিৎ। দ্বীপের সেই ঘরটিতে পৌঁছাবার জন্য দুখানি সুন্দর নৌকা সবসময় মজুত থাকে। ঐ নৌকায় আবার জলবিহারও করা যায়—বেশ এলাহি ব্যবস্থা!

মিঃ চ্যাটার্জি সেই ঘরটিতেই ছিলেন। তারাপদকে নৌকায় চড়িয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া হোল। ঘরের বাইরেই একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিলেন চ্যাটার্জি—এখান থেকে ওদিকের নদীটির দৃশ্য দেখা যায়, বেশ সুন্দর দৃশ্য। তাই হয়তো দেখছিলেন তিনি। তারাপদ পৌঁছাতেই মাথাটা একটু তুলে বললেন,—আসুন মিঃ গাঙ্গুলী! বসুন! —পাশের ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন তারাপদকে।

বসবার মত অন্য আর কোনো আসন ওখানে না থাকায় তারাপদকে বসতে হোল প্রকাণ্ড সেই ইজিচেয়ারখানায়। আর কেউ হলে মনিবের কাছে বসতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠতো, কিন্তু তারাপদ সে ধাতুতে গড়া নয়—সে বসলো।

—ভারী চমৎকার দৃশ্য। ঐ নদীটা আপনাদের গ্রামের পাশ দিয়েই গেছে—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! তারাপদ খুবই সংক্ষেপে জবাব দিল।

—ওতে নৌকা চলে না?

—না—শুকিয়ে যায় জল। বর্ষায় জল অবিশ্যি হয়, কিন্তু তখন স্রোত বড় বেশী থাকে।

—ওঃ! আপনার বাড়ী থেকে কত দূর ঐ নদীটা?

—কাছেই—পাঁচমিনিটের রাস্তা!

তারাপদর উত্তরগুলো যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত! কিন্তু তাকে এখানে ডেকে এনে ঐ প্রায়-অদৃশ্য নদীর কথা শুধোনো হচ্ছে কেন, সেইটাই তারাপদ ভাবছিল। নদী দিনের বেলা ভালই দেখা যায় এখান থেকে, কিন্তু এই রাত্রের ম্লান জ্যোস্নায় ও নদী চোখে দেখার থেকে কল্পনা করা সহজ! কিন্তু চ্যাটার্জি আবার বললেন।—মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ? ঢের? তাহলে বর্ষায় তো আপনার বাড়ী থেকে খুব ভালো সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন?

—আজ্ঞে না! ধনপ্রাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাতদুপুরে বান ডাকলে জীবনটা সামলাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়ি—সৌন্দর্য্য দেখবার সময় পাই না।

—হ্যাঁ, তাতো বটেই। বানভাসি খুব বেশি হয় নাকি আপনাদের গ্রামে?

—হয় প্রায় প্রতিবছরই। নদীধারের জমিগুলো তো বালি পড়ে নষ্টই হয়ে গেল। একটা বাঁধ দেবার চেষ্টা করেছিলাম আমি বছর কয়েক আগে, তা টাকার অভাবে……

মিঃ চ্যাটার্জির চোখ জ্বলে উঠলো অন্ধকারে। ঘাড় তুলে বললেন,—টাকার অভাবে হোল না? কেন, গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, দেশের বড় বড় ধনি……

—হ্যাঃ! হ্যাঃ!—হাসলো তারাপদ। হাসিটা হায়েনার মতই শোনাচ্ছে হয় তো—বললো,—ওসব নাম শুনতেই বেশ ভাল মিঃ চ্যাটার্জি! ওঁরা আছেন, ওঁরা থাকুন, তবে আমাদের মত গরীবদের পক্ষো ওঁদের থাকা-না-থাকা সমান কথা। ওঁদের কাছ থেকে বাণী পাওয়া যায়, বক্তৃতা পাওয়া যায়—পাওয়া যায় না বাঁচবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনোকিছু! ওঁদের কথা থাক—আমি চেষ্টা করেছিলাম গরীবদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে গরীব ছেলেমেয়েদের খাটিয়ে ওটা করে ফেলবো, সেটাও ওঁদের, ঐ বড়লোকদের সইল না; ওঁরা সদরে খবর দিলেন, আমি নাকি সম্পত্তি বাগাবার চেষ্টা করছি। সরকারে খবর দিলেন, আমি নাকি দলপাকিয়ে বৃটিশরাজত্ব উচ্ছন্ন করতে যাচ্ছি, গ্রামের ধনীদের মধ্যে রটনা করলেন—চাঁদা করে টাকা তুলে আমি নাকি নিজে গুছিয়ে নেবার মতলবে আছি। কিন্তু যাক সেসব কথা, আমায় কেন ডেকেছেন?

—না মিঃ গাঙ্গুলী, ওসব কথাও দরকারী কথা, তাই শোনবার জন্যই আপনাকে আমি ডেকেছি। এখানেই খাবেন রাত্রে! হ্যাঁ, শুনুন, কত টাকা খরচ হতে পারে বাঁধটা বাঁধাতে?

—আটদশ হাজার টাকার কম নয়—বলে তারাপদ কি যেন ভাবতে লাগলো।

—বেশ, আমি দিচ্ছি দু' হাজার, আর জিলাবোর্ড এবং গভর্ণমেণ্ট থেকে যাতে ভাল সাহায্য পান, তারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; তাছাড়া বড় বড় লোক যাঁরা আছেন.......

—আপনি কেন এতো করবেন মিঃ চ্যাটার্জি? আপনার এতে স্বার্থ কি?

—স্বার্থ!—মিঃ চ্যাটার্জি এরকম প্রশ্নের আশা করেন নি—বললেন,

—নিঃস্বার্থভাবে কি কোনো কিছুই করতে নেই মিঃ গাঙ্গুলী? আর স্বার্থও রয়েছে। কারখানার কাছাকাছি ঐসব গ্রাম থেকে বহু 'লেবার' আসে খাটতে, তাদের তো বাঁচাতে হবে আমায়। আমার অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মী, যেমন ধরুন আপনি, ঐ গ্রামেই বাস করেন! ও-গ্রামকে বাঁচানো আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

—ধন্যবাদ! আপনার কথায় যদি ঐকান্তিকতা থাকে মিঃ চ্যাটার্জি, তাহলে আমি স্বীকার করছি, আপনি ধনিক মনোবৃত্তির বাইরেই আছেন।...কিন্তু আমি এসেছি আমার সহকর্ম্মীদের বাঁচবার মত প্রয়োজনীয় কয়েকটা দাবী নিয়ে........সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা হলে আমি খুসী হব।

—ওর আর আলোচনার কি আছে? আপনাদের আঠারো দফা দাবীর চোদ্দটা আমি মেনেই নিলাম! শ্রমিক আন্দোলন যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছে দিনে দিনে, ওদের দাবী না মেনে উপায় নাই আর।

—কোন্ চারটা মানতে পারছেন না?—তারাপদ বিনীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলো!

—ঐযে, জাতীয় পতাকা ইত্যাদি তুলে সভাসমিতি করা আর সেদিন কারখানা বন্ধ করা! দ্বিতীয়, কারখানার ফালতু লোক ছাঁটাই! ওটা আমাদের করতেই হবে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় বুঝছেন তো, কাজ অনেক কমে গেছে!

তৃতীয় এবং চতুর্থ নম্বর শোনবার জন্য তারাপদ অপেক্ষা করতে লাগলো। মিঃ চ্যাটার্জি প্রায় দুমিনিট চুপ করে থেকে বললেন—মজুরী নিশ্চয়ই বাড়ানো হবে—কিন্তু প্রত্যেক শ্রমিককে অংশ হিসাবে কিছু দেওয়া অসম্ভব। এ দাবী ডিরেকটারস্ বোর্ড অনুমোদন করবেন না! তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না—ওটা এখন থাক! আর কারখানার

কেউ কোনো এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ তো দিতেই হয়। তবে এমনি সাধারণ ভাবে কেউ মরলে আমরা তার কি করতে পারি?

—পারেন করতে, তবে করতে চান না। বেশ, এই কটা শর্ত্ত আপনি জানতে পারছেন না! আমি আমার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো আমাদের মতামত....। তারাপদ উঠবার জন্যই উঠতে যাচ্ছে, মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—ওকি! উঠছেন কেন? খেয়ে যাবেন আপনি! সহকর্ম্মীদের জানাবার কি আছে আর! আপনিই সব, আপনার বুদ্ধিতেই চলে ওরা; ওদের আবার মতামত কি?

তারাপদ বিস্ময় বোধ করলো, কিন্তু সেভাব গোপন করে হেসে বললো—আজকাল ওরা আর আগের দিনের শ্রমিক নেই স্যার! ওরা বোঝে, ওরা মতও দিতে পারে, আর যারা পারে না, তাদেরকেও শেখাতে হবে—সেইটেই আমার কাজ!

—কি বলছেন?

—বলছি যে ওর মধ্যে যারা জানে না, ওদের বাঁচবার অধিকার আছে, তাদেরকে আমরা জানাবো? তাদের অধিকার দাবী করতে শেখাবো—তাদের মূক মুখে ভাষা দেব—আমার জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্য!

—কিন্তু আপনার ঘর বাড়ী সংসার?

—নেই! আমি নিজের জন্য আপনার কাছে কিছুই চাইছি না।

—শুনেছি, আপনার একটি ভাইঝি আছে, তার বিয়ে দেওয়াও দরকার অথচ মাইনে তো আপনি অতি সামান্য পান।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার বিয়ে আর আমায় দিতে হবে না, তার বাবা এসে গেছে। না এলেও আমি বিয়ে তার দিতাম না—তার জন্য ভাবিও নি কোনোদিন।

—বিয়ে দিতেন না? আপনি তো অদ্ভুত লোক দেখছি!

—হ্যাঁ! বিয়ে যদি সে করতে চায়, নিজেই করবে, আমি কেন দিতে গেলাম! আর, যে তাকে বিয়ে করবে সেও নিজেই করবে—এই আমার মত........নমস্কার।

—না খেয়ে যাবেন না তারাপদ বাবু! চলুন, আপনাকে খাইয়ে দিই-গে!

মিঃ চ্যাটার্জি উঠে পড়লেন। তারাপদ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এতটা হৃদ্যতা এবং আতিথেয়তার হেতু কি! চিরকালের ধনিক চ্যাটার্জি আজ এতখানি উদার হয়ে উঠলেন কেন! কোন যাদুমন্ত্রে! কিন্তু খেয়ে না-যাওয়া অত্যন্ত অভদ্রতা। তারাপদ মিঃ চ্যাটার্জির পিছনে পিছনে এসে নৌকায় উঠলো।

খাবার আয়োজনটাও বাড়াবাড়ি রকমের। মিঃ চ্যাটার্জিও খেতে বসেছেন একসঙ্গে।

—জাতীয় পতাকা তুলে সভাসমিতি কেন করতে চান আপনারা? —মিঃ চ্যাটার্জি শুধুলেন—

কারণ, আমাদের জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত করতে চাই এদের মধ্যে.......।

—কিন্তু এটা কর্ম্মক্ষেত্র; এখানে রাজনৈতিক কোনো হুজুগ বাধানো কি ঠিক হবে?

—আজকার দিনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি মানুষই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র আজকার দিনের জীবনে এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে যে কোনো মানুষই রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না......তাছাড়া........তারাপদ থামলো।

—বলুন বলুন! আপনার মতবাদ শুনবার জন্যই আমি ডেকেছি আপনাকে!

—হ্যাঁ, যে জাতি স্বাধীনতা হারিয়ে শতাব্দিকাল ধরে অপর জাতির শাসনে এবং শোষনে অবসাঙ্গ, রোগে-শোকে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, আত্মীয়বিরোধ এবং আত্মধিক্কারে যে-জাতি আজ মরণের পথে এসে নির্জ্জীবপ্রায়—তাকে সর্ব্বক্ষণ জাতীয়তার বাণী দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেক্ষণে সে জাতীয়তাকে ভুলবে, সেইক্ষণেই তার মরণ হবে। আমরা এই কারখানার শ্রমিক হলেও এই দেশেরই মানুষ, এবং পরাধীনতার শিকলে বন্দী। সেই বন্দীত্ব থেকে মুক্তির জন্য নেতারা যতখানি সজাগ, আমাদের গণ-শক্তি তার থেকে কিছুমাত্র কম সজাগ হলে চলবে না—বরং বেশি সজাগ থাকতে হবে আমাদের; আমরাই নেতা তৈরী করবো! অর্থাৎ আমাদের নির্ব্বাচনেই নেতার নেতৃত্ব টিকে থাকবে।

—আজ যারা নেতৃত্ব করছেন……মিঃ চ্যাটার্জি থেমে বললেন, —তাঁদের অনেকেই বুর্জোয়া শুধু নন, হাড়ে হাড়ে ক্যাপিটেলিষ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদী!

—হোক! আজকার নেতৃত্ব হয়তো পুরোপুরি গণ-নির্ব্বাচিত নেতৃত্ব নয়, হয় তো তাঁদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্বের আওতায় সুযোগ সন্ধানী, কিন্তু একটা জাতির জীবনে আজকার দিনটাই দিন নয়, আগামী কালও আছে, আর সেই জন্যই আমরা তৈরী হব, আমাদের পরবর্ত্তীদেরও প্রস্তুত করে যাব!

—বেশ, আমি আপনাদের ওপ্রস্তাবটাও, অর্থাৎ জাতীয় পতাকা অভিবাদন আর মাঝেমাঝে সভাসমিতি করাতেও সম্মতি দিতে পারি, যদি আপনি স্বয়ং সমস্তটার ভার নেন, আর আমায় কথা দেন যে

কোনোরকম গোলোযোগ কথনো ঘটবে না·······মানে, আপনিই সবটা কণ্ডাক্ট করবেন, কন্ট্রোল করবেন। কারখানার ক্ষতি না হয়, এটাও তো আপনাকে দেখতে হবে !

তারাপদর মনে হোল, এমন উদার মহান মালিক এযুগেও আছে তাহলে ! ইনি কি সত্যিই এতোটা উদার, দেশাত্মবোধে এতখানি উদ্বদ্ধ ! আপাতঃ দৃষ্টিতে মিঃ চ্যাটার্জির কথায় ঐকান্তিকতার অভাব নেই। শ্রমিকদের অসন্তোষ মেটাবার জন্যই উনি কলকাতা থেকে এসেছেন। ওর আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করা উচিৎ হবে না হয় তো ! কিন্তু·ওঁর প্রস্তাবগুলির ফাঁকে ফাঁকে কোনো মারাত্মক উদ্দেশ্য লুকোনো নেই তো ? তারাপদ ভাবতে লাগলো কি উত্তর দেবে, কেমন ভাষায় দেবে উত্তর।

—রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা আজ সকল মানুষের মধ্যেই জেগেছে—মিঃ চ্যাটার্জিই বললেন,—ওকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা। শ্রম-চেতনাতেও মানুষ খুব বেশি অগ্রসর, এই কারখানা যে শ্রমিকের শ্রমেই গড়া—শ্রমের মুল্যেই যে পণ্য মুল্য নির্দ্ধারিত হয়—এ সত্য আজকার বালকও জানে।

মিঃ চ্যাটার্জি থামলেন একটুক্ষণ, তারাপদ অপেক্ষা করতে লাগলেন, কি উনি বলেন, শোনবার জন্য ; উনি বলতে লাগলেন,—

—বিশাল এই ভারতের চল্লিশ-কোটি মানুষকে শাসন করার অধিকার যে বৃটিশের নেই, এটা তারাও বোঝে, তাই বার বার মিশন পাঠাচ্ছে, প্রস্তাব পাঠাচ্ছে—মহাত্মাজীও বলছেন,—"স্বাধীনতা আজ আর দূরে নহে"........

—বলছেন, কিন্তু কাজ তো কিছু হচ্ছে না।—তারাপদ যেন স্বপ্নঘোরেই কথা কইলো। ওর অন্তরের অন্তস্থলে যে বাণী সুপ্তির

কোঠায় মগ্ন থাকে, সেই বাণীই যেন মূর্ত্তি ধরছে... সব শেষ হয়ে যাচ্ছে! শিক্ষা-সংস্কৃতি—নৈতিক মেরুদণ্ড, জন্মগত নৈপুণ্য, জাতিগত বৈশিষ্ট ......কি আছে আর? আজও যদি আসে স্বাধীনতা, তাহলে জাতির এই ভস্মস্তূপেই আবার আগুন জ্বলে উঠবে—আবার সোনার ভারতের সোনায় সোনার মানুষ তৈরী হবে—আবার ভারতের ধর্ম্মবাদ, কর্ম্মবাদ, জীবনবাদ—জীবনবেদ পৃথিবীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে—উৎকর্ষতা দেবে, উদ্ধার করবে অত্যাচার, অশান্তি আর আত্মধ্বংসকারী ঈর্ষা-দ্বেষ হিংসা থেকে! সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীর উদ্গাতা ভারত,—ভারতই, শোনাতে পারে সেই অতিমানুষের গান।—আজও তার প্রসুপ্ত-অন্তরে জাগ্রত আছে সেই বাণী........যে বাণী বিশ্ববাসীর অন্তরের স্বপ্ন........

মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনু রক্খে।
এবং পি সর্ব্বভুতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।
মেত্তঞ্চ সর্ব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমানং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা শয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিটঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ।—সুত্তনিপাত (৪৪) ১.৮.৭.

"সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অপরিমান প্রেম, সর্ব্বলোকের উপর অপরিমান মৈত্রী, হিংসাহীন, বাধাহীন শত্রুতাহীন অপরিমেয় দয়া......উঠতে বসতে, চলতে শুতে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ মৈত্রী ভাবে অধিষ্ঠিত থাকবার কথা" এই ভারতই শুনিয়েছে। রক্তাক্ত আজকার এই পৃথিবীর মানুষ সে সব কথা ভুলে গেছে; মানুষের সভ্যতা আজ বাহ্যিক শক্তির জন্য মারণাস্ত্রকেই অবলম্বন করেছে একমাত্র সত্য বলে, মানুষের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে রসাতলে পাঠাতেই তারা ব্যস্ত। অথচ এই মহাসত্যগুলি রয়েছে পরাধীন ভারতের অন্তরের গভীর গুহায়। পরাধীন, তাই তার কথা পৃথিবীর শক্তিমত্ত মানুষের কাছে নিষ্ফল

ক্রন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষায় বিকৃত এই পরাধীন দেশের মানুষগুলোও তাদের অন্তরের মহাসত্যের সম্মান রাখে না—রাখতে চায় না। কেউ রাখতে চাইলে তাকে বিদ্রূপ করে—বর্জন করে তার সঙ্গ—দাসমনোবৃত্তি এতখানি প্রবল—স্বাধীনতা হীনতার চরম, নিকৃষ্ট পরিনাম......!

চোখ দুটো ওর জল জল করছিল ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল-আলোতে। জ্বালা আর জল একসঙ্গে সেই চোখে, বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রের ধ্বংসশক্তি যেন। মিঃ চ্যাটার্জি নির্ণিমেষ হয়ে চেয়ে ছিলেন তারাপদর মুখ পানে। দীর্ঘ বক্তৃতার মত ওর কথাগুলো শুনছিলেন আর বার বার ভাবছিলেন, —এই অসাধারণ নিষ্ঠাবান দেশসেবক—সমাজহিতৈষী কর্ম্মীকে তিনি ফাঁদে ফেলতে পারবেন কি না? কিন্তু শেষে দেখলেন, তারাপদ নিজের উচ্ছ্বাসে নিজেই লজ্জিত হয়ে থেমে গেল। মিঃ চ্যাটার্জির মনে আশা জেগে উঠলো; গম্ভীর হাসির সঙ্গে ঔদার্য্য মিশিয়ে বললেন,—স্বাধীনতা আর দূরে নয়—তারজন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন—বেশ, আমাদের কারখানার মধ্যে যেটুকু-যা করা উচিৎ, করবেন আপনি—আর, গ্রামের ঐ বাঁধটাও বাঁধিয়ে ফেলতে হবে বর্ষা পড়বার আগেই। কালই একটা কমিটি তৈরী করে ফেলুন, আপনিই সেক্রেটারী হোন—টাকার জন্য আটকাবে না; কেমন!

—অনেক ধন্যবাদ! আমি সমস্ত কথাগুলো একবার ভেবে দেখতে চাই—নমস্কার!

তারাপদ উঠে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। মুক্ত আকাশের তলায় এসে নিশ্বাসটা মুক্ত করলো। এতক্ষণে মনে পড়লো তার কৃষ্ণার কথা। কৃষ্ণা কি করছে কে জানে?

ওদিকে মিঃ চ্যাটার্জি ঘরের মধ্যে প্রসন্ন হাসি হাসছিলেন। নিত্যানন্দ বাবু এসে দাঁড়ালেন কাছে! মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—

—খ্যাতি, নাম, যশ, ওর থেকে বড়ো নেশা আর নাই। ওকে মসগুল্ করে রাখতে হবে—আর যাতে উঠতে না পারে। ধন ও চায় না, কিন্তু যশ ওকে নিতেই হবে। যশের নেশায় ওকে মাতালের অধম করে ফেলুন।

মনে পড়ে গেল সুন্দর সেই মুখখানা—করুণ, মধুর সেই ডাক—

—কাকামণি!—চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে এলো তারাপদর, কিন্তু তারাপদ বীর সৈনিক, জীবনকে সে খেলার মাঠ মনে করে এসেছে চিরদিন; হার-জিৎ নিয়ে দুঃখ-সুখের কল্পনাবিলাস তার কম। কিন্তু আজ যেন জীবনের সেই বিস্তৃত খেলার মাঠখানা শূন্য হয়ে গেছে, সেখানে তারাপদ একাই দাঁড়িয়ে,—খেলোয়াড় তো কেউ নাই-ই, একটা খেলনাও নাই—আকাশের অগণ্য নক্ষত্রের পাশে চেয়ে তারাপদ আপন মনেই যেন ডাক দিল—মা-মণি আমার!

বুকের বিশাল ছাতিটার ভেতর কে যেন মোচড় দিচ্ছে—তারাপদ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বুক চেপে দাঁড়িয়ে গেল প্রায় দু'মিনিট—কারখানা, শ্রমিক-আন্দোলন, স্বাধীনতা অর্জন, কিছুই ওর অন্তরে নেই এখন—শুধু দুখানি সজল কালো চোখ বাঁশের ফটফটার গায়ে-ওঠা শ্যামল লতাগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে—বিশ্বের বিস্ময়-জাগানো দু'টি চোখ ছাড়া পৃথিবীর আর সবকিছু লুপ্ত হয়ে গেছে এখন তারাপদর মনের কাছে! কৃষ্ণার কাকা তারাপদ; সে জানে না—বাবা হলে কৃষ্ণাকে আরো বেশী ভালোবাসতে পারতো কিনা। ছয়মাসের মেয়ের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার

করা থেকে সতের বছরের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো ওর মনের চোখে জ্বলে উঠলো তীক্ষ্ণভাবে একবার—তারপর অন্ধকার হয়ে গেল মনখানা; —পরিপূর্ণ অন্ধকার—গভীর নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—সর্ব্বহারার সীমাহীন অন্ধকার!

কিন্তু বীর তারাপদ, ত্যাগী, কর্ম্মী তারাপদ ঘুমিয়ে যায় নি—কর্ম্মশেষে শ্রান্ত তারাপদর স্নেহনীড়ে ফিরে যাবার দিন আজ নেই, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে—বিরাট বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র—যেখানে শত সহস্র মানুষ তার মুখ চেয়ে বসে আছে। তারাপদ লাফদিয়ে সাইকেলে উঠে পড়লো যেন উত্তেজনার আতিশয্যেই। অত্যন্ত বেমান মনে হয় তার ত্বরান্বিত ভাবটা, কিন্তু মানুষের মানসিক উত্তেজনা তাকে ত্বরান্বিতই করে। সবেগে সাইকেল চালিয়ে তারাপদ এসে পৌঁছালো একটা টিনের চালাঘরে; কারখানার শ্রমিকদের কোয়ার্টারের মাঝখানে এই ঘরটা—হঠাৎ-আসা নূতন কোনো শ্রমিকদল এলে তাদের প্রথম দুচার দিন এখানে থাকতে দেওয়া হয়, যে-কদিন স্থায়ী বাসযোগ্য (অযোগ্য নিশ্চয়ই) ঘর তাদের জন্য ঠিক করা না হয়। এ ঘরটা লম্বা-চওড়ায় বেশ বড়, শতাধিক লোক বসতে পারে। বসেও ছিল সেখানে প্রায় শতখানেক লোক। তারাপদ সাইকেল থেকে নামতেই তারা হাত তুলে তাকে অভিবাদন জানালো। প্রত্যভিবাদন করে তারাপদ এসে মাঝে দাঁড়িয়ে বললো—আমাদের আঠারো দফা দাবীর চোদ্দদফা ওঁরা স্বীকার করতে চান, বাকী চার দফা—তারমধ্যে সবথেকে দরকারী আমাদের-কে কারখানার অংশ ওঁরা দিতে চান না……মজুরী কিছু বাড়বে আর বোনাস; গ্রাচুইটিও দেবেন।

—অংশটাই তো পাওয়া দরকার সর্ব্বাগ্রে, যাতে আমরা এই কারখানাকে নিজের বলে মনে করতে পারি……নইলে যে মজুর সেই মজুরই থাকবো আমরা!—একজন শ্রমিক বললো।

—হ্যাঁ,—কিন্তু আপাততঃ আমাদের এইই মেনে নেওয়া উচিত কিনা ভেবে দেখুন।

বলে তারাপদ বাকি কথাগুলোও বলে গেল যা-কিছু মিঃ চাট্যার্জি তাকে বলেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে মাতব্বরগণই উপস্থিত আছে এখানে, কিন্তু মাতব্বর হলেও ওরা মূক—ওরা শিক্ষায় এবং আত্মচেতনায় প্রায় অজ্ঞ বললেই চলে। কায়িক শ্রমের চেয়ে মস্তিকের শ্রমের মর্য্যাদাকে অনেক বেশি সম্মান দিতেই ওদের শেখানো হয়েছে—ওদের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারকে অশিক্ষা কুশিক্ষা আর আত্মাবমাননায় নিস্তেজ করে রাখা হয়েছে। ওদের সংস্কার এবং সংস্কৃতির উন্নতির সব রকম পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওরা ভাবতেই পারে না—ওদের দাবীর সত্যতা কোথায়, ওদের নীতির দৃঢ়তা কোন্‌খানে! যে-কয়জন বুদ্ধিমান ওদের মধ্যে থেকে ওদের জানিয়েছে যে ওদের দাবী সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ওদের নীতি মনুষ্যত্বের মহিমায় সুদৃঢ়, ওরা সেই বুদ্ধিমানদেরই মুখপানে তাকিয়ে থাকে।—এখানেও ওরা তারাপদ আর অশনির দিকেই তাকালো,

—আপনকারা যেমন যেমন ভালো বুঝেন, তাতেই আমাদের ভালো হবে। এই কথাই ওরা বলছে। ম্লান, মূক ঐ মুখগুলির দিকে তাকিয়ে তারাপদর মনে পড়লো জারের আমলের রাশিয়ার কথা। প্রথম মহাসমরে বিক্ষুব্ধ পূর্ব্ব-রাশিয়ার মানুষদের কথা, অন্তর্বিপ্লবের কথা, বলশেভিক রাশিয়ার কথা, লেলিনের রাশিয়ার কথা, আর আজকার শিক্ষায়-দীক্ষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরাষ্ট্রের অন্যতম ষ্টেলিনের রাশিয়ার কথা! এদেরই মত মানুষ ছিল সেদিন রাশিয়ায়—তাদের মূক মুখে ভাষা দিয়ে আজ সাম্যবাদী রাশিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনার পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু রাশিয়া স্বাধীন—পরাধীন ভারতের পক্ষে সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই—তাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতার—নইলে সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ

হয়ে যাবে। ওরা ব্যর্থ করে দেবে—ওরা, যারা স্থায়ী .সম্পত্তির আয়ের উপর নিশ্চিন্ততার আরাম উপভোগ করছে। ওরা বুঝেও কিছুতেই বুঝতে চাইবে না, যে আমাদের পরিশ্রমের উপর, আমাদের শ্রমলব্ধ পণ্যের উপর ওদের আরাম-বিরাম নির্ভর করছে।

ওদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষাপাবার বর্ত্তমানে কোনো উপায় না পেয়ে·তারাপদ বললো,—ভাই সব, ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র। সে অস্ত্র প্রয়োগ করলে তাকে আর ফেরানো চলে না—ফেরালেই নৈতিক-শক্তি খর্ব্ব হয়ে পড়ে; কাজেই সে অস্ত্র প্রয়োগ করবার আগে ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখা উচিত। আজকার কালোবাজার আর আগামী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা মনে করে দেখ, ধর্ম্মঘট মানেই দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন, হাজত, জেল পর্য্যন্ত হতে পারে, ভেবে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের আঠারোটি দাবীর চোদ্দটি ওরা যদি মেনেই নেন—আর একটিও মানবেন—জাতীয় পতাকা অভিবাদন, জাতীয়তা বিষয়ক সভা ইত্যাদি —তাহলে ধর্ম্মট না করে ওদের সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট্ করে নেওয়াই কি ভাল হবে!

—আরেকটু চাপ দিয়া আরো দু'একটা দাবী যদি আদায় করা যেতো!........বললো কে একজন।

—আমি কারখানার অংশটার জন্যই বিশেষ রকম দাবী করতে চাই—অশনি বললো।

—অংশ ওরা সহজে দেবে না। এই কারখানাকে ওরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। এ সম্পত্তি ছাড়ার অর্থ ওদেরকেও শ্রমিক বানানো, কিম্বা ওদের উচ্ছেদ। ধনতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হলে সেটা সম্ভব নয় অশনি। ......ওরা যতটুকু আজ দিচ্ছে, নিতান্ত দায়ে পড়ে।—

—ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ অনিবার্য! পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবেই।—অশনি অকারণে গলায় জোর দিয়ে বললো কথাগুলো। তারাপদ ধীর কোমল কণ্ঠে উত্তর দিল—

—সেই অনাগত দিনটিকে অবিলম্বে আনবার মত পথ আমাদের খোলা নেই অশনি—আমরা পরাধীন। আমাদের নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের অভিভাবকরা আমাদিগকে নাবালক মনে করে এখনো—কিন্তু সে সব কথা থাক—কমিউনিজমের সবথেকে বড় দোষ আমাদের দেশে, এই কথার ফুলকী! এতো কথা, এতো রং-বেরংএর কথা আর কোনো মতবাদ নিয়ে হয় না—কিন্তু আমিও বেশি কথা বলছি!—ওদের প্রস্তাবে রাজি হওয়া উচিত কিনা, তোমরা ঠিক করো।

—ক্লাব, লাইব্রেরী, দুটো পাঠশালা, খেলার মাঠ, ডাক্তার আর ওষুধের ভালো ব্যবস্থা আর থাকবার ঘরের ভালো বন্দোবস্ত—এসব কি ঠিক ঠিক দেবে, বলেছে?—শুধুলো একজন।

—হ্যাঁ, চোদ্দটা সর্তের মধ্যে যা আছে, দেবে বলেছে; কিন্তু বললেই যে সত্যি দেবে, এমন কথা তো ওদের অভিধানে লেখা থাকে না—তাই যতক্ষণ সেগুলো সব ঠিকঠিক না পাওয়া যায়, ততক্ষণ আমাদের শ্রমিক সঙ্ঘও তৈরী থাকবে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে ধর্ম্মঘট করবার জন্য।

—আমরা সব সময়ই তৈরী—একসঙ্গে পাঁচ সাতজন বলে উঠলো।

—তাহলে ওদের জানিয়ে দেই যে চোদ্দ দফা পেলে আমরা আপাততঃ খানিকটা পেলাম বলে মনে করবো!

—হ্যাঁ—জানানো হোক! কিন্তু সত্যি না পেলে……?

—না পেলে আবার আমাদের লড়তে হবে—ঐ আমাদের অস্ত্র, ধর্ম্মঘট!

শ্রমিকরা নিঃশব্দে অভিবাদন করে উঠে যেতে লাগলো। ওরা ধর্ম্ম-ঘটের মর্ম্ম যতটুকু বোঝে তাতে ওদের কাছে আর কোনো প্রয়োজন নেই এখানে বসে থাকার। যুদ্ধের দাপটে ওদের শান্ত জীবনের মর্ম্মমূলে যে বিষাক্ত ক্ষত হয়েছে, তার গভীরতা সম্বন্ধেও ওরা পূর্ণ সচেতন নয়। ওদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে—'তোমার মারাত্মক ক্ষত হয়েছে—রক্ত মোক্ষণ হচ্ছে'—তবু ওরা সহজে বুঝতে চায় না। এতখানি দীন আর অসহায় অবস্থা ওদের। আশা-উদ্দীপনার নূতন সেবা-শুশ্রূষায় ওদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। ওরা জানে, জীবন দুঃখময়। সুখ এবং দুঃখ বিধাতার দান। এ ধারণা ওদের মন থেকে মুছে দেওয়া সহজ নয়। ওদের বোঝাতে হবে জীবন আনন্দের, জীবন উপভোগের। জীবনকে একজন পরিপূর্ণ করে ভোগ করলো, আর একজন জীবনটুকু রক্ষার জন্যই প্রাণান্ত হোল—এই অসাম্য ঈশ্বরের দান নয়—স্বার্থপর মানুষের কূটনীতিজাত সৃষ্টি…কিন্তু…

তারাপদ ভেবেই চলছিল। অশনি হঠাৎ তার কাছে এসে বললো, —কৃষ্ণাকে বলে এসেছি আমি, যে আপনি আজ ওখানে যাবেন না!

—ও হ্যাঁ! সে কি বললো? দাদা বাড়ী ছিল না?

—না, উনি সহরে গেছেন! কৃষ্ণা বললো না কিছুই, বলবার মত অবস্থা ছিল না তার তখন।....বাপের থেকে যত্নে আপনি তাকে মানুষ করেছেন……

—হুঁ—তারাপদ ঘরের দেওয়াল ধরে দাঁড়ালো। অশনি মিনিট-খানেক থেমে বললো,—দাদার সঙ্গে এমন তো কিছু হয়নি আপনার! বাড়ী যাবেন না কেন?

তারাপদ আস্তে ফিরলো অশনির মুখের দিকে, ধীরে ধীরে বললো, —তুমি জানো না অশনি—আমার দাদা, আমার মার পেটের ভাই,

আমাকে যে সে ভালবাসে না, তা নয়, আমার জন্য জীবন দিতে পারে সে,—ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাইএ ভাইএ অসাধারণ ভালবাসা, কিন্তু মতের মিল আমাদের কখনো হয় নি! আমি যা করতে চাই, ও তা কখনো চাইবে না—এমন কি, জীবনপণ করে আমার কাজে ও বাধা দেবে। ওর সঙ্গে আমার এখনো বিশেষ কোন কথা হয় নি, কিন্তু হলে সেটা চরমে উঠবে—হয় তো তার পরিণতি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত গড়াতে পারে……!

—বলেন কি!—অশনি চমকে উঠলো!

—হ্যাঁ! ও চিরকালের বন্য! অর্ব্বাচিনদের গোঁয়ার্ত্তমি ওর সর্ব্বাঙ্গে। তার ফলে আমার অত স্নেহের কৃষ্ণার অন্তর চুরমার হয়ে যাবে। না অশনি, ওখানে আর আমি যেতে চাই না। তোমরা তো দাদাকে চেন না! সে শিক্ষিত গোঁয়ার।

—সে রকম কিছু ঘটলে তখন না হয় চলে আসবেন আপনি।

—না—তাহলে আর কখনো সেখানে যেতে পারবো না। সেখানে আমার মা-মণি আছে। হয়তো কোনোদিন আমায় যেতে হতেও পারে। এখন গেলে কালই হয়তো ঘটবে কিছু। শহরে যখন সে গেছে, নিশ্চয়ই মামলা করতেই গেছে! আমার আগে থেকে সরে আসাই ভালো অশনি।

—কিন্তু কোথায় থাকবেন?

—আমি কারখানাতেই কোন রকমে কাটিয়ে দেব বাকি রাতটুকু—যাও, তুমি বাড়ী যাও!

—আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা?

—খেয়েছি! মিঃ চ্যাটার্জির মতলব ঠিক বুঝলাম না, তবে মতলব নিশ্চয় কিছু আছে। যাইহোক, ওখানেই খেলাম। তুমি বাড়ী যাও অশনি, তোমার কথাও ভাবছি আমি, কিন্তু আমার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ!

অশনি আর কিছু না বলে নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। ঘরের ইলেক্‌ট্রিক স্বুইচটা টেনে আলো নিবিয়ে দিল তারাপদ। তারপর নিঃস্তব্ধ সেই প্রকাণ্ড ঘরখানার মাঝে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো অনেক, অনেকক্ষণ ধরে।

কতক্ষণ তারাপদ দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল নেই, হয়তো আরো অনেকক্ষণ সে ঐভাবেই থাকতো দাঁড়িয়ে। ঐ সীমাহীন অন্ধকারের একাকীত্বে ওকে বসতে বা শুতে বলবার আজ কেউ নাই। আজীবন কুমার তারাপদর একটিমাত্র অবলম্বন ছিল, আজ তাকে সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে।—স্বেচ্ছায়? না, তারাপদর অন্য উপায় ছিল না। জীবনের সমস্তটাই তারাপদ এই অল্প-কিছুক্ষণের স্মৃতিতে পরিক্রমণ করে এলো,—দীর্ঘ জীবনের দুঃখময় স্মৃতি, আবার দীপ্ত, স্নেহোজ্জ্বল দিনের আনন্দময় স্মৃতি—ওকে বিস্মৃতির অন্ধকারে তো মুছে দেওয়া যায় না। ইলেকট্রিকের স্বুইচ্ টেনে দিলে আলো নেবে কিন্তু মনের স্বুইচ টেনে ব্ল্যাক্ আউট করবার কায়দা……

কারখানার বড় ফারনেসটা খুলেছে। উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধাঁনো আলোয় ভরে গেল সমস্ত যায়গাটা। তারাপদর আঁধারে-অভ্যস্ত চোখে সে আলো অসহনীয় মনে হচ্ছে—উঃ—তারাপদ চোখদুটো বুজ্‌লো একবার, তারপর আবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাদুটো ব্যথা করছে; অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই হয়তো! কিন্তু তারাপদ শক্তিমান, সবল, সুস্থ মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলে কি হবে —দেখে মনে হয়, ত্রিশের সামান্য উপরে। কিন্তু বয়স তো সত্যি হয়েছে! আর একটা স্নেহনীড় রচনা করবার যোগ্যতা নাই এখন আর তারাপদর। সে ইচ্ছাও ওর নাই। আলোর চারিদিকে পতঙ্গের মত ওর

মনটা শুধুই ঘুরে মরছে সেই একটিমাত্র মেয়ের কাছে—কৃষ্ণা! ওর মা-মণি!

তারাপদ আকাশের দিকে চেয়ে চোখের জলটা সামলে গেল। কৃষ্ণার বাবা এসেছে। পয়সা-কড়িও এনেছে কিছু। কৃষ্ণা তার একমাত্র মেয়ে। তাকে সুখী করবার জন্য কালীপদ নিশ্চয়ই চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তারাপদর কাজ ফুরিয়েছে ওখানে। কৃষ্ণার প্রতি কর্ত্তব্য করবার অধিকার এখন তার বাবার উপর। তারাপদ নিশ্চিন্ত হতে পারে—নির্ভাবনায় তার নিজের কাজ, শ্রমিকদের উন্নতি, স্বদেশের সেবা, স্বরাজের সাধনা করতে পারে—যেকাজ তারাপদর চিরদিনের স্বপ্ন—যে কাজের জন্য সে জীবনকে এই দীর্ঘকাল ধরে তৈরী করেছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন। স্বাধীনতার স্বপ্নে আজন্ম বিভোর, সর্ব্বস্ব-ত্যাগে সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ তারাপদর আজ কেবলি মনে হচ্ছে, কিছুরই তার আর প্রয়োজন নেই। কোনোকিছুর মধ্যেই তার থেকে দরকার নেই। তার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে—সবই ফুরিয়ে গেছে!

মনে পড়লো এই দাবীগুলোর প্রস্তাব রচনাকালে কৃষ্ণার জলজ্বলে চোখ, তীক্ষ্ণ জোরালো ভাষায় লেখবার জন্য তার জোরালো কথাগুলো, —দাবী পূর্ণ নাহলে জীবন পণ করবার প্রেরণা—আজ সেই কৃষ্ণার কাছে গিয়ে তারাপদ বলতে পারবে না যে তাদের দাবী পূর্ণ হতে চলেছে!

পারে—আজ অন্ততঃ যেতে পারে তারাপদ বাড়ী একবার। কিন্তু কৃষ্ণা বাবা—সেই দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী জেলখাটা কালীপদ আজ একজন ধনিক! তারাপদর সঙ্গে আজ তার সম্বন্ধ আকাশ-জমিন নয়—অহি-নকুল। ওখানে তারাপদর আর ঠাঁই হবে না। অনর্থক কয়েকটা অপ্রিয় কথা-বার্ত্তা আর অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হবে। কৃষ্ণা হয়তো সইতে পারবে না, —হয়তো কাকার দিক নিয়ে বাবার সঙ্গে বিরোধ লাগাবে, হয়তো আরো

খারাপ কিছু,—নিজেকেই আঘাত করতে চাইবে কৃষ্ণা সব থেকে বেশী! না:, কৃষ্ণা সুখে থাক—ভালো থাক—তারাপদ আর যাবে না ওখানে!

ফারনেসের আলোতে কারখানার বাইরে যাবার বড় ফটকটা দেখতে পাচ্ছিল তারাপদ। সাইকেলে উঠে কিন্তু সে অন্যদিকে ফিরলো, ঐ ফারনেসটার দিকেই। ওখানে গিয়েই কর্ম্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবে। তারপর সকালে তো আবার ডিউটি আছে!

কৃষ্ণা এতক্ষণ ঘুমিয়ে গেছে! সত্যি ঘুমিয়ে গেছে—রাত তো দুপুর গড়িয়ে গেল—জেগে থাকে তো শরীর খারাপ হবে যে! ঘুমোক—কৃষ্ণা-মা ঘুমোক!

নিশুতি রাত। একা জেগে বসে আছে কৃষ্ণা। চিন্তা করবার শক্তিটা ওর লোপ পেয়ে গিয়েছিল যেন কিছুক্ষণের জন্য। আস্তে ও নিজেকে কুড়িয়ে আনলো আপনার আয়ত্তে—অতি আস্তে এসে উঠলো রান্নাঘরে। ওর তৈয়ারী খাবারগুলো দেখলো চোখ মেলে—দিনের বেলা কাকা আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, ভালো খাওয়া হয় নি, —তাই কৃষ্ণা এবেলা বেশী একটা কি চড়িয়েছে উনুনে, সেইটাই ফুটছে, গন্ধ ছাড়ছে।

কাকা—কৃষ্ণার পৃথিবীতে একটি মাত্র অবলম্বন ঐ কাকা। কাকা যে তার কাছে কি বস্তু তা জানেন শুধু কৃষ্ণার অন্তর্য্যামী। সেই কাকা আজ আসবে না—হয় ত কোনদিনই আর আসবে না—হয়ত কৃষ্ণার কথা ভুলে যাবে কাকা;—না, ভুলে যাবে না। কৃষ্ণার চেয়ে কাকা আজ কম দুঃখ পাচ্ছে না—হয়ত বেশী দুঃখ পাচ্ছে—হয়ত বেশী চোখের জল পড়ছে তার। হয়তো বীর, দর্পী, সর্ব্বসহিষ্ণু কাকা তার আজ পথের ধুলোয় পড়ে কাঁদছে। না—কাকা পুরুষ মানুষ, কাকা সামলে যাবে!

নিজে কিন্তু সামলাতে পারছে না কৃষ্ণা। ওর মনের পরতে পরতে কাকার অপার্থিব স্নেহের ছবিগুলো বারবার ঝলকে উঠছে। কাকার ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা আর শৌর্য্যের সঙ্গে সহিষ্ণুতায় গড়া মূর্ত্তিটা ওর জীবনের একমাত্র আদর্শ। এর থেকে বড়ো আদর্শ ও পায়নি চোখের সম্মুখে। ওর কাকা ওর কাছে শুধু কাকা নয়, দেবতা!

কিন্তু কেন এমন হোল? কাকার অনুমতি নিয়েই কৃষ্ণা বাবার নামে চিঠি লিখেছিল—জেলের ঠিকানাটা কাকাই বলে দিয়েছিল কৃষ্ণাকে। কৃষ্ণার ধারণা ছিল—বাবা তারা স্বাধীনতা-যুদ্ধের নিষ্ঠাবান সৈনিক, কাকা তার ভারতীয় ঐক্য-সাধনার শক্তিশালী সাধক; সাম্যমন্ত্রের উপাসক, মৈত্রীমন্ত্রের প্রচারক। কাকার সঙ্গে বাবার মিলন একটা আশ্চর্য্য জগতের সৃষ্টি করবে কৃষ্ণার চোখের উপর। কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—অথচ এখনো এমন কিছুই হয়নি—যার জন্য কাকার সঙ্গে বাবার চিরবিচ্ছেদ হতে পারে—কৃষ্ণাকে কাকা পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে—কাকা তার বাবার সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে পারে। কৃষ্ণা ঠিকমত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলো। কাকার সঙ্গে তার বাবার যে-কটা কথা এই সামান্য একটা দিনের দেখায় হয়েছে, কৃষ্ণা সে শুনেছে প্রায় সবই। বাবা চায় অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে বাড়ীটা ফেরৎ পেতে—কাকা জানে, অশ্বিনীবাবু রাজি হবেন না। বাবা চায়, কৃষ্ণার জন্য ভাল বর দেখে বিয়ে দিতে—কাকা ঠিক করেই রেখেছে কৃষ্ণার বর, বাবা যাকে পছন্দ করবে না। বাবা চায় ঘরবাড়ী তৈয়ারী করে জমিজমা কিনে সুখে সংসারটা চালিয়ে যেতে, কাকা চায় সংগ্রাম, অহর্নিশী অবিরাম সংগ্রাম দেশের জন্য, জাতির জন্য, জাতীয়তার জন্য; কাকার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার অর্জন করা। ব্যবধান এবং বিরোধের হেতুটা বড় কম নয়,

কিন্তু কৃষ্ণার মত বয়সের মেয়েরা হয় অতিরিক্ত আশাবাদী—সে বারবার ভাবতে চাইলো—বাবা এসে নিশ্চয় কাল কাকাকে ডেকে আনবে। কিন্তু বাবাকে সে এই সামান্য সময়ের মধ্যে যতটুকু চিনেছে তাতেই মনে হচ্ছে—তার বাবার জেদ যে-কোনো জেদী মানুষকে ছাড়িয়ে যায়!

উনুনের উপর তরকারীটা নামাতে হবে, কৃষ্ণার খেয়ালই ছিল না। দেখলো, সেটা প্রায় নষ্ট হবার উপক্রম করেছে। কৃষ্ণা নামিয়ে দিল সেটা, তারপর ওটার সম্বন্ধে আর যা কিছু করতে হবে, করলো না! রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে কৃষ্ণা জ্যোৎস্নালোকিত উঠোনে নামলো। দূরে নদীর কিনারায় বড় বড় জামগাছগুলো দিক্‌চক্রবালের সীমারেখা টেনে দিয়েছে—মলিন জ্যোৎস্নার আলোকে বড় রহস্যময়, বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ঐ দিকচক্রের পরিধি। অনন্ত প্রসারিত দিকচক্র-সীমা আবদ্ধ হয়ে গেছে মাত্র কয়েকটা গাছের সারিতে, মানুষের জীবনও এমনই অনন্তপ্রসারিত হলে কি হবে—অতি তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা দিয়েও তাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মহান মনুষ্যত্বের মধ্যে আত্মবিলোপ করে নিজেকে প্রসারিত করবার অবসর এবং উপায় কোথায় মানুষের? মুখে শুধু সে অসীমের কথা বলে—হয়তো কল্পনার রাজপথও তৈরী করে নিজেকে সীমাহীনতায় নিয়ে যাবার। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে সে অতি-মাত্রায় সীমাবদ্ধ—সামাজিক শুধু নয়, স্বার্থপর মানুষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিরাট মানুষের মহামানবতার বিস্তারের কথা জানে কৃষ্ণা। ত্যাগে আর তপস্যায় অতিমানব তাঁরা—দয়া-ক্ষমা-মৈত্রী-করুণায় তাঁদের বাণী দেবলোকেরও আদর্শ হয়ে আছে—জীবনদর্শনকে তাঁরা জীবনাতীত দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে অবলুপ্ত করতে বলেছেন;—যুগে যুগে জেগেছে তাঁদের বাণী—

দেশকালপাত্রকে আচ্ছন্ন করে, অতিক্রম করে তাঁরা গেয়ে গেছেন গান কিন্তু মানুষ তবুও রইলো লোভে-পাপে-স্বার্থপরতায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। শুধু নিজেকে সমর্থন করবার জন্যই যেন সে ঐসব অতিমানবদের আপ্তবাক্যগুলিকে পুস্তকের পাতায় রেখেদিল, সুযোগ-সুবিধামত ব্যবহার করতে!—সেই সুযোগের সুবিধা আজকার পৃথিবীর বিচার-প্রহসনে গৃহীত হচ্ছে। মনুষ্যত্ববোধের দোহাই দিয়ে আজকার আনবিক বিজ্ঞানের অতিমানবের দল অমানুষের কাজের সমর্থন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। বিশ্বের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার নামে শান্তি-সম্মেলনের সমারোহ ব্যাপার করে আজকার মানুষ অনায়াসে একটা জাতির উপর অত্যাচার চালাতে পারে, উচ্ছিন্ন করে দিতে পারে তাদের—সমর্থনের জন্য আছে ঐ সব মহামানবের বাণী—মানবতা। কিন্তু মানবতা শুধু ওদেরই একচেটিয়া নয়—পূর্ব্ব এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধ ভাগ করে মানবতার বীজ রোপিত হয়নি—সাদা আর কালো চামড়ায় মানবতার তফাৎ আছে বলে স্বীকার করে না মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা—তবু ওরাই মানবত্বের অধিকারী যারা যে কোনো উপায়ে হোক শক্তির অধিকারী হয়েছে। বিচিত্র এই পৃথিবীর বিচিত্র বিধান!

কিন্তু কৃষ্ণার জীবনে আজ অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে—মানুষ সর্ব্বত্র মানুষ, লোভে পাপে-মিথ্যায়, আবার ত্যাগে-পুণ্যে-সত্যে। মানুষের অন্তর সর্ব্বত্র দ্বন্দ্বময়। অনুশীলনেই একের উৎকর্ষ এবং অন্যের উপর প্রভাব-বিস্তারের শক্তি জাগ্রত হয় মানুষের অন্তরে; কিন্তু অনুশীলনের অগ্রগতিকে যারা থামিয়ে রেখেছে, বাধায় বাধায় ছিন্নভিন্ন করছে, তাদের স্বার্থ পঙ্কিল শক্তিকে ব্যাহত করবার জন্যই কৃষ্ণার জীবনকে গড়ে তুলেছে তার কাকা—সেই কাকা আজ কৃষ্ণার জীবন থেকে সরে গেল! কৃষ্ণা কেমন করে তার আজন্মের স্বপ্ন-লালিত পথে এগিয়ে চলবে? সুখের

পুষ্পাকীর্ণ পথে চলবার জন্য শরীর-মনকে সে কখনও লালন করেনি—কখনো প্রশ্রয় দেয়নি আরামের, বিলাসের। জীবনকে যোদ্ধার বেশে সাজিয়ে সে অহর্নিশি অপেক্ষা করছে—ডাক এলেই হয়—সে প্রস্তুত আছে!

আজ তার জন্য বিলাসের দরজা খোলা হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থবান পিতা, নিজের আভিজাত্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—যে পিতার দুঃখ-বরণ এবং ত্যাগসাধনার জন্য গত তিনদিন পূর্ব্বেও কৃষ্ণা গৌবব অনুভব করেছে। কৃষ্ণার সে-গৌরব দপ্ করে আজ নিবে গেল। কৃষ্ণার আদর্শপুরুষ হারিয়ে যাচ্ছে তার চোখের আলো থেকে। কোথায় কৃষ্ণা আজ আশ্রয় নেবে!—মনে পড়লো একখানা মুখ, তার কাকার আদর্শেই অনুপ্রাণিত একখানা তরুণ মুখ। অশনির মুখ! দৃঢ়তা সে মুখে আছে কিন্তু দৈন্যও আছে ভোগ-বিলাসের; জীবনের শৃঙ্খলায় সে ঋজু কিন্তু জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রে বড় বিশৃঙ্খল—জীবনের জয়লাভকে সে অভিনন্দিত করতে পারে, পরাজয়কে অভিমন্ত্রিত করে আবার এগিয়ে যাবার শক্তি তার আছে কি না, জানা নেই কৃষ্ণার! সে কি পারবে? সে কি কৃষ্ণার দুর্দ্দান্ত গতিবেগের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারবে?—কৃষ্ণা ভাবতে লাগলো।

লালিমা জেগে উঠলো পূর্ব্বাকাশে। কৃষ্ণার অন্তরেও আগামী দিনের আশার লালিমা জেগে উঠবার কথা, কিন্তু কৈ? শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার মুক্তিপ্রয়াসিনী এক নগণ্যা কন্যা সে; বন্ধনের বেদনা তার সর্ব্বাঙ্গে....বিষাক্ত ক্ষত-রক্তে তার মন-প্রাণ ক্লেদাক্ত....কৃষ্ণা আকাশের পানে চেয়ে আবৃত্তি করলো:

লাভ ক্ষতি টানা-টানি অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ, সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়!

সত্যি অসহ্য হয়ে উঠেছে জীবন....বন্দীজীবনের বেদনায় বোধটা আজ যেন তীব্র, অতি অসহনীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু উপায় কি? নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করার এই অবমাননা থেকে আত্মরক্ষার উপায় তো কিছুই আজো দেখা যাচ্ছে না! মানুষের মনকে এমন করে যারা নিস্তেজ করে রাখবার কৌশল আবিষ্কার করেছে, মানুষকে গৃহ-পালিত পশুর পর্য্যায়ে কেন তারা নামিয়ে আনতে পারলো না!—সে চেষ্টারও ত্রুটি করেনি—কৃষ্ণার মনে পড়লো—শ'খানে বছর কি তারও কম দিন আগেও এদেশের মানুষগুলো মনেপ্রাণে অনুভব করতে পারতো না পরাধীনতার জ্বালা....তাদের মনকে মূর্চ্ছিত করে রাখা হয়েছিল. যেন মন্ত্রবলে···সাদা চামড়ার ঝকমকে মায়াদণ্ড দেখিয়ে আর শ্বেতদ্বীপের সাংস্কৃতিক গৌরবের মেকী বুলি ঝেড়ে। কিন্তু পারলো না, রাজা রাম-মোহন থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পৌঁছতেই ওদের ধূলোপাড়ার গুণ নির্গুণ হয়ে গেল। তারপর জেগে উঠলো সর্পের শোণিত, আর ব্যাঘ্রের বীর্য্য বিপ্লবীদের মৃত্যুপণে। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান শত শত সহিদের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য হয়ে দুললো ফাঁসীকাষ্ঠে; বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বজয়.করে ঘরে ফিরলেন--ঘুম ভাঙ্গলো জাতির। নিস্তেজ জড়পুত্তলির অন্তরে জেগে উঠলো পরাধীনতার অসহনীয় জ্বালা—আজ গান্ধী-আজাদ-সুভাষ-জওহরলালের দৃপ্তকণ্ঠে যে বাণী বজ্রের সঙ্গীতে বেজে উঠেছে। কিন্তু····কিন্তু....ব্যর্থ হয়ে গেল সমস্তই। ওরা ব্যর্থ করে দেবেই। ওদের নীতি এবং রাজনীতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কূটনীতি; দেড়খানা সৈন্য আর আধখানা ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক নিয়ে ওরা বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে শুধু নীতির গুণে। বিরাট একটা দেশের চল্লিশ কোটি মানুষকে ওরা শাসন করে সামান্য কয়েকটা সঙ্গীণের খোঁচা উঁচিয়ে। স্বামীতে স্ত্রীতে, ভাইএ ভাইএ, গ্রামে সহরে ওদের

ভেদনীতির কুটিল ভ্রূকুটি বিলসিত হচ্ছে; ওদের শিক্ষাপদ্ধতিতে, ওদের শাসন-সংস্কারের, ওদের সমাজগঠন-চক্রান্তে, এমন কি ওদের আশ্বাসদানের আতিশয্যে পর্য্যন্ত নীতি, কূটনীতি, যে নীতি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবোধ। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে এই নীতির ছুরি চালিয়ে ওরা আজও শাসন করে, শোষণ করে!

কাক ডেকে উঠলো! ভোর হয়ে গেছে। কৃষ্ণা এতক্ষণ ছিল কোন্ দেশে, মনে পড়ছে না ওর। জেগে ছিল, নাকি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল? মনে পড়লো—ওর বাবা বাড়ী নেই, দুপুরে আসবে, আর কাকা আসবে না। কাকার না-আসার কথাটাই তার ভাবনার কথা, কিন্তু কি সব ছাই-পাঁশএতক্ষণ ধরে ভেবেছে সে! ওসব ভেবে লাভ কি আর! সাধারণ বাঙালীঘরের একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে যাবে কৃষ্ণা। সুখে-দুঃখে, স্বামী-সন্তান প্রতিপালনে কাটিয়ে দেবে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন—কটাই বা দিন আর! এদেশের গড় পরমায়ু তো মাত্র সাতাশ বছর। কৃষ্ণা হয়তো ততদিনও বাঁচবে না। কে যেন কৃষ্ণার কানে কানে বলছে, সাতাশ বছর বাঁচাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মাত্র সাতাশটা বছর, তাও সে পাবে না জীবনটাকে ভোগ করতে। ভোগ নয়, দুর্ভোগ। ভালই হবে। ওরা, ঐ করুণাময় দেবতারা এদেশের লোককে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্যই অখাদ্যে আর অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আমাদের প্রতিপালন করে। আমরা বেঁচে যাবো, মৃত্যুর মুক্তিপথে আমরা পার পেয়ে যাবো—ওদের ধন্যবাদ!

কিন্তু কাকা আসবে না, কার জন্য তাহলে রান্না করবে কৃষ্ণা! কিছুই প্রয়োজন নাই। কেউ আজ বলতে আসবে না—'রান্না হোলরে মা-মণি?' কৃষ্ণা নিশ্চুপ বসে রইলো আরো অনেকক্ষণ, হয়তো বসেই থাকতো,

কিন্তু এলো একটি মেয়ে—হাসি—অশ্বিনীবাবুর ভাগ্নী! বয়স কুড়ি, কুমারী মেয়ে, মুখখানি মিষ্টি, চেহারাও ভালো।—

চুপচাপ বসে যে ভাই কৃষ্ণা! তোর বাবা কোথায়? কাকা?

—শহরে গেছে কাল বাবা! কাকা কারখানায়—বলে কৃষ্ণা উঠে পড়লো। অত সকালে হাসির আগমনটার কারণ হয়তো সে ভাবতে চাইতো, কিন্তু দেখতে পেল হাসির হাতে ফুলের সাজি! কৃষ্ণার বাগানে সে ফুল তুলতে এসেছে তাহলে। গত রাত্রে অশনি যাওয়ার পর গেট বন্ধ করবার কথা ভুলে গিয়েছিল কৃষ্ণা, তাই হাসি একেবারে উঠোনের মাঝে চলে এসেছে। ফুল তুলতে আরো অনেকেই আসে কৃষ্ণার বাগানে। ফুল দিয়ে পূজো করে গৃহদেবতার, ব্রতের, পার্ব্বণের। এখনো করে পূজো? এখনো ওদের সনাতন প্রথার সবগুলো লোপ পায়নি? এখনো সতীর সন্তান সমাজে উঁচুমাথা করে দাঁড়ায়, এখনো পুর-নারী বিবস্ত্রা হবার ভয়ে বিষখেয়ে মরে,—স্বামী-পুত্রের সম্মান রাখবার জন্য আজো ওরা অপাপ বিদ্ধা রয়ে গেল।

সত্যি আপাপবিদ্ধা আছে নাকি?

সত্যি আছে? বৃদ্ধ ভারতের সনাতনত্বের মহত্বকে ওরা মহা যুদ্ধের অংশীদারের মর্যাদায় ফেলেছিল; শ্বেত সৈনিকের আগমনীতে প্রতিটি গ্রাম উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—ব্যাঙ্কনোট ছড়িয়ে যারা বিলাসের কুঞ্জ করে গেল বাংলাকে—সারা ভারতকে। যাদের বিলাসের ঘৃণ্য জীবনে ইন্ধন যুগিয়েও ভারতনারী শ্বেতদ্বীপের শ্বশুরবাড়ী যাবার অধিকার পেল না—আটলান্টিকের ওপারে যার ঠাঁই হোল না—তারা রয়ে গেল; রয়ে গেল এই ভারতেই ভারতের সেই হতভাগিনীরা, দুদিনের লোভকে জয় করতে না পেরে যারা চিরদিনের পরাজয়কে বরণ করে নিল। কিন্তু ওদের থাকার অন্ত বিশেষত্বও আছে। ওদের দিয়ে বাকি যারা আছে তাদেরও

ল্যাজ কাটবার উপায়টা সহজ হবে ;—প্রগতিবাদিনী সেই হতভাগিনীর দল এইবার স্বদেশে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রগতিস্রোতকে প্রবহমান করতে চাইবে। পরাধীন দেশ, সে গতি রুদ্ধ করবার শক্তি তার কোথায় ?

কিন্তু কৃষ্ণার খিদে পেয়েছে যেন। রান্নাঘরের খাবারগুলো দেখেই ওর মনে পড়লো খিদের কথা। খিদেটা খুবই বোধ হচ্ছে। কাল কিছুই খায়নি কৃষ্ণা ; স্নান করে কালকার ঐ খাবারগুলো খাবে—কৃষ্ণা গামছাটা টেনে নিল স্নান করবার জন্য। খিদের কষ্টটা এতো অল্পতেই এমন সজাগ হয়ে উঠেছে ? আশ্চর্য্য তো ! খিদে কি ভয়ঙ্কর জিনিষ ! তেরশ' পঞ্চাশের দুর্দ্দান্ত খিদের কথা মনে পড়ে গেল কৃষ্ণার ; দেশব্যাপী খিদে—ক্ষুধার্ত্ত-নারায়ণের সর্ব্বব্যাপী মিছিল। আসছে—তেরশ' তিপান্নর ক্ষুধামহারাজের আসবার ঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছে,—অন্নাভাবে উদ্বন্ধন আর আত্মবিক্রয় সুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এদিকে গোপনচারী মহাজনগণের সদয় হাত খাদ্য সংগ্রহে মন দিয়েছেন। কাগজে খাদ্য-বণ্টন বিভাগের বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে—"অল্প খান, সঞ্চয় করুন, অপচয় করবেন না।" কিন্তু ঐ কাগজেই প্রকাশিত হচ্ছে বেশী কারা খায়, আর অপচয় কারা করে—দুপাঁচ সের অপচয় নয়, হাজার হাজার, লাখলাখ, মণ অপচয়। ঐ বিজ্ঞাপন আর অপচয়ের ইতিহাস আগামী শতাব্দীর মানুষের কাছে হাস্যরসের চমৎকার উপাদান যোগাবে। ওরা লিখবে—'একশো বছর' আগের মানুষগুলোর একদিকে অতিমানুষ আর একদিকে বনমানুষ বাস করতো—বন কেটে সাফ্ করে দেওয়াতে বনমানুষগুলো অতিমানুষের সহরে এসে শাক-পাতা খেতে না পাওয়ায় রিকেট-রোগে মারা যায়। তাদের হাড়গুলো থেকে প্রমাণ হয়……' ইত্যাদি বড় বড় থিসিস লিখবে তারা....ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

হাসি ফুল তুলছে গাছের ডাল নুয়ে নুয়ে। কৃষ্ণার আকস্মিক হাসিটা শুনে বলে উঠলো,—কি হোলরে? হাসছিস্!

কি হোল, বলতে পারে না কৃষ্ণা। বললেও হাসি বুঝবে না। তাই সে বললো—তোর নামটাই "হাসি" কিনা, তোকে দেখলেই হাসি পায়।

—তোর মত সুন্দর যদি না হয় ভাই সবাই···হাসির অভিযোগ অকারণ। সৌন্দর্য্য তার কৃষ্ণার মত না হলেও অসুন্দর নয় সে....তবু বললো—আমরা কুচ্ছিৎ মেয়ে, হাসি পাবেই তো।—

—কুৎসিৎ কি সুশ্রী, সে বিচার আমাদের নয়, আমাদের বরদের। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুই আর আমি আইবুড়োই রয়ে গেলাম দেখছি। শিবপূজা মিছেই করছিস।

—ওঃ! তার জন্য হাসছিস?—হাসিও হেসে উঠলো।—শিবপূজা আমি করি না—মামীমার মঙ্গলবারের ব্রত আছে—তাই ফুল দরকার।

ব্যাপারটা একটু লঘু করতে পারার জন্য কৃষ্ণা খুসী হয়ে বলতে গেল,—বরমালা গাঁথবার জন্য নয় তাহলে?

কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকলো ওর বাবা, কালীপদ। কথাটা আর বলা হোল না কৃষ্ণার!

উঠানে ঢুকেই কালীপদ দেখলো পুষ্পচয়নরতা হাসিকে। এর আগে তাকে দেখেনি সে। কে মেয়েটি? কালীর মনে প্রশ্ন জাগলো মনের অগোচরে;—কিন্তু তার গোচরীভূত সজাগ মন সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেল অত্যন্ত সহজে। হাতের পোঁটলাটা নিয়ে ঘরের

বারান্দায় এসে উঠলো, স্নানরতা কৃষ্ণা এর মধ্যে নিজকে সম্বৃতা করে শুধুলো—সকালেই এলে যে বাবা ?

—হ্যাঁ রে—কাল রাত্রেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।—কালী বসলো একটা চৌকিতে।

ব্যবস্থাটা কি হয়েছে, জানবার ইচ্ছা হোল না কৃষ্ণার ; আগ্রহও নাই ; তাই ভেতরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে বললো—চা করবো বাবা ?

—কর। তোর কাকা কি এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে নাকি ?

—কাকা কাল রাত্রে বাড়ী আসে নি—কখন আসবে, জানায় নি কিছু !

বলে কৃষ্ণা রান্নাঘরে যাচ্ছিল, উঠোনের ওদিকের কোণায় হাসিকে ফুল তুলতে দেখে কালীপদ শুধুলো—ফুল কি জন্যে তুলছে ও ?

—ওদের বাড়ী কি পুজো আছে—বলে কৃষ্ণা চলে গেল, কিন্তু পিতাপুত্রীর কথা শুনতে পেল হাসি। ফিরে তাকিয়ে এক নিমেষ দেখলো কালীপদকে, তারপর সাজিহাতেই কৃষ্ণার কাছে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—আয় ; ফুল তোলা হোল ?—কৃষ্ণা সাদর আহ্বান জানালো হাসিকে।

—হ্যাঁ ! বাড়ী গেলেই মামীমা কাজের ফরমাস করবে ; যতক্ষণ বাইরে আছি, বেশ আছি ; একটু পরে যাব ;—হাসি বসলো কৃষ্ণার কাছে !

কৃষ্ণা উনুনে আগুন জ্বেলেছে কাঠ্ পাতা দিয়ে। চায়ের জল চড়িয়ে দিল ; তাড়াতাড়িতে ওর চুলগুলো ভালো করে নিংড়ানো হয়নি ; হাসি তাই গামছা দিয়ে মুছে দিতে দিতে বললো—কেশবতী কন্যের

মেঘ-বরণ চুল! বাঁধিস কি করে? ঘাড় ফিরিয়ে হেসে কৃষ্ণা বললো, কৃষ্ণা—অর্থাৎ দ্রৌপদী, দুঃশাসনের রক্ত পান না করা পর্য্যন্ত চুল বাঁধেন নি।

—তুই কার রক্ত পান করবি?

—যে দুঃশাসন লক্ষ দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়ে নিল, কোটি মায়ের সন্তান কেড়ে নিল, কোটি কোটি কন্যার সতীত্বকে···

—থাক ভাই কৃষ্ণা! অতসব আমি বুঝিনে···বলে কৃষ্ণার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি হেসে বললো—ওসব বড় বড় বুলি এবার থেমে যাবে। তোর বাবা এসেছে, এবার শীগ্‌গির কোন্ বরের ঘরে ঘর করতে যাবি, তাই ভাব গে।

—বরের ঘরে ঘর করতে যাব?—কৃষ্ণার বড় বড় চোখদুটোতে অবিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য!

—যাবি না? যেতে বাধ্য করবে তোর বাপ্—কৃষ্ণার চুলগুলো ছড়িয়ে দিল হাসি ভাল করে।

কৃষ্ণা কোনো কথা বললো না, আস্তে উঠে গেল ও-ঘরে চা-চিনি আনতে। ওর বাবা চৌকিতে বসে রয়েছে। দেখলো, বললো—হাত মুখ ধোও বাবা, চা হয়ে গেল। দুখানা রুটি সেঁকে দেব?

—না রে মা, দুটিখানি মুড়ি দে! বলে কালীপদ ওঠে গেল কুয়ো-তলায়। ও যেন বেশি গম্ভীর, খুব বেশী চিন্তিত। কৃষ্ণাও দেখলো বাপের চিন্তিত মুখখানা। বাবা কি গতরাত্রে কাকার না ফেরার কথাটা ভাবছে? ওদের দুভাই-এর মধ্যে কোনো কথা-কাটাকাটি হয়েছিল নাকি কৃষ্ণার অগোচরে! বাবা কেন অত চিন্তিত! কিন্তু কাকাও কম চিন্তিত নাই সেখানে। বাবার উচিত, কাকাকে গিয়ে ডেকে আনা। বাবা নিশ্চয় যাবে—চা খাইয়েই কৃষ্ণা বাবাকে বলবে

সে-কথা। কাকা,—কৃষ্ণার কাকা—তাকে না হলে কৃষ্ণার চলবেই না। যদি নেহাৎ বাবা তাকে না ডাকতে যায় তো কৃষ্ণাই যাবে। কৃষ্ণা গিয়ে ডাকলে কাকা নিশ্চয় আসবে—না এসে কাকা পারবে না।

বুদ্ধি আর বিদ্যায় যতই অগ্রসর হোক কৃষ্ণা, বয়সের ছেলেমীতে সে এখনো আশাবাদী। তার বয়সের যে-কোনা মেয়েই অমনি আশাবাদী হয়। এ প্রকৃতির দান;—দীর্ঘ ভবিষ্যৎকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য 'আশা' মানুষের একান্ত দরকারি

কৃষ্ণা চা-খাবার দিল বাবাকে। চা-টা তেরা করেছে হাসি। কালীপদ খেয়ে বললো—চা বেশ ভালো হয়েছে তো মা কৃষ্ণা!

—হাসি করেছে বাবা! ওদের বাড়ী দুবেলা চা হয় কি না—ও ভালো চা তৈরী করতে পারে।

—কে মেয়েটি?—এতক্ষণে কালীপদ শুধুলো। মেয়েটির পরিচয় ওর জানা দরকার মনে হচ্ছে এবার। ওর মেয়ের বান্ধবী এবং ওর জন্য চা তৈরী করে দেয়—অতএব পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে কোনো বাধা নেই আর। কালীপদর দীর্ঘদিনের কাবুলী-মন ধীরে ধীরে পারিবারিক পরিবেষ্টনে অভ্যস্ত হচ্ছে।

—ওর নাম হাসি, বাবা, ভাল নাম নন্দিতা। অশ্বিনীবাবুর ভাগনী। ওর বাবা চা-বাগানে চাকরী করেন।

—বিয়ে হয়নি এখনো?—কালীপদ নিঃসঙ্কোচেই প্রশ্নটা করতে পারলো এবার।

—না!—কৃষ্ণার মুখের চাপা হাসিটাকে হাসি তার তর্জনী দিয়ে থামিয়ে দিল।

কালীপদ কিন্তু ওদের দেখতে পাচ্ছিল না ভালো করে, কারণ ওরা ছিল রান্নাঘরের ভেতর—ধোঁয়া আর আবদ্ধতায় সে ঘর প্রায় অন্ধকার।

—তোমার মামা বাড়ীতে আছেন ?—কালী সরাসরি প্রশ্ন করলো হাসিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আছেন।—হাসিই জবাব দিল।

কালীপদ আর কিছু না বলে চা খেতে লাগলো। হাসিও আস্তে উঠে ফুলের সাজিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় কৃষ্ণাকে ঐ-বয়সের মেয়েদের অভ্যস্থ নীরব ভাষায় জানিয়ে গেল—কি জানিয়ে গেল—না জানলেও চলে। অর্থহীন অনেক কথা, অবোধ্য অনেক ইঙ্গিত আর অকারণ অনেক হাসি-কান্না ওদের বিশেষত্ব। কিন্তু ঐ অর্থহীনতা, অবোধত্ব এবং অকারণতাই পুরুষের জীবনকে জীবন্ত করে, প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে—ঐ রহস্যময়তাই পুরুষের প্রাণ-স্পন্দনের শক্তি! —এত কথা বলবার কোনো প্রয়োজন হোত না, যদি কালীপদ না দেখতে পেতো হাসির সেই ইঙ্গিতটা। দেখলো কালীপদ—অতি অল্পক্ষণের জন্যই দেখলো।

হাসি চলে যাওয়ার পর সে উঠে হাত ধুয়ে আবার বসলো তার ছোট পোঁটলাটা খুলে। ওতে আছে খানকয়েক দলিল,—জমিদারকে খাজনা দেওয়া রসিদ আর সেটেলমেণ্টের পড়চা খানকতক। ঐ নিয়ে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিল কালীপদ। উকীল বলেছে:

> "বাড়ী যখন পৈতৃক, এবং কালীপদ জেলে যাবার সময় তাদের বাবা বেঁচে ছিলেন, তখন প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাইয়ে ভাইয়ে বাড়ী ভাগ হয়নি—অতএব সমস্ত বাড়ীটাতেই কালীপদর অর্দ্ধেক অংশ বর্ত্তায়। নিজের খুসীমত সে-বাড়ীর যে-কোনো অংশ তারাপদর বেচবার অধিকার নেই। যে অংশ সে অশ্বিনী-বাবুকে বেচেছে, তাতেও কালীপদর অর্দ্ধেক ভাগ আছে। কাজেই ঐ বিক্রীত অংশের অর্দ্ধেক কালীপদ নিশ্চয় ফেরৎ পেতে পারে।"

কিন্তু সামনের যে অংশটা অশ্বিনীবাবু কিনেছে, তার অর্দ্ধেক কালীপদকে ছেড়ে দিতে হলে বাকীটুকু কাণা হয়ে যায়—এমন কি তাতে ভালো মত একখানা বাড়ী তৈরী হওয়াও অসম্ভব। কাজেই অশ্বিনীবাবু—বুদ্ধিমান লোক বলেই কালী তাকে জানে—নিশ্চয় বিরোধ না করে সমস্ত জমিটাই ফেরৎ দেবে। না দিলে নিশ্চয় মামলা করবে কালীপদ; কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। অতএব মামলা দায়ের না করেই সে ফিরে এসেছে। কালী কাগজ-পত্র-গুলো আর একবার দেখে অশ্বিনীর বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল—আমার ফিরতে দেরী হতে পারে মা কৃষ্ণা।

কাকাকেই ডাকতে গেল তাহলে—নিশ্চয় গেল ডাকতে। কাকার ভাই—কাকা কতবার বলেছে,—"ভাইয়ে ভাইয়ে আমাদের অসাধারণ ভাব ছিল।" কাকাকে না ডেকে কি বাবা থাকতে পারে? কৃষ্ণার আশাবাদী মন আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠলো। নিজের খিদের কথা ভুলে গিয়েছিল সে, এতক্ষণে মনে পড়লো। কৃষ্ণা খাবার নিয়ে খেতে বসলো। —উনুনের আগুনটা ভাল করে জেলে এবার রান্না করবে। অনেক কিছু রাঁধবে আজ কৃষ্ণা; ওদের দুভাইকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। কৃষ্ণা মা,—ওদের দুভাইয়েরই মা কৃষ্ণা!

"...মাতৃরূপে কন্যারূপে হেরি জগদ্ধাত্রী তোমা......"

কৃষ্ণার কবিতা মনে পড়ছে, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করবার এখন ওর সময় নাই। কাকা কাল থেকে খায়নি—ভালো করে রান্না করতে হবে। আর বাবাও তো গতরাত্রে শহরের হোটেলে খেয়েছে, সে কি আর ভালো খাওয়া! কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি নিজের জলযোগ সেরে উঠে

পড়লো। এতোটুকু সময় নাই ওর—কাকা এখুনি এসে পড়বে, ঠুন্‌ঠুন্ করে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠবে এখনি।

—মা-মণি?—কি মিষ্টি করে ডাকে কাকা! কাকার সেবা করেই কৃষ্ণা অনায়াসে তার সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে; কিন্তু কাকা যে আবার দেশের সেবক। দেশকে সেবা করাই কাকার ধর্ম্ম। কাকার সেবক-সেবিকাকেও তাই দেশসেবক হতে হবে। দেশ-মাতার জন্য কাকা সর্ব্বস্ব পণ করেছে, সারা জীবন কুমার থেকে গেছে, সমস্ত মন-প্রাণের নিষ্ঠাকে একত্রিত করে শুধু গড়ে তুলছে জাগ্রত জীবনের ইতিহাস—যে ইতিহাস হবে আগামী কালের রাজনীতির ঐক্যবন্ধন,—মানুষে মানুষে ভেদ বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে যে ইতিহাস মানব-সমাজকে সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথে, সামাজিক সাম্যের পথে, মানবীয় মৈত্রীর পথে এগিয়ে আনবে। স্বাধীনতা-হীনতার অপরিসীম গ্লানিতে সমাচ্ছন্ন হয়ে যে ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদীর শক্তি-সঞ্চারে সাহায্য করছে, ভেদনীতির গুপ্ত ছুরিকা দিয়ে যে ইতিহাস প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে, মানুষে মানুষে জাগিয়ে তুলেছে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসার রক্তাক্ততা—যে ইতিহাস জীবনকে করেছে যন্ত্র, যৌবনকে করেছে অভাবের কারায় বন্দী, জাগরণকে করেছে শাসকের ভ্রূকুটিতে ভীত-ত্রস্ত—কাকা সেই ইতিহাসের করতে চায় অবলোপ। কাকার জীবন দিয়ে নতুন ইতিহাস লেখা হবে—যে ইতিহাস জীবন্ত, জ্বলন্ত, জাগ্রত।

কিন্তু কৃষ্ণা উচ্ছ্বাসটা সাম্‌লে নিয়ে রান্না চড়ালো। হাসির কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে একটা! বলে, "বরের সঙ্গে ঘর করতে যাবি।"—বরের সঙ্গে ঘর করতে যাওয়ার সময় কোথায় কৃষ্ণার! সে তো কল্পনাবিলাসীর জাগ্রত-স্বপ্নে অভ্যস্তা আরামপ্রিয়া হাসি নয়! সে কৃষ্ণা, স্বামীর সঙ্গে যে রণে বনে বিজনে ঘুরেছে, মুক্ত-

কেশে যে মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গণেছে—মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে স্বামীকে সাজিয়ে দিয়েছে রণক্ষেত্রে যাবার জন্য! মনে পড়লো বাঙ্গালী কবির বন্দনা—

যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে তোমারে পরশি' হে হুতবহ,
যুগান্তরের সর্ব্ব নরের হে নারী, শুভ্র প্রণাম লহ!

কে যেন আসছে। কৃষ্ণা গেটের পানে চাইলো। কে লোকটা? কৃষ্ণা তো চেনে না! ও হ্যাঁ, কারখানার শ্রমিকদের একজন। কাকার কোনো খবর এসেছে নাকি? লোকটা এগিয়ে এলো, রান্নাঘরের কাছাকাছি এসে বললো,—দাদাবাবু একটা চিঠি দিয়েছে মা!

কৃষ্ণা ত্বরিতে নিল চিঠিখানা ওর হাত থেকে। খুলে পড়লো, মাত্র দু লাইন,—মা-মণি, আমাদের দাবীর অধিকাংশই মিটেছে। আমি ব্যস্ত রয়েছি, ভাবিস না মা!

কাকা!

সান্ত্বনা—স্তোকবাক্য,—কাকা আর আসবে না! কৃষ্ণার মুখখানা কাঠের, না মাটির, না পাথরের? কোনো ভাবের ব্যঞ্জনাই সে মুখে নেই!

লোকটা আস্তে বেরিয়ে গেল।

কালীপদ ঢুকলো গিয়ে অশ্বিনীবাবুর বৈঠকখানায়। অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে ওর শৈশবের পরিচয় নিবিড় ছিল—যদিও অশ্বিনী বয়সে কিছু বড় কালীপদর থেকে! গ্রামের যাত্রাদলে দুজনেই অভিনয় করেছে। কালী-পূজার অমাবস্যা-রাত্রে একবার কালীপদ বাজি রেখে বক্রেশ্বরের শ্মশানে গিয়েছিল একা; ঐ অশ্বিনীই সেই বাজি ধরেছিল—মাত্র আট আনা

পয়সা, তার জন্যই কালীপদ জীবনকে অতখানি বিপদের মধ্যে ফেলতে দ্বিধা করেনি। কালীপদকে ভালই চেনে অশ্বিনী। অভিনয়ের সময় কালীপদর নৈপুণ্য অশ্বিনীকেই বেশী খুসী করতো। কিন্তু অশ্বিনী চিরদিনের বিষয়ী মানুষ। ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠেই সে ঠিক করলো, বিদ্যে তার যথেষ্ট হয়েছে, এবার কোনো ব্যবসা করতে পারে। লেগে গেল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জন্য ঘুটিং সাপ্লাই করতে। ঘুটিং ওদের নদীর ধারে অনেক পাওয়া যায়—চূণ তৈরী হয়। তখন এই কারখানাটাও তৈরী হচ্ছিল। অশ্বিনী এখানে ঘুটিং সাপ্লাই করতে গিয়ে ইটের কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেল; তারপর আট-দশ বছরে অশ্বিনী ফুলে ফেঁপে বেশ ওজনে ভারী হয়ে উঠেছে। ব্লাক-মারকেটের টাকা সে এখনো বাজারে ছাড়ে নি, নইলে গ্রাম ছেড়ে তার এবার সহরে যাওয়া উচিত! অশ্বিনীর সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য বলা যায় না—পরপর পাঁচটি মেয়ে হয়ে তারপর এই বছরখানেক হোল একটি ছেলে হয়েছে। অতগুলি মেয়েকে পার করবার জন্য অশ্বিনীর অপব্যয় নেহাৎ কম হয়নি—চারটিকে পার করেছে, এখনো ছোটটি বাকি, আর বাকি ভাগ্নী হাসি!

হাসি ওর ঘাড়ে এসে পড়লো অকস্মাৎ। তার বাবা আসামের চা-বাগানে চাকরী করে। ভালই মাইনে পায়, কিন্তু লোকটার অনেক দোষ আছে। হাসির মা'কে সে কারণে-অকারণে অপমান তো করেই, বলে—'রাজা ভাই, যাও না—মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আনতে পারবে না?

শহুরে ভাবধারায় আর বাবুগিরিতে অভ্যস্ত হাসি দেখতে-শুনতে মন্দ নয়—আর লেখাপড়া, সেলাই-বোনা, সৌখীন রান্না ভালই জানে; সিনেমা-থিয়েটারের নট-নটীদের নাম ওর ঠোঁটের আগায়, গান আর গল্পে সে আগামী যুগের পর্য্যায়ে পড়ে; আর সাজ-সজ্জায় সর্ব্বদেশীয় সমন্বয়। কিন্তু গ্রামে এসে অতটা বাবুগিরি করা হচ্ছে না—তাই হাসির

অন্তর মোটে হাস্য-ঝঙ্কৃত নয় আজকাল। কিন্তু গ্রামে আসতে ওর মা বাধ্য হোল। ওর বাবার পয়সাকড়ি একেবারে নেই, অর্থাৎ জমাতে পারে না– এদিকে মেয়ে কুড়ি পার হয়ে যাচ্ছে, কাজেই বাধ্য হয়ে ওর মা ওকে এখানে এনেছে—দাদা কোনোরকম করে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিক—এই আশায়।

কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়ে অশ্বিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমে তো গ্রাহ্যই করলে না দিনকতক। তারপর তার স্ত্রী, অর্থাৎ হাসির মামীমা বারবার বলাতে অশ্বিনীর হুঁস্ হোল,—গ্রামে বদনাম হচ্ছে—অত বড় ভাগ্নী আইবুড়ো থাকার জন্য। অথচ গ্রামে অশ্বিনীর সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট, তারাপদর ভাইঝির এখনো বিয়ে না দেওয়ার জন্য অশ্বিনীই দুএকটা কটু মন্তব্য করেছিল, এখন নিজের ভাগ্নী কুমারী থাকলে সম্মান থাকে কি করে! হাতের কাছে সুবিধামত পাত্র না পেয়ে তারাপদকেই ঠিক করে ফেলেছিল মনে মনে। কিন্তু তারাপদ মানুষটা একটু আলাদা রকমের। কৃষ্ণাকে মাতৃ-স্নেহে মানুষ করার জন্যই হয়তো নারীকে সে মা—আর মেয়ে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। অতর্কিতে তার পুরুষ-চিত্ত যদি বা কখনো প্রিয়ার জন্য উন্মন হয়েছে, তখনি সে ভেবেছে, কৃষ্ণা পর হয়ে যাবে। নারীর কাছ থেকে স্নেহটাই প্রাপ্য, কৃষ্ণাই সেটা তাকে যোগাচ্ছে—তাই অশ্বিনীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল।

কালীপদ এসব কিছুই জানতো না। অশ্বিনী বাবুর বাড়ী আসতেই অশ্বিনী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো।

প্রাতরাশের টেবিলে বসে মিঃ চ্যাটার্জি বলছিলেন—বক্তৃতা

দিচ্ছিলেন, বলাও চলে,—জানেন ম্যানেজার বাবু, এই পৃথিবীতে মানুষ "হাঙ্গার" আর "প্যাশন" নিয়ে বেঁচে থাকে—অর্থাৎ ক্ষুধা আর কামনা নিয়ে, কিন্তু সেগুলোকেও জয় করতে পারে, এমন মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে বহু। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি আর স্নায়ুর শক্তি দুজনের মধ্যে কদাচিৎ এক রকম হয়। সকল মানুষ সমান হয়ে যাওয়ার মূলে এই গলদ রয়ে গেছে—তাই সাম্যবাদ কল্পনা বিলাসীর আকাশ-স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু মনে হয় না আমার।

—কিন্তু সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকার এই পৃথিবীতে, এমন দেশ তো দেখা যাচ্ছে।

—না—দূর থেকে যাকে সাম্যবাদ মনে করছেন, সেটা সকলকে সুখী করে তোলবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে একরকমের 'কম্প্রোমাইজ' অর্থাৎ চুক্তি-বদ্ধতা। কিন্তু সে-সব স্বাধীন দেশের সাহসের, দুঃসাহসের কথা; ওরা সাধারণ সূত্রের বাইরে। ওভাবে একটা দেশের কোটি কোটি লোকের উপর পরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থা চালাবার সুযোগ সুবিধা আমাদের নেই—থাকা সম্ভবও নয় এখন। তাছাড়া ওদের ইতিহাস আছে, জারের আমলের অত্যাচার ওদের জাগরণকে সাহায্য করেছে; গৃহবিবাদের অশান্তিকর অবস্থায় ওরা প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল!...

—অত্যাচার আমাদের উপর কিছু কম হচ্ছে না, আর গৃহবিবাদ আমাদের আরো বেশি! পাকিস্থান, হিন্দুস্থান, শিখস্থান শুধু নয়, পিতাস্থান, পুত্রস্থান, অবধি হতে বসেছে!

—হঁ্যা—মিঃ চ্যাটার্জি মৃদু হাসলেন—আপনার পিতৃগর্ব্ব বড় বেশী আহত হয়েছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু এও ঠিক যে, আপনার ছেলে খারাপ নয়—ওরকম ইন্‌টেলিজেন্ট ছেলেকে কণ্ট্রোলে রাখা কঠিন; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। ও ছেলে উন্নতি করবেই!

—ছাই করবে! দেশ দেশ করে কিরকম মেতেছে, দেখছেন না? আমি বুড়ো বাবা, কোথায় একটু সাহায্য করার চেষ্টা করবে, তা নয়, কোথায় যে কি কাজে ঘোরে, বোঝবার যো নেই। কাল রাত তিনটের পর বাড়ী ফিরেছে—আবার আজ ভোরেই বেরিয়ে গেছে।

—তারাপদর কাছে যায় নাকি?

—কে জানে, কোন্ চুলোয় যায়—বলে ম্যানেজার বাবু ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে উঠলেন।

—হাঃ হাঃ হাঃ! আজকালকার ছেলেদের নিয়ে অতটা পিতৃত্ব ফলানো চলে না ম্যানেজার বাবু—দিন-সময় বদলেছে। এই দেখুন না—দশ বছর আগে এই রকম ধর্ম্মঘটের ভয় দেখালে আমি সবকটাকে ধরে চাব্‌কে দিতাম; কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে আমায় মেনে নিতে হচ্ছে ওদের দাবী—কারণ, ওদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক চৈতন্যটিও জাগ্রত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। ওদের দাবীর সত্যতাকে ধনতন্ত্রবাদী কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। ওদের দিতে হবে, তবে যত কম করে দিতে পারা যায় সেইটাই চেষ্টা আমাদের।

—দাবী যদি সত্যি মনে করেন, তাহলে দিয়ে ফেললেই তো হয়। ম্যানেজারের কথার স্বরে মনিবের উপর বিরক্তি ফুটে উঠলো, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি হেসে বললেন—সব দিতে পারি না আমরা—অত ত্যাগ-শক্তি আমাদের নেই। সর্ব্বস্বান্ত হবার কল্পনা করতেই আমাদের আতঙ্ক হয়, কিন্তু কিছু না দিলে ওরা সবটাই কেড়ে নেবে—সাম্যবাদী শ্রমিকের দলই আগামী পৃথিবীর রাষ্ট্রকে চালাবে, একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ম্যানেজার চুপ করে রইল। কথাগুলো ওর ভাল লাগছে না. মিঃ চ্যাটার্জি চায়ের কাপটা নামিয়ে বললেন—এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ আর

সামাজিক-চেতনা ইংরাজের দান—ইতিহাস একথা অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরাজ তার শাসন-শক্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্যই নিজেদের সুবিধামত শিক্ষা বিস্তার করেছে; সুবিধামত প্রদেশ গড়েছে, সুবিধা মত ভাগাভাগি করে রেখেছে সব রকমে এই দেশটাকে। সকল প্রকারে এদেশকে নির্জীব এবং নিস্তেজ করে রাখতেই ওরা চেয়েছিল, কিন্তু অতি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিতে বড় বড় ফাঁক থেকে যায়। বার বার ভেদ-নীতির আশ্রয় নিতে নিতে সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, বোমা-আন্দোলনের ব্যাপার নিয়ে বেশি রকম ঘাঁটাঘাঁটি ইত্যাদি করে ওরাই গণমনকে জাগিয়ে দিল। তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। সে যুগের সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিই ছিল মানুষের মনুষ্যত্ব-বোধকে যতদূর সম্ভব সুপ্ত করে রাখা। তারা সে-কাজে সফলও হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত পৃথিবীর বর্ব্বরতা স্বল্পজাগ্রত গণমনকে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়ে দিল। গণশক্তি দেখলো—শক্তির উৎস তারাই, অথচ সেই শক্তির সুফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যারা জনগণের জীবন রক্ষার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত নিজের হাতে রেখেছে।—গণশক্তি বিদ্রোহী হোল; তারই ফলে আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী পৃথিবীতে এই বিক্ষোভ; একে একেবারে থামিয়ে দিতে গেলে আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরণ ঘটবে—এখন তো শুধু কম্পন চলছে!

—বেশ—আপনি তো ওদের বেশীর ভাগ দাবীই মেনে নিয়েছেন! আশা করি, কারখানার কাজে আর কোনো ব্যাঘাত হবে না।

—আজ না হোক, কাল আবার হতে পারে—কারণ ওদের লক্ষ্য শ্রমিক আর ধনিকের ভেদরেখা মুছে ফেলা। তাই আমি চাইছি—আজ যে-শক্তিমান নেতা ওদের পরিচালন করছে তাকেই ক্যাপচার করতে।

—কি ভাবে? আর তাতে ফলই বা কি হবে?

—আপাততঃ কিছুকাল শান্তিতে থাকা যাবে। হয়তো একদিন আমাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তিই ওরা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—সেদিন আমরাও শ্রমিক বনে যাব; কিন্তু উপস্থিত স্থায়ী এবং নিরাপদ আয়ের উৎসগুলিকে হাতছাড়া করে দেউলে হবার মত মনোবৃত্তি আমাদের নেই—থাকতে পারে না। কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে ওদের আর দাবানো যাবে না—চাই কৌশল—চাই ভেদনীতি!

হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ম্যানেজারও হাসলো তাঁর সঙ্গে; বললো, —কি করতে চান—বলুন!

—ঐ তারাপদ লোকটাকে চাই! ধন দিয়ে ওকে কেনা যাবে না, কিন্তু মান দিয়ে হয়তো কেনা যেতে পারে। যশ, মান, খ্যাতি অমোঘ অস্ত্র যে কোনো লোককে জব্দ করবার জন্য। যত বড়ই কৌশলী মানুষ হোক, প্রচারের কৌশলে তার খ্যাতি বাড়িয়ে দাও, যশের মুকুট পরিয়ে দাও, এককথায় দেবতা বানিয়ে তোল—স্পেশ্যাল মোটর লঞ্চ, প্রথম শ্রেণীর থার্ডক্লাস, হাজার রকম সুবিধায় থাকবার ঘর ইত্যাদিতে তাকে ভোরপুর কর—মন্দিরে মন্দিরে তার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পূজা করবার ব্যবস্থা করে ফেলো, —দেখবে, সে তার দেবত্ব রাখবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়বে—তার মুখে দেশের কথা হবে তার দেবত্বের মহিমায় গিল্টিকরা, আর দশের কথা তার কানে পৌঁছুবে পৌঁছবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে।—মানুষের জগতে মানুষের শক্তিকেই ভয় করি—দেবতাকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই·· হাঃ হাঃ হাঃ!

মিঃ চ্যাটার্জি কি বলতে চান ম্যানেজার সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললো—আমায় কি করতে হবে?

—পাবলিসিটি দিতে হবে ঐ তারাপদর নামে। ত্যাগী, কর্ম্মী,

তারাপদ !—দাতা দয়াময় তারাপদ !!—তারপর দেবতা তারাপদ !!! ওকে তুলে দিন বাঁশের ডগায় অতিসূক্ষ্ম উচ্চতায়—যেখান থেকে যে-কোনো মুহূর্ত্তে ও পড়ে যেতে পারে।

—তাতে লাভ ?

—ও সেই অনায়াসলব্ধ উচ্চস্থানটিতে নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাইবে ; তখন—ওর মহামানবত্ব, ওর দেবত্বই হবে ওর কাছে একমাত্র সাধনার বস্তু ! কিন্তু এরা. এই বিক্ষুব্ধ গণমন চায় একজন মানুষ নেতা ; —দেবতাকে তারা চায় না, চাইবে না কখনো। দেবতার দরকার ইহলোকে নেই—যদি থাকে তো সে আছে হয়তো পরলোকে। তারাপদকে দেবত্বের মধ্যে আটকে রেখে আমরা অনায়াসে এই জাগ্রত গণমনকে ভেঙে-চুরে আবার সুপ্ত করে দিতে পারবো—ঐ তারাপদই তখন সাহায্য করবে আমাদের ওর দেবত্ব দিয়ে। তারাপদকে দেবত্বের মহিমায় তুলে রেখে আমরা আবার এই জাগ্রত গণমনকে ভেঙ্গে নিজের মত করে গড়ে নিতে চেষ্টা করবো !

—আবার অন্য তারাপদ এসে জুটবে—ওদের সংখ্যা আজকাল ক্রমশ বাড়ছে !

—হ্যাঁ—কিন্তু তাদের আসার পথে বাধা হবে তখন ঐ তারাপদই।

—বেশ, আপনার ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে কি করতে হবে, বলুন !

কয়েকটি গোপন কথা বলে দিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ম্যানেজার বেশ করে বুঝে নিয়ে হাসলো সাফল্যের হাসি, কিন্তু তখুনি সন্দেহ প্রকাশ করে বললো—তারাপদ অতিরিক্ত আশাবাদী এবং আদর্শবাদী !—

—ওর আদর্শবাদকে অহঙ্কৃত করে তুলুন, আশাকে করুন উদ্দীপ্ত—আর গণমনের কাছে প্রমাণ করুন, ওর দেবত্ব গিল্টি করা ··ও শ্রমিক নয়,

ধনিকও নয়—ধাপ্পাবাজ! মানে, বুঝলেন না, সবটাই বৃটিশ পলিসি—না, পলিসিটা শ্রীকৃষ্ণের আবিষ্কৃত; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই পলিসিতেই উনি কাজ হাসিল করেছিলেন। মহামানী দুর্য্যোধনের মানটাকে দিলেন মটকায় তুলে—সেই মানটুকু বজায় রাখবার জন্য ভদ্রলোক সূচ্যগ্র মেদিনীও দিতে রাজি হলো না সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাবার সব সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও। আর ব্যাচারা যুধিষ্ঠির! তার ধর্ম্মবাদের আগুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র এমন অবস্থায় আনলেন যে নিজের স্ত্রী যখন বিবস্ত্রা হয়েও লাঞ্ছিতা হচ্ছে তখনো যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের পানে তাকিয়ে। ধর্ম্মের জন্য ঐ ভদ্রলোককে যে কত দুঃখ সহ্য করালেন শ্রীকৃষ্ণ তা বলে শেষ করা যায় না—কিন্তু ঐ শ্রীকৃষ্ণই আবার মিথ্যা বলিয়ে দ্রোণহত্যার পাপে তাকে লিপ্ত করিয়ে নরক পর্য্যন্ত দেখবার ব্যবস্থা করে রাখলেন!

—শ্রীকৃষ্ণের কোন্ রাজনীতি ছিল এর মধ্যে?

—তাঁর নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা। তাঁর রাজত্বকে নিরাপদ রাখা। কুরু বা পাণ্ডব কোনো পক্ষকেই তিনি প্রবল হতে দিতে চান নি। প্রবল হলে তাঁর সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে, এটা তিনি জানতেন। তাই কারো সঙ্গে নিজের বিরোধ না ঘটিয়ে উনি যুদ্ধের সময় বললেন, —"আমাকে ভাগ করে নাও, তোমরা নারায়ণী সেনা নাও, আমি ওদের পক্ষে শুধু সারথ্য করবো, যুদ্ধই করবো না"—কি কৌশলে উভয় পক্ষের কাছে নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রাখলেন, ভাবুন তো! একেই বলে রাজনীতি। অতি প্রবল পক্ষটাকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম বলবান পক্ষের সঙ্গে সাময়িক বন্ধুত্ব স্থাপন—কিন্তু যাক্ ওসব। আপনাকে যা বললুম, আজই আরম্ভ করে দিন! তারাপদকে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে তুলতে হবে।

—হ্যাঁ—কিন্তু এতে ওর সুবিধাও হয়ে যেতে পারে।

—হোক্—সেটা ওর বরাত। ওর ব্যক্তিগত সুবিধাতে আমাদের কিছু অসুবিধে হবে না। সমষ্টির জন্য ওর যে চিন্তা, সেই চিন্তাটাকে বিপথগামী করতে হবে।

নমস্কার আদান প্রদানের পর ম্যানেজার প্রস্থান করলো। আপনার মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাজার কয়েক টাকা অবশ্য তাঁদের বরবাদ হবে, কিন্তু চারদিকে যেরকম ধর্ম্মঘটের হিড়িক পড়ে গেছে—খাস গভর্ণমেণ্টের পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে পুলিশ, এবং আরো অনেক ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের হুম্‌কি দেখাচ্ছে, এ সময় চুনোপুঁটি কারখানার বেশী বাহাদুরী দেখিয়ে ওদের দাবী একেবারে অস্বীকার করতে যাওয়া নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা হবে। তাছাড়া—যুদ্ধের সময় ঐ নির্ব্বোধ লোকগুলোকে খাটিয়েই তো প্রচুর লাভ করা গেছে—তারই ঝড়তি-পড়তি সামান্য ওদের দিলেই হবে। মিঃ চ্যাটার্জি উচ্চ শিক্ষিত এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। মানুষকে কেমন করে কাজ করাতে হয় আর কি ভাবে চলমান-মনোবৃত্তিকে নিজের কাজে লাগিয়ে দুপয়সা রোজগার করতে হয়—তা তিনি ভালই জানেন।—তারাপদকে তাঁর পছন্দ হয়েছে; শুধু পছন্দ নয়, লোকটাকে তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন "হিরো" বলে মনে করেন। ওরকম ত্যাগী, কঠোর-ব্রত এবং দৃঢ় মনোবৃত্তির মানুষ মিঃ চ্যাটার্জি জীবনে কমই দেখেছেন। ওকে কাজে লাগাতে পারলে তাঁর অনেক সুবিধা হতে পারে।

ম্যানেজারের ছেলেটাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তবে এখনো ছেলেমানুষ, কি যেন নাম·······মনে পড়লো না চ্যাটার্জির—যাক্, নাম ওর যাই হোক্, বাপের নাম ডোবাবার জন্য ছেলেটা উঠে-পড়ে লেগেছে। ওকেও তৈরী করে নিতে পারলে ভালো একটা অস্ত্র হবে;—তৈরী করে নেবেন মিঃ চ্যাটার্জি।

এই রকম সাজ্যাতিক এলিমেণ্টদের কাজে লাগাতে পারলে কোথায় লাগে এ্যাটম্ বোম—সিদ্ধি অনিবার্য্য! ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আর বৈপ্লবিক ইতিহাসের চল্লিশ বছর আগের কথা এবং তার পরের কথা মনে পড়লো। অসীম শক্তিমান কয়েকজন নেতাকে, যারা সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছিল,তাদেরই কয়েকজনকে আজ কাজে লাগিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে সাম্রাজ্য চলছে!...একেই বলে রাজনীতি! হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি একলা ঘরে। পর পর তিনচার জনের নাম ওঁর মনে পড়লো—তাঁদের কেউ লাখ টাকা খান, কেউবা পাঁচ লাখ টাকার লোক। রহিমচাচা আর রামু খুড়োর আত্মীয়তায় আবদ্ধ এই শান্ত-স্নিগ্ধ দেশটাকে তাঁরা বিদ্বেষ-বহ্নিতে জ্বালিয়ে তুলেছেন আজ। কয়েক শতাব্দী ধরে এক চন্দ্র-সূর্য্যের আলো-ছায়ায়, এক মাটি-মার জল-হাওয়ায়, একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বর্দ্ধিত, পুষ্ট, প্রভাবিত জাতিটার এক অংশ আজ পদ্মের সঙ্গে শ্রী সইতে পারে না—নমস্কারের মধ্যে হিন্দু গন্ধ আবিষ্কার করে' বিজাতীয় বৈদেশিক শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনকে বরণ করে! —একেই বলে কূট নীতি! এই নীতির প্রয়োগ-কর্ত্তাদের শত শত নমস্কার।—কলকাতায় তাঁর বসবার ঘরে কয়েকটা ছবি আছে—, কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিকও আছেন তাঁদের মধ্যে। গভীর রাত্রে মিঃ চ্যাটার্জি শোবার আগে ঐ ছবিগুলি দেখে বলেন—হে আশ্চর্য্য প্রতিভাবান মহাপুরুষগণ—বুদ্ধি দাও, প্রেরণা দাও, প্রতিভার আলোক দাও!

এখানেও একজনের ঠোঁট দুটির ভঙ্গি মনের পটে ভেসে উঠলো, মিঃ চ্যাটার্জি মৃদু হাস্যে বললেন—কারখানাকে দেউলে করবার জন্য আমায় এখানে পাঠানো হয়নি;.......এমনি আরও কয়েকটা কথা বললেন মিঃ চ্যাটার্জি।

ঘরে সেকথা শোনবার লোক কেউ ছিল না, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি গভীর চিন্তার সময় এরকম কথা বলেন। ওঁর বাড়ীর লোকরা জানেন, এটা ওঁর মুদ্রাদোষ। চিন্তা তো ওঁকে কম করতে হয়নি—সারাজীবন ধরে উনি ধনবাদের উপাসনা করেছেন। ধনতন্ত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায় ওঁর মুখস্থ। কাঁচা মালের দর সরকারী আইনের আওতায় ফেলে কিভাবে মিল-মালিক আর ম্যানেজিং এজেন্ট ফেঁপে ওঠে,—কি ভাবে ফট্‌কা বাজারের দর নামিয়ে উঠিয়ে দালালেরা দশ-বিশ হাজার কামায় চেখের পলকে, কি ভাবে দেশ-বিদেশে কোটি কোটি টাকার কারবার চালাতে হয়, ছোট্ট একটা ঘরের এককোণায় রাখা টেলিফোনে, একফালি একখানা চেকবইএ—এক টুকরো চিঠির কাগজে! এই বুদ্ধি ধনিকের বুদ্ধি! চাষা বা মজুর এতো বুদ্ধি পাবে কোথায়?—অসম্ভব! কিন্তু এই আত্ম-অহঙ্কারের মুলে যেন কে আজ আঘাত করছে। বুদ্ধি হয়তো ওদের নেই—কিন্তু শক্তি তো আছে—সেই শক্তিটা বিদ্রোহ করছে। হয়তো এবার থেকে মিঃ চ্যাটার্জিদের বুদ্ধিকে ঐ বিদ্রোহী শক্তিই পরিচালন করবে—এমন দিন আসা বিচিত্র নয়—সেদিন কি হবে? ঐ শক্তিকে আয়ত্তে রাখবার বুদ্ধি তখন কোথায় পাবেন মিঃ চ্যাটার্জি!

কালীপদ বসলো অশ্বিনীর বৈঠকখানায়। পয়সা কিছু করেছে অশ্বিনী কিন্তু পাড়াগাঁয়ের বেশি পয়সা মানে পাঁচ-দশ হাজার ছাড়া কি হতে পারে? কাবুলী কালীপদ বিশ-পঁচিশ হাজারের মালিক। অশ্বিনীর বৈঠকখানায় বসেই সে অনুমান করতে চেষ্টা করতে লাগলো, অশ্বিনীর পয়সার পোঁটলাটা কত ভারী হতে পারে।

সেকেলে একটা শাল কাঠের বড় চৌকি, তার উপর শতরঞ্চ আর

চাদর, তিনটে তাকিয়া বালিশ, কিন্তু বালিশের ওয়াড়গুলো ছেঁড়া দু'তিন যায়গায়। ক্যাম্বিশের একটা কমদামী ইজিচেয়ার, আর একটা কাঠের চেয়ার যার বাঁদিকের হাতাটা নেই। ভাঙ্গা একখানা টেবিল, যুদ্ধের আগে যার দাম হোতে পারতো টাকা চারেক। দেওয়ালে গোটাকয়েক ছবি—বটতলার সস্তা ছাপা। একটা পুরোনো এন্‌সোনিয়া ক্লক আছে, এখন ওর দাম শোখানেক টাকা হতে পারে। ঐ ঘড়িটাই এই ঘরের সব থেকে দামী আসবাব—কিন্তু সমস্ত ঘরখানায় একযোগে এমন কিছু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় নি যাতে কালীপদর মনটা খুশী হতে পারে। কাবুলের নোংরা বস্তিতে ছিল কালীপদ, তার আগে ছিল জেলের শেলে, তাই বুঝি ওর মনটা মনের অজ্ঞাতে বিলাস-ব্যসনের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। কিন্তু অশ্বিনীর বৈঠকখানার সাজসজ্জা ওকে খুশী না। করেও খুশী করলো—বুঝলো, অশ্বিনী এমন কিছু বড়লোক হয়নি! কালীপদ এর থেকে ভালো আস্‌বাব আনবে। কিন্তু এটা অশ্বিনীর পুরোনো পৈতৃক বাড়ী। কালীর ভিটেতে সে যে নতুন বাড়ী তৈরী করছে, সেখানা নিশ্চয় ভাল ফানিচার দিয়ে সাজাবে; তাহলে কি যথেষ্ট পয়সাই করেছে অশ্বিনী?

—বসো ভাই! সেদিন চিনতেই পারিনি···শরীরটি ঈশ্বরের দয়ায় বেশ আছে কিনা···ভেবেছিলাম, কোনো পেশোয়ারী-টারী হবে!

—কাবুলী···বলে হাসলো কালীপদ···বললো,—তুমি তো একদম বুড়ো হয়ে গেছ!

—আর হবো না? সংসারের ঝামেলা, ব্যবসা দেখা, মেয়ের বিয়ে, সবই তো একা করতে হয়···আবার ভাগ্নীটাও এসে কাঁধে পড়েছে··· ওরে ও হাসি! একটু চা করতো মা!—হাসি কাহুর মেয়ে, ওরও বিয়ে আমাকেই দিতে হবে। কি আর করি বলো! কাহু দুতিন মাস মেয়ে

নিয়ে এসে বসে আছে ; বলে, ওরকম মদমাতালের হাতে বোন দিলে ভাগনীর দায়ও পোয়াতে হয়—বুঝলে ?

অশ্বিনী হাসলো একটু। কালীপদ ঘরটাকেই দেখছিল তখনো, কথাও শুনছিল, বললো—তা হবে বইকি পোয়াতে! বিয়ে তো দিতে হবে!

—কিন্তু কি করে পারি বলো তো! নিজের মেয়ে দুইজোড়া পার করলাম, এখনো রয়েছে একটা, তবে দেরী আছে। এর পর ভাগনী!

—তা বোঝার উপর শাকের আঁটি···বলে কালীপদ হাসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অশ্বিনী তার হাসিটাকে সমর্থন না করে বললো, —তোমার আর কি? এতকাল তো বাইরে বাইরেই কাটালে। একটা মেয়ে, তাকে একফোঁটা দুধও তোমায় যোগাতে হয়নি! তার খিয়ের ব্যবস্থাও করে রেখেছে তারাপদ। 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' যে কতখানি তাতো বুঝলে না ভায়া!—ওরে ও হাসি!

—থাক, থাক, চা আমি খেয়ে এলাম···বলে কালীপদ অপ্রসন্ন মুখেই অশ্বিনীকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। অশ্বিনীর কথাগুলো বিঁধছে যেন ওর বুকে! মেয়ের জন্য একফোঁটা দুধও কালীপদকে যোগাতে হয়নি ;—না—যোগাতে হয়নি, কিন্তু যুগিয়েছে তারই ভাই,—মা'র পেটের ভাই—অশ্বিনী নয়—এই পৃথিবীর আর কেউ নয়। অশ্বিনীর আর এভাবে কথা বলা উচিত হচ্ছে না ;—কিন্তু কালীপদর মন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বিষয়ী—বাড়ীটার ফেরৎ-ব্যবস্থা করতে সে এসেছে, কাজেই ভাবলো—অশ্বিনী লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না—তারপর, থাকে পাড়াগাঁয়ে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়। বললো,—চা থাক, ভাগনীর বিয়ের কি করলে, বলো!

—কি আর করব? ভেবেছিলাম, চোখের ওপর তারাপদটা

আইবুড়ো রইল ; হাসি দেখতে শুনতে কাজে কর্ম্মে মন্দ নয়, দিয়ে দি ওকেই ; তা তোমার ভাইটিকে তো জানো,—ইস্পাৎ। বললো—না। 'না' বললে আর 'হ্যাঁ' করাবে কে তাকে!—পাত্রের বাজার বড় চড়া, কালী, বুঝেছো, যুদ্ধের বাজারে শাক, বেগুন, কচুর সঙ্গে পাত্রের বাজারও বেশ চড়ে গেছে!

—চড়িয়ে দিচ্ছে ওরা,—কালীপদর আঠারো বছর আগের বৈপ্লবিক মন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলে—স্বার্থ-সন্ধানী বণিকের দল এই দেশটার অর্দ্ধেক লোককে মেরে বাকি অর্দ্ধেককে আধমরা করে রাখতে চায়, যারা অন্নবস্ত্রের জন্যই উর্দ্ধশ্বাস হয়ে যাবে, স্বাধীনতার কথা ভাববার অবসরই পাবে না। যারা পঁচিশ টাকার কেরানীগিরির জন্যে পাঁচশো লোকের পায়ে তেল মালিশ করবে—পয়জার মেরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেই যারা খুসী হয়ে বলবে—পায়ে লাগেনি তো হুজুর!

অশ্বিনা হাঁ করে চেয়েছিল কালীর মুখের দিকে। হাতের খাতাটা, —যেটায় ইট্-চুণ-সুরকীর হিসেব লিখছিল কালী আসবার আগে, সেটাকে সরিয়ে রেখে বললো—তুমি এখনো তেমনি স্বদেশী আছো নাকি কালীপদ?

—না—বিদেশী হয়ে গেছি—কালীপদ হেসে জবাব দিল—বহুদিন বাংলার বাইরে থাকার জন্য দেশের অবস্থাটা মোটে জানতাম না; কাল সহরে গিয়ে কিছু কিছু টের পেলাম। কাল-ই বুঝতে পারলাম. আমি আর দেশী নাই, বিদেশী হয়ে গেছি। কাবুলী!—আবার হাসলো কালীপদ। অশ্বিনী বুঝতে পারছে না, কি ও বলতে চায়। কুড়ি বছর আগের কালীপদকে ও জানতো, দুর্দ্দান্ত, দুঃসাহসী, দুর্দ্দম কিন্তু আজকার কালীপদ, পুলিশের এতো ঠেঙানি খাওয়ার পরেও তেমনি দুর্দ্দম আছে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত অশ্বিনীর পক্ষে। অশ্বিনী সাধারণ

মানুষ, অসাধারণত্ব ওর মধ্যে যেটুকু আছে সেটুকু ওর বিষয়-বুদ্ধি! ঐ বিষয় বুদ্ধির জন্যই সে কালীকে খাতির করে ঘরে বসিয়েছে, কারণ ও বুঝেছে, মামলা করলে অশ্বিনীর ভিৎগাঁথা বাড়ির অংশ কালীপদ নিশ্চয় পেয়ে যাবে; তাতে অশ্বিনীর মস্ত ক্ষতি; সে জমিতে আর বাড়ী হবে না; তাই অশ্বিনী চায় কালীপদকে বিক্রী-কবলাটায় আটকাতে। তারজন্য আরো দু'একশো দিতে সে রাজি আছে। কিন্তু কালীপদ যদি এখনো স্বদেশীমার্কা কালীপদই থেকে থাকে, তাহলে টাকা দিয়ে তাকে বশ করা সোজা হবে না—হয়তো মোটেই সম্ভব হবে না।

কিন্তু কালীপদ ভাবছিল অন্যরকম। ভাবছিল, সে বৈদেশিক হয়েই এখানে এসেছে। কারো সঙ্গে কোনোরকম আত্মীয়তার চক্ষুলজ্জা তার আর রাখবার দরকার নেই। অশ্বিনী কি ভাবে পয়সা করেছে, সে খবরও উকীলবাবুর কাছে শুনেছে কালীপদ—শুধু জানতে পারে নি পয়সাটার পরিমাণ কত। নিজে সে দেশী নেই, বিদেশী হয়ে গেছে—কথাটার মধ্যে কালীপদ বলতে চাইলো যে সে এখন কাবুলীদের মত নিজের পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্যই এখানে এসেছে। কথাটা এভাবে সে হয়তো বলতো না, কারণ কালীপদ বর্ব্বর হলেও শিক্ষিত বর্ব্বর, কিন্তু কয়েক মিনিট আগে অশ্বিনীর সেই কথাটা, 'মেয়েকে দুধ না যোগাবার কথাটা'—ওর মনকে তাতিয়ে রেখেছিল···কালীপদ এইবার সরাসরি বাড়াটার অর্দ্ধেক অংশ দাবী করবে—হাসি চা নিয়ে এলো দু'বাটি। অশ্বিনী যেন কথা খুঁজে পেয়ে বললে—দে।···এইটি হাসি! মস্ত মেয়ে হয়ে উঠেছে, কি করে যে বিয়েটা দিই!

কালীপদ হাসির হাত থেকেই নিল চায়ের বাটিটা। তাকালো ওর মুখপানে। কৃষ্ণার মত সুন্দর নয়, কিন্তু বেশ সুশ্রী। সহর ঘোরা আছে বলে সাজসজ্জায় অত্যন্ত পরিপাটি; টাইট ব্লাউজটার হাতা থেকে যেন

রজনীগন্ধার শীষের মত হাতখানি বেরিয়ে এসেছে, তারপর আঙুল-গুলি, যেন সাদা সাদা ফুল। সেই আঙুল লীলায়িত করে বেঁকিয়ে হাসি চামচা দিয়ে চিনি গুলে দিল দুটো বাটিরই; খানচারেক দেশি বিস্কুট একটা প্লেটে এগিয়ে দিল, তারপর চলে যাচ্ছে আস্তে। অশ্বিনী বললো, —পান এনে দিস! হাসি চলে গেল কোনো কথা না বলে। কিন্তু কালীপদ যে কথাটা বলতে যাচ্ছিল সেটা বলতে দেরী করছে—চা খেতে লাগলো আস্তে!

—মেয়ে কিছু মন্দ নয়, দেখলে তো? তারাপদকে বলো না তুমি বিয়ে করতে! এমন কিছু বয়স তারাপদর হয়নি এখনো!—বললো অশ্বিনী!

—না, বয়স আর কি এমন—স্বাস্থ্য ভাল থাকলে বিয়ে তো আমিও করতে পারি এখনো....মাত্র চল্লিশে পড়লাম···বলেই কালী যেন কেমন লজ্জা অনুভব করলো—তাড়াতাড়ি কয়েক ঢোঁক চা গিলে ফেললো কালী। অবচেতন মনের আকস্মিক চেতনতা নাকি? ভোগবঞ্চিত মনের ভীরু প্রকাশ নয় তো কথাটা ওর? কিম্বা কালীপদ কথার পিঠেই কথাটা বলেছে—ওকথার কোনো অর্থ নেই! অশ্বিনীর বিষয়ী মন এক লহমায় কালীপদ সম্বন্ধে ক'টা কথা ভেবে নিল—দেখে নিল, কালীর বয়স চল্লিশ হলেও যৌবন তার অটুট আছে; পয়সাও কিছু নিশ্চয় আছে। একমাত্র কন্যা আছে, বিয়ে দিলেই শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে—কালীপদ মন্দ তো নয়ই, বরং সুপাত্র। অশ্বিনী আনন্দটা একটুখানি চেপে রেখে বললো, —বিয়ে তো তোমার করাই উচিত! মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে, তোমাদের দুভাইকে দেখবে কে? হ্যাঁ, তারাপদর যদি বৌ-ছেলে-মেয়ে থাকতো, তাহলে অবশ্য···কথাটা শেষ করলো না।

লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই হয়তো কালীপদ অত্যন্ত দ্রুত বলে ফেললো কাজের কথাটা···

—থাক্ গে! তারাপদর গোয়ার্তুমী আমি ভাঙতে যাব না! শোনো অশ্বিনী, ঐ যে বাড়ীর সামনের অংশটা তুমি কিনেছো, ওটা তো ভাই আমি বেচতে পারবো না···আমায় নিজে থাকতে হবে তো!

—নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে, পিছনদিকে অনেকখানা রয়েছে তোমাদের জমি! অবশ্য, তুমি ফিরে আসবে, একথা জানলে ওবাড়ী আমি কিনতাম না। এখন ওতে ভিৎ গেঁথে ফেলেছি, ইঁট আনানো, রাজখাটানো—আমার তো আরো পাঁচ-ছশো টাকা খরচ হয়ে গেল...অশ্বিনী থামলো।

—তাতো দেখছি। সে সব খরচ তোমার এই খাতার হিসেব অনুযায়ী আমি দিয়ে দেব, আর যে টাকাটা তারাপদকে দিয়েছ, সেটাও ফেরৎ দেব—তোমার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা আমি সৃষ্টি করতে চাই না।

অশ্বিনী বিষয়ী ব্যক্তি। কথাটার জবাব দিতে তার দেরী হচ্ছে! হাসি পান নিয়ে এল একটা ছোট বাটিতে। নিজেও একটা পান খেয়েছে হাসি, ঠোঁট দুটো লাল। কালীপদ চাইলো ভয়ে ভয়ে, কিন্তু চাইলো; চেয়ে দেখলো হাসির আপাদ-মস্তক। সলজ্জিতা হাসি আস্তে বেরিয়ে গেল।

—আচ্ছা। আমি একটু ভেবে তোমায় বলবো—অশ্বিনী বললো!

—কবে?

—কালই, এমন কি আজ বিকালেও বলতে পারি! মামলা করবার ইচ্ছে আমারও নেই—আর করে লাভও নেই। পৈতৃক ভিটের অংশ তোমার ন্যায্য পাওনা। তবে তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যই তারাপদ ভিটে বিক্রী করেছে, দলিলে সেকথাটাও লেখা আছে—এই যা!

—বেশ, তুমি ভেবেই আমাকে বলবে, কি করতে চাও!

কালীপদ পান নিয়ে উঠলো। পান সে খায় না। কতকাল খায়নি

পান। কিন্তু আজ খেলো। কাবুলী বাদামভাঙা দাঁতগুলো বাঙলার কচি পান চিবুতে খুব আরাম অনুভব করছে—তারপর ঐ পান রচনা-কারিণীর কচি হাত দুটি, কুঁড়ি কুঁড়ি আঙ্গুলগুলি!

কালীপদ বাইরে এসেও আর একবার তাকালো বাড়ীটার পানে। ছাদের উপর হাসি কাপড় শুকুতে দিচ্ছে। কালীপদর সঙ্গে ওর আবার চোখোচোখী হয়ে গেল—এই নিয়ে তিনবার—নাকি চারবার?

ঋষি বলেছেন, 'ভোগ যে না করেছে, ত্যাগ সে শিখবে কেমন করে?' কথাটা আপ্তবাক্য! ওর সত্যতাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কালীপদর কাবুলবাসী মন, যে-মন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, সঞ্চয়কে যে জঞ্জাল বলে ভাবতে চেয়েছিল এই কয়েকদিন পূর্ব্বেও, সেই কালীপদই আজ মন্দার গ্রামের সরু পথটায় হেঁটে চলেছে;—কিন্তু এ কালীপদ সে কালীপদ নয়। এখনো কিন্তু সেটা সম্যকরূপে বুঝতে পারে নি কালীপদ। বুঝবার চেষ্টাই সে করছিল না। সে ভাবছিল,—হাসি মেয়েটি বেশ। কৃষ্ণার বান্ধবী হাসি, ওর চেহারা কৃষ্ণার থেকে এমন কিছু কম সুন্দর নয়—তাছাড়া, কৃষ্ণার চেয়ে হাসির প্রসাধন-পারিপাট্য আর নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি অনেক বেশি। কৃষ্ণা যেন পাতাঢাকা কেয়াফুল, হাসি গোলাপ-অশোক-কিংশুকের মত সুপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশমানা।

কবি কালীপদর মনে পড়ে গেল—গোলাপ-অশোক-কিংশুক ফোটে শীতে-বসন্তে আর কেয়ার হাসি ফোটে বর্ষার অবগুণ্ঠনের তলায়। মনে পড়লো, গোলাপ বিলাসের বস্তু, ওকে নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া যায়, কিন্তু কেয়া তীরের মত—তরবারির মত; ওর অবগুণ্ঠন তরবারির কোষ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু যুদ্ধের তো প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ থেমে গেছে। বেশ কিছু

সঞ্চয়ও করে ফিরেছে কালীপদ—এখন কিঞ্চিৎ বিলাসেরই দরকার ওর যে-বিলাস বাসনার নিকুঞ্জে কবিতার ফুল ফুটিয়ে তুলবে, মনের বৃন্দাবনে মানসী রাধার বন্দনা রচনা করবে।

কালীপদ একদিন ছিল অগ্নিহোত্রী বিপ্লবী। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী কানাইলাল, রাসবিহারী ছিল ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উজ্জ্বল করে, আদর্শ হয়ে। জেল-জীবনেও কালীপদ ভেবেছে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"। কবিতা আউড়েছে :

"বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়—ন্যায্য অধিকার,—
তীর্থ হোল বন্দীশালা—শিকল অলঙ্কার !"

এ কি সেই কালীপদ ? কে ওকে এমন করে ভেঙে গড়লো ? কার পাপে অথবা কার পুণ্যে ওই মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক কালীপদ আজ আত্মবিসর্জ্জন দিল, আত্ম-বিক্রয় করলো—আত্মঘাতী হোল ? কেউ নেই উত্তর দেবার ! যারা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করবার জন্য, মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার জন্য ভেদনীতির অমানুষিক অস্ত্র তৈরী করেছিল—মানুষে মানুষে ভেঁড়ার লড়াই লাগিয়ে দিয়ে যারা মজা দেখেছিল—বুঝতে দেয়নি দু'টাই ভেঁড়া—ওদের মারামারি করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না....এ সেই কূটনৈতিক শকুনীর দল—অনশনে মৃত মড়ার হাড়ের পাশা খেলে যারা কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিল।

কিন্তু কালীপদ একবারও চমকালো না—একবারও চেয়ে দেখলো না, যে রাজমিস্ত্রিগুলো আর মুনিষগুলো ওখানে খাটছে, তারা জীর্ণদেহ, শীর্ণকঙ্কাল। একবারও ভাবলো না, ওরা চল্লিশকোটি ভারতবাসীর আত্ম-জন—আত্মীয় ! ওরা জন্তু থেকে যন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে—ওরা জীবিত থেকে জীবনমৃত হয়ে যাচ্ছে ! কিন্তু কালীপদ যে মোটে কিছু ভাবছিল না, তা নয় ; সে ভাবছিল এই বাড়ীর প্ল্যানটা ঠিক হয় নি, অশ্বিনীর কাছ

থেকে বিক্রয়-কবলা ফেরৎ পেলেই কালীপদ প্ল্যান বদলে ফেলবে। সামনে থাকবে ছোট্ট একটু বাগান, তারপর বাড়ীর বারান্দা—দোতালার বারান্দায় ফুলের টব—ছাঁদকাটা রেলিং, চক্‌চকে কাচ দেওয়া জানালা, ঝক্‌মকে পালিশ করা দরজা, আর বাড়ীটার রং হবে, সাদা, না গেরুয়া, না, ঈষৎ নীল্‌চে। কত টাকা খরচ পড়তে পারে? পাঁচ-দশ-পনর হাজার! হোক্; কালীপদর আছে টাকা! সুন্দর করে বাড়ীটা সাজিয়ে জীবনের শেষ কয়টা দিন বাস করবে কালী। বাড়ীতে অনেক লোকও থাকবে, চাকর, ঝি, ঠাকুর—আর—আর কৃষ্ণা……!

কিন্তু হাসির হাসিমাখা মুখখানাই মনে এলো কালীপদর, কৃষ্ণার মুখখানা কোথায় লুকিয়ে গেছে যেন!

তারাপদর সঙ্গে ম্যানেজার এসে দেখা করলো। মনিবের আদেশ এবং নির্দ্দেশ মত ব্যবস্থা করলো ম্যানেজার···ছোট ম্যানেজারের থাকবার জন্য যে বাংলোটা তৈরী হয়ে খালি পড়ে ছিল, সেইটাকে তারাপদর কোয়ার্টারে পরিণত করা হল; তার কাছেই বড় একখানা ঘরে লাইব্রেরী হবে। স্কুলবাড়ী ওর কাছাকাছি একটা যায়গায় তৈরী করিয়ে দেওয়া হবে অবিলম্বে—তারাপদর মত নিয়ে যেন প্ল্যান তৈরী করা হয়। কারখানার শ্রমিক-সঙ্ঘের সভাপতি তারাপদ,—শ্রমিকদের যা-কিছু দাবী-দাওয়া সব দেখবার এবং মেটাবার ভার রইল তারাপদর উপর। অর্থাৎ তারাপদকে এই কারখানায় লাটসাহেবের মত ক্ষমতা দেওয়া হোল, শুধু তারাপদ যেন বিশেষ জরুরী কোনো কিছু করবার পূর্ব্বে এখানকার ম্যানেজার নিত্যানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করে—আর ম্যানেজার প্রয়োজন হলে যেন মিঃ চ্যাটার্জ্জির কাছ থেকে অনুমোদন নেন।

তারাপদ নির্ব্বোধ নয়; ধনতন্ত্রবাদের কূটনীতি এবং দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষা ওর বুঝতে দেরী হোল না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে অপর কিছু করবার মত না পেয়ে ঐটাই মেনে নিল—যদিও সে বুঝতে পারছে—নিতান্ত ছিটেফোঁটা ছাড়া এতে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না। নিজের জন্য সে কোনোদিন কিছু দাবী করেনি,—কিন্তু আজ তারই জন্য এত বেশী রকম ব্যবস্থা এবং এতো ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেল যে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিতান্ত মূর্খের কাছেও ধরা পড়বে। কিন্তু তারাপদ ধীরবুদ্ধি এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। এই দানকে অগ্রাহ্য করে এখুনি একটা অশান্তিকর অবস্থা আনতে সে চাইলো না। সে দেখতে চায়—আরো কি মতলব আছে এই কূটনীতিবিদ্‌দের।

নিজের থাকবার জন্য একটু যায়গার তার আজ দরকার খুবই। সামান্য এবং স্বল্প দিনের জন্যই দরকার, কারণ তারাপদর কাজ বৃহত্তর বাঙলায়, বাঙলার বাইরে, এমন কি প্রয়োজন হলে ভারতেরও বাইরে—এতকাল শুধু কৃষ্ণার জন্যই সে তার জীবন-স্বপ্নকে সফল করতে পারেনি। এবার কৃষ্ণার বাবা এসে তার ভার নিল. তারাপদ নিশ্চিন্তে তার মানস-পথের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাবে। অতএব তারাপদ শুধু হাসলো একটু—স্পেশ্যাল ট্রেণ বা মোটর লঞ্চ বা সরকারী আতিথ্যও কোনো শক্তিমান গণনেতা নিশ্চয় গ্রহণ করতে পারে, যখন সরকারের তাকে প্রয়োজন হয় গণমনকে আয়ত্ত করবার জন্যই। কিন্তু সেই গণনেতাকে সকল সময় মনে রাখতে হবে, গণশক্তিই তাঁকে ঐ উচ্চাসন যোগাচ্ছে—সরকার নয়। কিন্তু এর সমস্তটাই বৃটিশ পলিসি! তারাপদ জানে এবং অনুভব করে এই সম্মান এবং উচ্চাসন দানের অর্থ কি। তবু সে কিছু বললো না—শুধু একটু হাসলো, ব্যঙ্গের, বিদ্রূপের হাসি!

ম্যানেজার অতকিছু ভাবছিল না। শ্রমিকদের দাবীর অধিকাংশই

পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো ; তারাপদ নিশ্চয় খুসী হয়েছে এবং তার জন্য ভালোরকম ব্যবস্থা করায় আরো খুসী হওয়া উচিত, এইটাই ভাবছিল ম্যানেজার। তারাপদর সঙ্গে কথা শেষ করে সে মনিব চ্যাটার্জ্জিকে খবর দিতে গেল।

কারখানার কাজ আরম্ভ হয়েছে যথারীতি। চ্যাটার্জি চুরুট টানতে টানতে দেখছিলেন, চিম্‌নিগুলো থেকে কি রকম গল্‌ গল্‌ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঐ ধোঁয়ায় নীল আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে ; ঢেকে যাচ্ছে প্রদীপ্ত সূর্য্যালোক। ঐ ধোঁয়ার নীচে আছে যে উত্তাপ, তাকে উত্তপ্ত রাখবার জন্যই শ্রমিকের প্রয়োজন। মিঃ চ্যাটার্জি ভাবছিলেন, উত্তাপই জীবন, ঐ উত্তাপই রক্তের উষ্ণতা,—ওকে শীতল হতে দেওয়ার অর্থ মৃত্যু। কিন্তু ওকে উত্তপ্ত রাখবার জন্য যে ইন্ধন আজ যোগাতে হচ্ছে, তার ব্যয়বাহুল্য আতঙ্কিত করে তুলবে হয়তো এই কারখানার মালিকদের। হয় তো তাঁরা কলকাতায় গদিআঁটা কুশনে বসে ভাববেন, মিঃ চ্যাটার্জি শ্রমিকদের অন্যায় দাবীগুলো মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মালিকদের দিকটা দুর্ব্বল করে তুলেছেন। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি জানেন, দুর্ব্বলতা তিনি কোথাও দেখাবেন না। ঐ দাবী মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে আছে তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি—তাঁর বিচক্ষণতার জাজ্বল্য প্রমাণ।

ম্যানেজার এসে পৌঁছালো। মিঃ চ্যাটার্জি শুধু তাকালেন জিজ্ঞাসু-ভাবে।

—হ্যাঁ, ওকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে এলাম স্যার—ম্যানেজার বললো—ছোট বাংলোটাও ওর জন্যে ব্যবস্থা করে দিলাম। আর ওকেই লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার করে দেওয়া হোল।

—বেশ, বেশ,—এবার ওকে খুন করতে হবে—মিঃ চ্যাটার্জি হাসলেন চুরুটের ফাঁকে !

—খুন!—চম্‌কে উঠলো ম্যানেজার।

—হ্যাঁ, খুন! ওর রক্ত-মাংসের শরীরটাকে নয়, ওর বিদ্রোহী আত্মাকে, ওর জীবন্ত জাগ্রত স্বদেশপ্রেমকে। শুনুন, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ওকে একটা বড় রকম অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করুন। তার সঙ্গে থাকবে নগদ পাঁচ হাজার টাকার তোড়া একটা ওর জন্য···টাকাটা অবশ্য আমিই দেব।

ম্যানেজার প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে রয়ে গেল, তারপর বললো, —বুঝলাম, কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষের আমি তো কেউ নই স্যার! আমায় তারা বিশ্বাসই করবে না।

—জানি; আপনার ছেলেকে ডাকুন—আমি তাকে বুঝিয়ে বলছি ঠিকমত!

ম্যানেজার বাইরে এসে ছেলেকে ডেকে পাঠালো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টুং টুং আওয়াজ হোল সাইকেলের। পরমুহূর্তে অভিবাদন করলো এসে ম্যানেজারের ছেলে। সুন্দর চেহারাটার পানে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ চ্যাটার্জি, তার পর মৃদু হেসে বললেন,—তোমাকে আজ আমার বড় দরকার। যে-তারাপদ তোমাদের জন্য এতখানি করলো, তাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবার কি ব্যবস্থা তোমরা করেছো?

—তিনি শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধার বাইরের লোক স্যার।

—জানি, কিন্তু তোমাদের, মানে শ্রমিকদের তো একটা কর্ত্তব্য আছে তার উপর।

—সেটা আমরা, মানে শ্রমিকরাই ভেবে ঠিক করতে পারবো!

—বড় খুসী হ'লাম তোমার কথায়; তোমরা কিছু ঠিক করেছে কি না, জানতে চাইছি।

—ঠিক কিছু করেছি বৈকী! ওঁকে অভিনন্দন দেবার অছিলায় আমরা

অপমান করবো না। টাকার তোড়া দিয়ে ওঁকে তালগাছে তুলে দেব না—ওঁর হাতের নাম-সই নিয়ে অশুচি-অস্পৃশ্যদের জন্য ফাণ্ড খুলে টাকা আদায় করবো না—ওঁকে আমরা দেবতা বানাবো না,—উনি আমাদের মাঝেই থাকবেন শ্রমিক-মানুষ হয়ে।

মিঃ চ্যাটার্জি নিশ্চুপ শুনে গেলেন কথাগুলো। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর। চুরুটের ধোঁয়ায় সেই রক্তাভা ঢেকে নিজেকে সামলে বললেন,—ঠিক কথা! কিন্তু উনি শুধু তোমাদের কারখানার শ্রমিক নন, উনি এই দেশের একটা মানুষ; দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে,দেশের সমাজ-জীবনের বিশৃঙ্খলায়, দেশের রাজনৈতিক জীবনের রক্তাক্ত পথে ওঁকে দাবী করবে দেশের মানুষ। তোমরা নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখে ওঁকে এই ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে আটকে রাখতে পার না। বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে ওঁর আহ্বান আসছে।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার, কি আপনি বলতে চান? ওঁকে কি চাকরী থেকে বরখাস্ত করে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতে চান?

—না-না-না,—হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি—ওঁর মতো লোককে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবার দুঃসাহস আমার নেই। আজ ওঁকে আমারই প্রয়োজন সবথেকে বেশি। আমি চাইছি—জনমঙ্গলের কাজে ওঁর জীবন আরো বিস্তৃত হোক—আরো ব্যাপকভাবে কাজ করুন উনি, এই গ্রামে, এই জেলায়, এমন কি এই গোটা দেশটায়। ওঁকে সেই কাজে আমি সাহায্য করবো, তোমরাও করো!

—আপনার তাতে স্বার্থ কি স্যার?

—জনস্বার্থই আমার স্বার্থ মানুষ বেঁচে থাকলে তবে না আমাদের পণ্য বিক্রী হবে—তবেনা আমরা কারখানা চালাতে পারবো!

—কথাটা তো ধনিকদের মতন শোনাচ্ছে না স্যার—হ্যাঁ স্যার,

ধনিকদের মতই শোনাচ্ছে—মুরগীকে বেশ করে খাইয়ে মোটা করে' তার পর জবাই করলে মাংস বেশী পাওয়া যাবে........তা আমায় কি করতে হবে? ছুরিতে শান দিয়ে দেব?

বিদ্রূপটা এতো কঠোর এবং শ্রুতিকটু যে মিঃ চ্যাটার্জির মুখচোখ কুৎসিৎ হয়ে উঠছিল রাগে, কিন্তু উনি অতিশয় ধৈর্য্যশীল এবং কাজ হাসিল করবার জন্য যে-কোনো রকম হীনতা স্বীকার করতে সক্ষম। কিন্তু ম্যানেজার অত্যন্ত চটে গেল, ছেলের কথায়। ধমক দিয়ে বললো —চুপ কর হতভাগা নেমখারাম। যার অন্ন খাস, তার মুখের ওপর......

—ওঁর অন্ন আমি খাইনি বাবা........

—তোর বাবা খেয়েছে—ম্যানেজার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েই বললো!

—না—আমার বাবার শ্রমের ন্যায্য মূল্যই উনি দেন নি। আমার বাবার সংসার প্রতিপালনের দীনতাকে কাজে লাগিয়ে উনি বাবাকে প্রতারিত করে, ক্রীতদাস করে রেখেছেন। আমি আমার ক্রীতদাস বাপকে মুক্ত করবো—ক্রীতদাসের যুগ আজ অস্ত গেছে পৃথিবী থেকে।

মিঃ চ্যাটার্জি সামলে উঠেছেন এর মধ্যে। ম্যানেজারকেই তিনি বললেন,—আপনি থামুন ম্যানেজার বাবু! যান আপনি ওঘরে। ওর সঙ্গে আমি কথা কইচি—আপনি মাঝখানে থাকবেন না!

ম্যানেজ্যার ছেলের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল। কিন্তু ছেলেটার উপর ক্রোধ যেন বজায় থাকছে না আর। অদ্ভুত ছেলে! অসাধারণ! ম্যানেজার নিত্যানন্দ এই মুহূর্ত্তে অনুভব করলো,—সত্যি তার শ্রমের মূল্য যথাযোগ্য দেওয়া হয় নি,—সত্যি সেও একজন শ্রমিক, সেও ক্রীতদাস!

ম্যানেজার চলে যাবার পর, মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—তুমি কি তোমার বাবাকে ক্রীতদাস মনে কর?—তিনি এখানকার সম্মানিত ম্যানেজার!

—সম্মানিত!—হাসলো বেয়াদপ্ ছেলেটা হা-হা করে—জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার ঐ বাবা উনিশ শো চোদ্দ সালের বোমার মামলার আসামী—হাঁ,আপনি তো জানেনই—বিশ একুশ সালে যখন বিদেশী বয়কট সুরু হোল,—যখন স্বদেশে দেশী মাল উৎপন্ন করবার জন্য আপনারা এই কারখানার পত্তন করলেন—তখন উনি জেল থেকে সবে বেরিয়ে এসেছেন—আমি তখনো জন্মাইনি, কিন্তু পরে ওঁরই কোলে বসে স্বদেশী যুগের সেই বীর সন্তানদের বীরত্ব গাথা আমি শুনেছি কতবার। ঠিক সেই সময়—যখন এদেশের প্রত্যেকটি লোক সর্ব্বস্ব দিয়েও দেশের শিল্পকে, দেশের মানুষকে রক্ষা করবার জন্য উন্মুখ—তখনি আপনারা ওঁকে ক্যাপচার করলেন দেশের সেই দুর্ব্বল—না,—সেই ত্যাগ-শক্তির নিষ্ঠাকে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লাগাতে! মুক্ত রাজবন্দীর উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধা তখন দেবতার প্রতি ভক্তের মত! আপনারা আমার ঐ সর্ব্বস্বত্যাগী মুক্তি-সাধক বাবাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী করেছেন—দেশের কাজে নিযুক্ত করবেন বলে' দেশের লোককে প্রতারিত করে' সে অর্থ নিজেদের ভোগে লাগিয়েছেন—আর আমার বাবা,—যে বাবা ভারতের মুক্তি-সাধন-যজ্ঞের একটা বিরাট হোমশিখা হতে পারতেন, তিনিই আপনাদের সাহায্য করেছেন সেই ভয়ঙ্কর প্রতারণার কাজে!

চোখদুটো ছলছল করছিল ওর আবেগে, উদ্দীপনায়—একটু দম নিয়ে আবার বললো—বাবা আমার মুক্তি-সাধকশ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর সহকারী। —উনি ক্ষুদিরামের ফাঁসী দেখেছেন, কানাইলালের কথা শুনেছেন, এমন কি অসহযোগের সময়ও উনি ছিলেন নিষ্ঠাবান দেশকর্ম্মী—আর আজ!—উনি আপনার চাটুকার, তোষণনীতিতে সুদক্ষ চাকুরে বাবু!

—কিন্তু কেন এমন হোল?—মিঃ চ্যাটার্জির কণ্ঠস্বর নিখাদে নেমেছে যেন।

—আপনারাই করেছেন। আপনারা, স্বার্থান্বেষী ধনিকের দল, বণিকের দল, মালিকের দল সর্বত্র দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোকে এমনি করেই বিপথে চালিত করেন—অত্যাচারে ওদের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দেন, অভাব সৃষ্টি করে ওদের মনকে করেন অসহায়—দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে' ওদের সুমুখে ধরেন চাকরীর দিল্লীকা লাড্ডু!—জানেন স্যার, দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন মুক্তি-সাধক আজ আপনাদের চক্রান্তে চাকুরী-জীবী!—রাজনৈতিক বন্দীত্বকে ওঁরা একটা কোয়ালিফিকেশন হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছেন—উৎপীড়ন আর অভাবের ভীষণতা তাঁদের এতখানি নীচে নামিয়েছে। তিনি লেখেন—তিনি রাজবন্দী ছিলেন, অতএব তাঁকে চাকরীটা দেওয়া হোক। কে ঘটালো এতখানি নৈতিক অবনতি? কার চক্রান্তে আজ সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানের দল আনন্দমঠের সাধনভূমিকে এমন করে বিলাসকুঞ্জে পরিণত করলো? কিন্তু আমরা ওঁদের সন্তান—ওঁদের যৌবনের সেই রুদ্র রক্তধারাকে প্রবহমান রাখবো—ওঁদের উদ্ধার করবো—পুত্রের যা কাজ—পিতৃপুরুষের উদ্ধার!

মিঃ চ্যাটার্জি বেশ বুঝতে পেরেছেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গর্ত্তে এসে পড়েছেন তিনি! বাচ্চা হ'লে কি হবে,—টাইগারটা রয়েল বেঙ্গল। আর কিছু বলতে দেওয়া ঠিক হবে না ওকে, কিন্তু ও আবার আরম্ভ করলো, যেন গর্জন করছে,—

—পৌনে দু'শো বছরের মধ্যে মানুষের আর্থিক বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে, শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে, শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে, শক্তিকে লোপ করা হয়েছে—রাখা হয়েছে ততটুকু যতটুকু আপনাদের প্রয়োজন।

—কিন্তু আমরা একা এর জন্য দায়ী নই—মিঃ চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি বললেন, ওকে শুধু থামাবার জন্যই বললেন—ইউ সি মাই বয়,—আমিও এই দেশেরই একজন মানুষ,—আমি কি চাই না দেশের স্বাধীনতা? আমি কি চাই না, আমার দেশ ধনে-জনে-যৌবনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হোক!—আমিও চাই,

—না, চান না; আপনার এবং আমার স্বার্থ পরস্পর বিরোধী! আপনি চান, আমার শ্রমশক্তিকে যতদূর সম্ভব কম মূল্যে কিনে আপনার পণ্য-মূল্যের মার্কেট তৈরী করতে; এই মার্কেট তৈরী করবার জন্য আপনারা কি না করতে পারেন—জানি না। হাজার হাজার পাটচাষীকে বঞ্চিত করেন, তাঁতীকে বেকার রেখে দেন, জেলেকে জাহান্নমে পাঠান, কামার-কুমারকে কুকুর-শেয়ালের মত পথে বের করে দেন। অভাব সৃষ্টি না হলে আপনাদের মার্কেট হয় না,—তাই মার্কেট তৈরী করতে আপনাকে অর্থনীতির গোপনতম ঘরে চাবি এঁটে রাখতে হয়। হাজার লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে, লক্ষ লোকের অন্নে ভাগ বসিয়ে, কোটি লোককে পথে বসিয়ে আপনারা সোনার শস্য জ্বালিয়ে দেন, শিল্প ধ্বংস করেন, শিক্ষাকে পঙ্গু করে তোলেন। আপনাদের অর্থনীতির নিগূঢ় রহস্য এই—কিন্তু আপনাকে এসব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, ক্ষমা চাইছি! আমার দ্বারা তারাপদর কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়, মাফ্ করবেন!

—ক্ষতি কেন করবে তুমি? আমি চাইছি, তারাপদ তার কর্ম্মক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে তুলুক। ঐ যে নদীটা, ওরই বাঁধ বাঁধাবার জন্য ওকে কিছু টাকা তুলে দাও তোমরা, আমি দিচ্ছি মোটা রকম কিছু টাকা। দেশের কাজে ওর শক্তিটাকে তোমরা ব্যবহার করো……বুঝলে? আমার উদ্দেশ্য তারাপদকে তুলে ধরা সবার সামনে!

বলতে বলতে মৃদুমৃদু হাসছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ওঁর সৌম্য বদন-মণ্ডলে আভিজাত্যের আভা, চোখে বুদ্ধির চাক্‌চিক্য,—উনি আবার বললেন,—এখানকার কোনো মান্যগণ্য লোককে সভাপতি করে তোমরা তারাপদকে অভিনন্দন দাও,—দেওয়া তোমাদের উচিত। যে-টাকা ওকে দেওয়া হবে, সেটা ও এই দেশেরই কাজে ব্যয় করবে—ঐ নদীর বাঁধ, ঐ রাস্তাটা মেরামত, জঙ্গল পরিষ্কার, ম্যালেরিয়া ধ্বংস করা থেকে আরো অনেক কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পার তোমরা।

—আমি জানি না, স্যার, কেন আপনি এতখানা ঔদার্য্য দেখাচ্ছেন। আপনাকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত। আচ্ছা, আমি ভেবে বলবো আপনাকে।

নমস্কার জানিয়ে ও চলে যাওয়ার পর চ্যাটার্জি ডাকলেন ম্যানেজারকে, —অসাধারণ ছেলে আপনার ম্যানেজারবাবু! আমি ওকে ঠিক কাজে লাগাবো, দেখুন না। ম্যানেজার চুপ করে রইল। মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, —এখানকার মান্যগণ্য কোনো লোকের নাম বলুন তো, যাকে সভাপতি করা যায়।

ম্যানেজার একটুক্ষণ ভেবে বললো—ঐ তারাপদরই দাদা এসেছে, লোকটা গত আটাশ সালে রাজবন্দী হয়েছিল। শিক্ষিত এবং শক্তিমান লোক। শুনেছি, সাহিত্যিক, ভালো বক্তৃতাও দিতে পারে—ওকেই সভাপতি করা যায় না, স্যার?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ,—আপনি যান, ওঁকেই সভাপতি করে তারাপদকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল ওঁদের।

কৃষ্ণা কিছুই বললো না ওর বাবাকে,—এমন কি কাকার কাছ থেকে

পাওয়া চিঠিটাও দেখালো না। সে জানতে চায়—বাবা তার কাকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে? কাকার উপর বাবার স্নেহ-ভালবাসা কতখানি? কৃষ্ণার মনের আকাশে একটা গভীর কালো মেঘের রেখা উঠেছে; কাকাকে সে জন্মাবধি চেনে, কিন্তু বাবা তার কাছে নিতান্ত নতুন। কাকা সহজে বিচলিত হবার লোক নয়, হঠকারিতা কাকা কখনো করে না—কাকা তার অত্যন্ত ধীর এবং স্থিতধী। সেই কাকা আজ অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করে কারখানার কোয়ার্টারে বাসা নিল—এর মূলে খুব ছোটখাটো কারণ নিশ্চয় নেই। কাকার জন্য বাবা কি করে, —কৃষ্ণা জনতে চায়।

কিন্তু কালীপদ কিছুই করলো না। অশ্বিনীবাবুর বাড়ী থেকে ফিরে সে উঠোনের বাগানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলো, দু'একটা লতা তুলে দিল বেড়ার উপর, একটা গাছের সরু ডালগুলো ছৈছত্র হয়ে গিয়েছিল, কালী এক টুকরো দড়ি সংগ্রহ করে বেঁধে দিল ডালগুলো একত্রে। কনক ধুতুরোর গাছটাকে টেনে উপড়ে ফেললো—ফেলে দিল বেড়ার বাইরে—কৃষ্ণা রান্নাঘর থেকে সবই দেখলো চেয়ে চেয়ে।

—স্নান করো বাবা, বেলা হোল—বললো কৃষ্ণা; ওর শেষ তরকারীটা উনুনে ধোঁয়াচ্ছে।

—হ্যাঁ, যাই—কালীপদ উত্তর দিল। কী অত ও ভাবছে, কৃষ্ণা আন্দাজ করতে পারছে না। নিশ্চয় কাকার কথা। কাকারই কথা ভাবছে বাবা। কাকার চিঠির কথাটা কি বাবাকে বলবে কৃষ্ণা? বলাই তো উচিত—না বললে বাবা জানবে কি করে! কিন্তু বাবার বড় বড় চোখদুটো যেন স্বপ্ন দেখছে। কাকার জন্য চিন্তার চোখ তো ও নয়! আর কাকার জন্য চিন্তা করলে কৃষ্ণাকেই জিজ্ঞাসা করবার কথা! না;—বাবা আর কিছু চিন্তা করছে। থাক্, কাকার কথা কৃষ্ণা বলবে

না। বাবার নিজেরই উচিত তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া—কৃষ্ণার মনটা অকস্মাৎ অভিমানাহত হয়ে উঠলো।

কালীপদ তখনো বাগানে। স্নান করবার জন্য ওর কোনো তাড়া আছে বলে মনে হচ্ছে না ; অথচ বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। কৃষ্ণা আবার বললো,—এগারোটা বাজছে বাবা, স্নান করো!

—হুঁ—কালীপদ অতিসংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বাড়ীর শেষপ্রান্তের লতানো লাউলতাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। মাচা বেঁধে দিতে হবে ওটার, হয়তো সেই কথাই ভাবছে। কৃষ্ণা এঘরে এসে তেল, গামছা ইত্যাদি বের করে দিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। কালীপদ এদিক-ওদিক কি যে দেখছিল, সেই জানে, হঠাৎ রান্নাঘরের দরজায় এসে শুধুলো,—জেলে যাবার আগে আমি একখানা উপন্যাস লিখেছিলাম, সেটা আছে রে কৃষ্ণা?

—না বাবা, পুলিশে নাকি সে-সব নিয়ে গিয়েছিল।

কালীপদর মুখখানা অত্যন্ত মলিন দেখালো মুহূর্ত্তের জন্য, কিন্তু সে আর কিছু শুধুলো না, তেল মেখে স্নান করতে গেল দীঘিতে। কৃষ্ণা বসে বসে ভাবতে লাগলো, বাবা তাহলে এতক্ষণ ধরে উপন্যাসের কথাই ভাবছিল, কাকার কথা ভাবে নি! মনের অভিমানটা চোখের জলে গলে পড়বার উপক্রম করেছে। কিন্তু ও সামলে গেল। বাবা যদি কাকার খোঁজ নাই করে, কি তাতে বয়ে যাবে কাকার! কাকা তাঁর শক্তিশালী কর্ম্মী মানুষ। পৃথিবীর যেকোনো দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যকে কাকা বুক পেতে নিতে ভয় পায় না—কৃষ্ণা জানে সেকথা। কিন্তু কৃষ্ণা যে তার বাবার সম্বন্ধে অনেক কল্পনা করে রেখেছিল, অনেক আশার স্বপ্ন দেখেছিল—আদর্শের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি ভেবে তার বাবার উদ্দেশে বারবার নতি জানিয়েছিল। একি হোল! তার গগনচুম্বী পিতৃগর্ব্ব মাটির ধুলোতে

লুটিয়ে যেতে চাইছে!—কৃষ্ণার উষ্ণ নিশ্বাসটা ক্রন্দনাবেগে কেঁপে কেঁপে বের হোল বুক থেকে!

আপনাকে সম্বৃত করবার জন্য কৃষ্ণা উর্দ্ধদিকে তাকালো—অনন্তের পানে, অসীম গগনের দুর্নিরীক্ষ নীলিমার পানে, দীপ্ত দিবালোকে যে-গগন ঝলসিত হচ্ছে, বিলসিত হচ্ছে বিশ্ব-বিধাতার চেতন-স্পন্দনে—মুক্তির অবাধ অধিকারে!

—তোর বাবা কৈ কৃষ্ণা?—হাসির মা কাদম্বিনী এসে প্রশ্ন করলো। কৃষ্ণা তাকালো,—স্নান করতে গেছে—উত্তর দিয়ে কৃষ্ণা নিজের চিন্তাটাকে·কাদম্বিনীর আকস্মিক আবির্ভাবের চিন্তায় নিবিষ্ট করলো। কিন্তু কালীপদও আসছে। ভিজে কাপড়-পরা, গামছা গায়ে কালীপদ উঠোন পার হয়ে ঘরে এসে উঠলো। কৃষ্ণা শুকনো কাপড়, আয়না-চিরুণী ঠিক করেই রেখেছিল বাবার জন্য, তবু কাদম্বিনী কৃষ্ণাকে বললো, —কাপড় বের করে দাও কৃষ্ণা!—উঠে এল কাদম্বিনীও ঘরের দাওয়ায়। কালীপদ কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবতে লাগলো, কে এই মহিলা? মনে পড়লো, অশ্বিনীর বোন্ কাদু; বহুদিন দেখে নাই তাকে কালীপদ। তারপর কাদু একটু মোটা হয়েছে, চিনতে অসুবিধা হবারই কথা; কিন্তু কাদম্বিনী পরম আত্মীয়ার মতই বললো,—সংসারে মোটে লোক নেই, ঐটুকু মেয়ে কি আর একা সবদিক সামলাতে পারে?

কালীপদ উত্তর দিল না, ইতিমধ্যে কৃষ্ণা বাবার জন্য খাবার ঠাঁই করে দিল,—বসো বাবা।

কালীপদ কিছু বলবার বা বসবার পূর্ব্বেই কাদম্বিনী একটা হাতপাখা নিয়ে বসে পড়লো খাবার আসনের কাছে। কালীপদও বসলো, কৃষ্ণা দিল ভাতের থালাখানা।

—ঘি নাই রে একফোঁটা? কৃষ্ণা?—কাদম্বিনীই বললো কৃষ্ণাকে।

ঘি একটু থকলে কৃষ্ণা নিশ্চয়ই দিত তার বাপের পাতে, শুধু লেবু কেটে দিয়েছে। কাদম্বিনী তারই রস নিংড়ে দিতে দিতে ঘি'র কথাটা বললো। লজ্জার চেয়ে দুঃখ বেশী হচ্ছে কৃষ্ণার। কোনোরকমে দিন চলে, ঘি কোথায় পাবে সে! তাছাড়া ঘি তো আজকাল কোথাও পাওয়া যায় না। সরষের তেল আর ঘির কথা লোকে প্রায় ভুলে এসেছে!

—থাক্—থাক্—আমি নিচ্ছি ঠিক করে।—কালীপদ বাধা দিতে যাচ্ছে কাদুকে!

—এই যে, খাও!—কাদম্বিনী নুন ছাড়িয়ে দিল একফোঁটা কালীর ভাতে!

কৃষ্ণা অনেকটা তফাতে ছিল, রান্নাঘর থেকে আরেকটা কিছু আনবে সে, কাদম্বিনীর পাখা-চালানোটা দেখতে দেখতে যাচ্ছে, আর ভাবছে মনে মনে, হঠাৎ হাসির মা কেন এলো! আগেও দু'একদিন অবশ্য এসেছে সে এবাড়ীতে, কিন্তু আজকার আসাটায় বিশেষ বিশেষত্ব আছে। হয় তো হাসির কাছে শুনেছে তার বাবার ফেরার কথা, হয়ত দীর্ঘ দিন পরে দেখতে এসেছে তার বাল্যের সঙ্গীকে; কারণ কৃষ্ণা জানে, কাদম্বিনী এবং কালীপদ প্রায় সমবয়সী। কিম্বা হয়তো ঐ জমিটা সম্বন্ধেই কোনো কথা বলতে পাঠিয়েছে ওর ভাই, হাসির মামা! কৃষ্ণা তরকারী নিয়ে এলো।

—বিয়ে দিলেই তো মেয়ে চলে যাবে পরের বাড়ী, তারপর এই সংসার চালাবে কে বাবা কালী?

—হুঁ—কালীপদ ভাতের গ্রাসটা গিললো কাদম্বিনীর কথার উত্তরে।

—তারণ তো বিয়েই করলো না; অমন শক্ত সমর্থ সুন্দর ছেলে—কাদম্বিনী পাখাটা জোরে চালাচ্ছে।

—হুঁ!—কালীপদ আবার হুঁ দিল। কৃষ্ণা তরকারীর বাটি নামিয়ে

দিয়েছে। বাবার কাছে একটু বসবার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু সে ভাবলো, হাসির মা হয়তো বাবার সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়েরই কথার আলোচনা করছে অথবা করবে। কৃষ্ণা সলজ্জ নতমুখে চলে গেল আবার রান্নাঘরে। কিন্তু কথাগুলো তার শোনা দরকার। অন্তরের কোন্ নিভৃত স্তরে একটু যেন পিপাসা জেগে আছে কার জন্য। চেতন মনে কৃষ্ণা সে-পিপাসাকে কোনো দিন আমল দিতে চায় নি, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে বরাবর, কিন্তু আজ ওর মনের বন্যা বাগ মানছে না। কৃষ্ণা উৎকর্ণ হয়ে রইল রান্নাঘরে। তার বিয়ে সম্বন্ধে বাবার মতটা সে জানতে চায়।

—কৃষ্ণার বিয়ের কিছু ঠিক করেছে নাকি তারণ?—কাদম্বিনী প্রশ্ন করলো!

—কি জানি, করেছে হয় তো! বিয়ে এখন দেব না ওর!

—সে কি কালীপদ! মেয়ে আঠারোতে পড়লো। ওবয়সে আমরা গিন্নী হয়ে গিয়েছিলাম!

—হুঁ! ওসব সে যুগের কথা! এখনকার যুগে ওরা ছেলেমানুষ! বলে কালী ভাত চিবুতে লাগলো।

—ওম্মা! কি যে কথা তুমি বলো বাবা কালী! সেযুগে আর এযুগে বয়সের বছর কমে যাবে নাকি? নাকি এযুগের মেয়েরা বুড়োয় না!

কালী কোনো জবাব দিল না কথাটার। ভাত চিবুতে লাগলো আর কত কি ভাবতে লাগলো। কাদম্বিনী কেন এই আত্মীয়তা জানাতে এসেছে, তারই গভীর তাৎপর্য্যটা ভাবছিল হয় তো কালী। ভাবছিল, তারাপদকে হাসির সঙ্গে বিয়েতে রাজি করাবার অনুরোধ নিয়েই কাদম্বিনীর আগমন। কিন্তু কাদম্বিনীর এই ভাবে আসা এবং বসে

থাকা ও পছন্দ করছিল না মোটে। ওর মাথায় এখন নানা চিন্তা। অনর্থক একটা বাইরের লোক এসে সে চিন্তায় ব্যাঘাত দেবে, এটা যেন অসহ্য কালীপদর সাঁওতালী মনের কাছে। কিন্তু কিইবা সে করতে পারে!

—মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে তোমায়, আজ হোক আর দুমাস পরেই হোক। তার পর এই ঘর-সংসার সাম্‌লাবে কে? তারাপদর যদি বৌ, ছেলে-মেয়ে থাকতো........

—তারাপদর কথা আমি বলবো কেমন করে?—বললো কালীপদ —বিয়ে না-করে যদি সে ভাল থাকে তো আমার কি বলবার আছে! কৈরে মা কৃষ্ণা, দৈ আছে নাকি?

—আছে বাবা, যাই।—কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি এঘরে এলো বাবাকে দৈ দিতে!

ওর শরৎকালের শ্যাম-লতার মত সুপুষ্ট তনিমার পানে তাকিয়ে কাদু বললো,—মস্ত মেয়ে হয়ে উঠেছে!

কালী পছন্দ করছিল না ওর মেয়েকে কেউ মস্ত মেয়ে বলে! মেয়ে ওর এখনো খুকী আছে, খুবই ছেলেমানুষ আছে—এই শুনলেই সে খুসী হয়, তাই চাপাগলায় বললো,—হোক্‌গে!—কথাটায় রুক্ষতা ছিল, তার চেয়ে বেশী ফুটলো বিরক্তি।

—চিনি নাই! ওমা, এমন জান্‌লে আমিই নিয়ে আসতুম চিনি! গুড় দে—গুড়!

কৃষ্ণা দিচ্ছে, তবুও কাদম্বিনী বলছে কথাগুলো। কালীপদর মজাও লাগছে শুনতে! গুড় দিয়ে কৃষ্ণা চলে গেল বাবার হাত ধোবার জল ঠিক করতে। কাদম্বিনী বললো,—বিয়ে তারাপদ করবে না, আমরা জানি—কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

এতকাল তো জেলের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এলে বাবা, চিরকাল কে আর জেল খাটে? এবার ঘর-সংসার গুছিয়ে বসাই তো উচিত! বয়সও এমন বেশি কিছু হয় নি তোমার!

কি ও বলতে চায়? কি বলতে চাইছে কাদম্বিনী! আশার অতীত যে আশা,—মনের মজ্জায় যে মানসীর মণিকোঠা, সেইখানে যেন একটু ক্ষীণ দীপশিখা মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল কালীপদ! কিন্তু ও চোখ ফেরালো।

—সংসারে মেয়ে দরকার; বুঝলে কালী। লক্ষ্মীছাড়ার মতন তো আর থাকা চলবে না! তারাপদ যখন করলোই না বিয়ে, তখন তোমারই বাবু করা উচিত। মেয়ে পর হয়ে গেলে সংসারে থাকবে কে তখন! তারাপদ কিষাণ-মজুর-হরিজন নিয়ে দিন কাটায়! তুমি তো আর সে সব পারবে না!

—হুঁ—কালীপদ উঠলো খাওয়া শেষ করে; হাত ধুতে যাচ্ছে। কাদু তাড়াতাড়ি বলল,—হাসি কুড়ি পার হয়েছে; দেখতে শুনতে কাজেকম্মে বাজিয়ে নেওয়া চলে।

কালীপদ কথা না বলে হাত ধুলো গিয়ে। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন সে অনুভব করছে, কিন্তু সে আলোড়ন তার মনের অতল গভীরে কেমন যেন একটা যন্ত্রণার আবর্ত্ত সৃষ্টি করছে। হাত ধুতে বেশ কিছুক্ষণ দেরী করলো কালীপদ, তার পর এসে পান নিল কৃষ্ণার কাছ থেকে। পান খেতে ভুলে গিয়েছিল কালীপদ, আবার অভ্যাসটা ফিরে আসবে নিশ্চয়। কিন্তু কাদম্বিনী এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললো, —বিছানা করে দে কৃষ্ণা!—গরমের দিনে দুপুরে একটু ঘুমোনো ভালো বাবা কালী—পরের কথাটা কালীকে বলে আবার বললো—ঘরদোরের যা অবস্থা, দেখলে চোখে জল আসে। বর্ষা পড়লে সারা ঘরে জল

পড়বে। তারাপদর তো এসব দিকে খেয়াল নেই; মুটে-মজুর আর বস্তিতে নিয়েই দিন কাটে তার। তুমি কি পাকা বাড়ী করতে চাও কালী?

—হুঁ, ইচ্ছে তো আছে! তবে ঐ সামনের জমিটা না পেলে এপাশে বাড়ী সুবিধে হবে না!

—যেও একবার সন্ধ্যেবেলা দাদার ওখানে। দাদা কি আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে?—ছেড়েই দেবে জমিটা—যেও!

কাদম্বিনী যাচ্ছে; কালীপদও একটুখানি গড়িয়ে নেবে বিছানায়।

—বিছানা আমি পেতে দিয়েছি বাবা, যাও, শোও গে!—কৃষ্ণা বললো।

—চুলগুলো শুকিয়ে নে কৃষ্ণা—বলে কাদম্বিনী সরে এলো কৃষ্ণার কাছে। ওকে কোলের মধ্যে ধরে চুলগুলো উল্টে-পাল্টে ঝেড়ে দিতে লাগলো। কালী দেখলো একবার। কাহ্ন বলছে,—চুল তো নয়, যেন খড়ের আঁটি! বিজ্ঞাপনের ছবির চেয়ে জমাটবাঁধা।

গর্ব্বে এবং গৌরবে কালীপদর বুকখানা ভরে উঠছে। মেয়ে তার অপূর্ব্ব! অপরূপ সুন্দরী; পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি তার নিখুঁৎ;—অবদ্যাঙ্গী সে—সে অদ্বিতীয়া এই বিশ্বের মধ্যে। কবি কালীপদর কাব্যিক মনে ভাষার ঝঙ্কার গুম্‌রে মরছে—কিন্তু ও-মেয়ে তো থাকবে না! ওর বিয়ে দিতে হবে! বিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় করে দিতে হবে পরের ঘরে; বিসর্জ্জন দিতে হবে; তখন কালীপদর চোখের সামনে নেচে নেচে বেড়াবে কে?—কে ছড়াবে তার অন্তরে সুষমামাখা পরাগরেণু? কালী বিছানায় এসে শুয়ে ভাবতে লাগলো—ভাবতে লাগলো, কারণ, ভাবনাটাকে সে ছাড়তে পারছে না, কিম্বা ভাবনাটাই তাকে ছাড়ছে না। কাদম্বিনী কখন চলে গেছে সে জানতে পারে নি;

কৃষ্ণা খেয়েছে কি না, তাও জানতে পারে নি। চোখ বুজে যেন ধ্যান করছে কালীপদ! কার ধ্যান? কালীপদ চম্‌কে উঠলো—হাসির ধ্যান, অন্ততঃ হাসির মুখখানাই তার মনে জাগছিল এতক্ষণ ধরে! আশ্চর্য্য! কেন? হাসিকে তার কি দরকার? না, না, না, বিয়ে সে আর করতে পারে না। তার ডাগর মেয়ে, যে মেয়ে এই সারা গ্রামের শ্রেষ্ঠ-সমৃদ্ধি বলে পরিগণিত হতে পারে, যে মেয়ে কালীপদর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, যে মেয়ে কালীপদর প্রেমজীবনের একমাত্র স্মৃতিকণা, ·· কালীপদর প্রথমা পত্নীর একমাত্র অবদান···

— প্রথমা!—কালীপদ আবার চম্‌কে উঠলো।

—কালীপদবাবু আছেন? কালীপদবাবু?

বাইরে কে ডাকছে। কালীপদ বালিশ থেকে মাথা তুলে উৎকর্ণ হোল। কৃষ্ণা যাচ্ছে গেট খুলে দিতে, দেখতে পেল। কে তাকে ডাকছে এমন অসময়ে! শুনতে পেল, কৃষ্ণা সাগ্রহে শুধুচ্ছে—কাকা এলো না—? আপনি জানেন কাকার কোনো খবর?

—হ্যাঁ মা, তোমার কাকা কারখানাতেই রয়েছে। বাবা কোথায় তোমার?

—শুয়েছেন! আসুন ভেতরে। বাবাকে আমি ডেকে দিচ্ছি। কাকা কি আসবে না এখন?

—কি জানি! হয়তো ব্যস্ত আছে!

বলতে বলতে কারখানার ম্যানেজার এগিয়ে এলো ঘরের দিকে। কালীও এর মধ্যে উঠে বসেছে। ম্যানেজার নন্দবাবু এসে ঘরে ঢুকে নমস্কার জানিয়ে বললো,—শুনলাম, বহুদিন পরে আপনি ফিরে

এসেছেন। ওঃ! কতদিন হোল গিয়েছিলেন আপনি,—ভুলেই গিয়েছিলেন হয়তো!

—কালীপদ হেসেই প্রতিনমস্কার করলো—বসুন, বসুন ম্যানেজার বাবু—হ্যাঁ—না, ভুলে যাওয়া যায় না, তবে আমি যে আবার ফিরবো, তা মনে করিনি।

কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল বাবার সঙ্গে ম্যানেজারের কি কথা হয়, শুনবার জন্য। ম্যানেজার বহুকাল এখানে আছে, এই গ্রামের প্রায় সব লোকই তাকে চেনে এবং সে চেনে। কৃষ্ণাকে ম্যানেজার দেখেছে অনেকবার, তবে ইদানিং বছরখানেক এদিকে আসে নি! খোলা চুল মেলে কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল দরজার চৌকাঠ ধরে। মুখখানা মলিন দেখাচ্ছে—চিন্তায় যেন শুকিয়ে গেছে মেয়েটা। কিন্তু কি সুন্দর! ম্যানেজার নিত্যবাবু বার বার তাকিয়ে দেখে হেসে বললো—তোমার কাকাকে আমরা অভিনন্দন দেব মা—তোমার কাকা একটা মানুষের মত মানুষ। কর্ত্তারা তার মর্য্যাদা বুঝেছে এতো দিনে!

কৃষ্ণা চুপ করেই রইল, কিন্তু মুখখানা ওর প্রসন্ন হয়ে উঠছে!

—চমৎকার মেয়ে!—বলে উঠলো ম্যানেজার। কৃষ্ণা সলজ্জে সরে গেল একটুখানি।

—হ্যাঁ, তারপর খবর কি ম্যানেজার বাবু?—কালীপদ প্রশ্ন করলো।

—খবর খুবই ভালো। তারাপদ বাবু আমাদের সহকর্ম্মী, আমরা জানতামই না যে উনি আমাদের জন্য এতখানি করছেন। কারখানার অনেক ভাল ব্যবস্থা উনি করিয়ে দিলেন আমাদের জন্য, তার সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি, বোনাস, গ্রাচুইটি, মানে দাবীর অধিকাংশই পূরণ হয়েছে। কিন্তু উনি নিজের জন্য প্রায় কিছুই নিলেন না। তাই আমরা, শ্রমিকরা সকলে ঠিক করেছি, ওঁকে আগামী কাল আমরা অভিনন্দন দেব।

জন-সেবার জন্য কিছু টাকাও অবশ্য ওঁর হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছি আমরা ম্যানেজার মিষ্টি হাসলো।

—বেশ তো! খুব আনন্দের কথা। তা' আমায় কি করতে হবে?

—আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে আমাদের সেই সভায়।

—আমি!—আমার এমন কি যোগ্যতা আছে!—বললো কালীপদ বিস্ময়ের আতিশয্যে,বিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখিয়ে, কিন্তু সে জানে, যোগ্যতা তার যথেষ্ট আছে। এমন কি, এখানে যোগ্যতর কেউই নেই আর।

—আপনার যোগ্যতা নেই তো আছে কার?—বলে ম্যানেজার সস্মিত মুখে তাকালো একবার, তারপর বললো—আপনি দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক, কারাবরণকারী বীর, স্বাধীনতার হোমাগ্নির হোতা—আপনিই তো যোগ্যতম! শা নাওয়াজ, ধীলন, কর্ণেল চ্যাটার্জি, লক্ষ্মী; প্রতিমাদেবী এঁদের নামে দেশের মানুষ আজ কতখানি শ্রদ্ধাশীল, দেখছেন তো? এখানে লাখে লাখে ওঁদের আলোকচিত্র বিক্রয় হয়—বাড়ীতে বাড়ীতে ধূপ দীপ জেলে আজ পুজো হয় সেই চিত্রের। দেশের মানুষ আজ জেগেছে কালীবাবু, আপনার থেকে ভালো সভাপতি এখানে আর কাউকে পাওয়া যাবে না।

কালীপদ চুপ করেই রইল কিছুক্ষণ; আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে ওর চোখদুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে। সিগারেট বের করে ম্যানেজার এগিয়ে দিল ওর দিকে।

—কিন্তু আমারই ভাইকে অভিনন্দন দেওয়া হবে—আমাকে সভাপতি করা কি উচিত হবে?

—নিশ্চয় উচিত হবে। আপনার পূর্ব্বজীবনের পরিচয় দেব আমি নিজে। আজ আপনি আমাদের মধ্যে এসেছেন, এই গৌরবকেও আমাদের বরণ করা উচিত।

কালীপদ সিগারেট ধরালো, বহুদিন পরে সিগারেট ধরালো কালীপদ। এতকাল ও বিড়ি খেয়ে এসেছে, স্বদেশী বিড়ি—দেশের হাজার মানুষের হাতের শ্রমের মর্য্যাদায় যে বিড়ি আভিজাত হয়ে উঠেছিল উনিশশো আটাশ-ত্রিশ সালে। যে বিড়ির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেশসেবায় ব্যয় করবে বলে বহু ব্যবসায়ী বাড়ী বানিয়েছে, গাড়ী কিনেছে। স্বদেশী সিগারেট বের করে যে সময় দুএকটা কোম্পানী দুপয়সা কামিয়ে নিয়েছে দেশের লোকের স্বাস্থ্য-সম্পদ অপহরণ করে—কালীপদর মনে পড়লো, সিগারেট খাওয়া সেই সময় ছেড়েছিল সে। কালীপদ দেশের গৌরব—হ্যাঁ, অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে সে দেশের জন্য।

—তা হলে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি—কি বলেন ?

—তা করুন, তবে—ওরে কৃষ্ণা, তোর জ্যেঠামহাশয়কে একটু সরবৎ খাইয়ে দে মা।

কালীপদ কন্যার উদ্দেশে কথা বলে খানিকটা সময় ব্যয় করলো।

—থাক, থাক ! না মা কৃষ্ণা, কিছু এখন খাব না। আর একদিন এসে খাবো তোমার হাতে—বলে ম্যানেজার বাধা দিলো। কালীপদ বললো—এবার তাহলে পান খান একটা ;—আচ্ছা, কাল কটার সময় সভা আপনাদের ?

—সাড়ে পাঁচটা—না কি বলেন ? আপনার অসুবিধা হবে ?

—কিছু না! আমি ঠিক সময়েই যাব !

ম্যানেজার কৃষ্ণার হাত থেকে পান নিয়ে নমস্কার জানালো কালিপদকে। কৃষ্ণার পানে আর একবার তাকালো সস্নেহ দৃষ্টিতে। বললো,—আসি মা কৃষ্ণা !—আস্তে বেরিয়ে গেল ম্যানেজার। কৃষ্ণা গেল রান্নাঘরে।

কালীপদ অগাধ চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে। কাল তাকে সভাপতিত্ব করতে হবে—বক্তৃতা দিতে হবে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা, শুনে সমবেত মানুষরা রোমাঞ্চিত হবে—উদ্দীপিত হবে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে বারম্বার। এ রকম বক্তৃতা দিতে পারতো কালীপদ একদিন। উষ্ণ রক্তধারার মত সতেজ, অগ্নির মত লোহিতাভ—ঝঞ্ঝার মত অপ্রতিরোধ্য বাণী তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হোত। কিন্তু বহুদিন কালীপদ ওসব করে নাই। অনভ্যাসে শক্তিটা অপব্যয়িত হয়ে যায় নি তো! কালীপদ চিন্তিত হয়ে উঠলো। তারপর আর একটা চিন্তাও ওর মাথায় এল—আজকালকার সভাসমিতির আচার অনুষ্ঠানগুলো সে ঠিকমত জানে না। সভাপতিত্ব করতে গিয়ে যদি ভুল করে বসে কিছু! ও কাজ করতে পারবে না বলে জবাব দিলেই ভাল করতো কালীপদ। কিন্তু জবাব সে দেবে কেন? বর্ত্তমান যুগে বড় হতে হলে চাই সভাসমিতি, বক্তৃতা, পাবলিসিটি—প্রচার-কার্য্য, একথা জানে কালীপদ, ভালভাবেই জানে। জানে সে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হতে হতে কেমন করে গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড থেকে জেলা বোর্ডের সর্ব্বোচ্চ আসনে উঠে যেতে হয়,—কেমন করে বক্তৃতার তুবড়ী-বাজীতে মানুষের মনে আঁধি লাগিয়ে পপুলারিটির প্রাসাদে উঠতে হয়—দেশের নিরীহ আর নির্ব্বোধ জনসাধারণের স্নেহ-দয়া-মায়ার রস নিংড়োনো টাকার তোড়ায় বড় বড় মিলের মালিকানা কিনতে হয়—কেমন করে জনলোকের উর্দ্ধে থেকেও জননেতা হতে হয়, এসব ভালো করেই জানে কালীপদ। বিদেশী সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কেমন করে পরের টাকায় প্রাসাদশীর্ষে পদচারণা করা যায়—গালভরা 'বাণী' দিয়ে খবরের কাগজের হেডলাইনকে ভর্ত্তি করা যায়—স্বাধীনতার পথকে সুগম করতে গিয়ে কি ভাবে মানুষের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগিয়ে মজা দেখা যায়—এসব ওর অজ্ঞাত নয়; কিন্তু দীর্ঘদিনের অপরিচয়ের

জন্ত ওর যৎসামান্ত চিন্তা হোল। ও ঠিকমত জানে না, স্বাধীনতা-হীনতা দেশের লোকগুলোকে কতখানি গ্লানি-যুক্ত অথবা গ্লানি-মুক্ত করেছে। কিন্তু জানে না বলে নিরুৎসাহ হবার মত মানুষ কালীপদ নয়—ওর কাবুলী দেহের ভেতর সাঁওতালের সবল মন সজাগ হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে। জেনে নিতে কতক্ষণ! কালীপদ উঠে বসলো—কৃষ্ণাকে ডাক দিয়ে শুধুলো,—এ গাঁয়ে খবরের কাগজ কারো বাড়ীতে আসে রে মা কৃষ্ণা?

—হ্যাঁ বাবা, কাকার নামেই কাগজ আসে। আজকারটা এসেছে; এনে দিই।

কাগজখানা এনে দিল কৃষ্ণা। কালী তাড়াতাড়ি সভাসমিতির কলম্‌টায় চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল—আসানসোলের হীরাপুর ক্লাবে একটা সাহিত্য বাসর আজই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে। আসানসোল এমন কিছু দূর নয়—সন্ধ্যার আগেই পৌছানো যাবে। কালী আধঘণ্টার মধ্যে কাপড়জামা পরে বের হয়ে পড়লো সভার উদ্দেশে! কৃষ্ণাকে বলে গেল,—ফিরতে রাত হবে। সারারাস্তা ভাবছিল সে, ঐ সভা এবং সভাপতির ব্যাপার থেকে সে আগামীকালের জন্য সবকিছু শিখে নিতে পারবে। তাকে বক্তৃতা দিতে হবে, বড় হতে হবে, বিশিষ্ট হতে হবে হাজার জনের মধ্যে। হাতের কাছে আজ এসেছে সেই সুযোগ, —কালীপদ তাকে হেলায় হারাবে না।

কৃষ্ণার কথাও ভুলে গেছে কালীপদ, হাসির সেই হাসিটি, যে-হাসি কালীপদর অস্তোন্মুখে যৌবনকে উদয়রাগে রাঙিয়েছিল আজই সকালে, তারও কথা ওর মনে নাই এখন;—উত্তেজিত কালীপদ শুধু ভাবছে—আগামী কালের সভা, লক্ষ লোক, মোটা মালা, আর প্রবল করতালির সম্ভাবনার কথা।

হীরাপুর ক্লাবের সভ্যবৃন্দ একটি সভার আয়োজন করেছেন।

সাহিত্যের সভা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে সাহিত্যের মূল্য উপলব্ধি করবার মত শিক্ষা তো দেওয়া হয় না—দলাদলির শিক্ষাটাই দেওয়া হয়, —বাংলাভাষাকে কি করে বিদেশী ভাষা বানানো যায়, কেমন করে রাষ্ট্রভাষার ন্যায্য দাবী থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায়, কোন্ প্যাঁচে ফেলে বাংলার শক্তিশালী সাহিত্যিকগুলোকে প্রপাগ্যাণ্ডা আর বিজ্ঞাপনের প্যারায় আট্‌কে রাখা যায়, এই সবই শিক্ষা করে এদেশের লোক বিদেশী বণিকের কাছ থেকে। তারা প্রতিভাকে নিজের কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করে; তাদের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের হাজার হাজার মানুষ আজো বুঝলো না—'সাহিত্য জীবনের সত্য অভিব্যক্তি, সাহিত্যই জীবনের জ্বলন্ত শোণিত, অন্তরের স্পন্দন।' হীরাপুরের সাহিত্য-সভায় শ্রোতার সংখ্যা তাই নগণ্য। শ'খানেক শিক্ষিত লোক —তাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো শুধু খাতিরে পড়ে বসেছেন এসে চেয়ারে। কিন্তু বক্তৃতা চলছে—অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা, স্নিগ্ধগম্ভীর মুরজ-ধ্বনিবৎ বক্তৃতা, সাগরের মত ক্ষুব্ধ আবার আকাশের মত প্রশান্ত বক্তৃতা—কালীপদ শুনতে লাগল।

"জীবনের জয়গান রচনাকারী আমি সাহিত্যিক। মানুষের সঙ্গেই শুধু আমি চলবো না—আমি এগিয়ে যাব বিজয়পতাকা ধরে, বর্তিকার মত পথ দেখিয়ে—তরবারির মত তীক্ষ্ণ আঘাতে বাধাবিঘ্ন বিচূর্ণিত করে। ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর লেখনী আমার বজ্রবৎ বিদীর্ণ করে দেবে অতীতের ভুলভ্রান্তি; কারো মুখের পানে চাইবে না—কারো স্তাবকতায় গুঞ্জিত হবে না—কারো ভুলকে ক্ষমার চোখে দেখবে না। মানুষের রাজ্যে মানুষ এসেছে, অতিমানুষ এসেছে, আবার অমানুষ এসেছে, এসেছে—ত্যাগে-পুণ্যে প্রশান্ত মানুষ, লোভেপাপে কদর্য্য মানুষ, কূটনীতিকে চাণক্য, অন্তরের ঐশ্বর্য্যের অশোক, কাপুরুষতায় কুৎসিত,

বীরত্বের গরিমায় উজ্জ্বল—দেশদ্রোহিতায় বীভৎস, দেশপ্রেমে নীলকণ্ঠ—মানুষ তারাও। কিন্তু—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ভেবে যে সাহিত্যিকের লেখনী স্তবগুঞ্জনে তোষণপরায়ণ, আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি না। আমি সত্যের পূজারী সাহিত্যিক, সুন্দরের ধ্যানরত সাহিত্যিক, শিবের আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী সাহিত্যিক, যে সাহিত্য শিবময়—ভুলকে যে শূলের আঘাতে চূর্ণ করবে, বিষকে যে অমৃত করবে—সকল ঐশ্বর্য্যকে অধিগত করে যে সর্ব্বত্যাগী হবে—যার লেখনী জাতীয় জীবনকে, মানুষের মনকে, মানবচেতনাকে ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর লোকে উন্নীত করবে—সেই আমার নমস্য।"

বক্তার বলার ভঙ্গি অসাধারণ; কালীপদ সেই ভঙ্গীটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো—বক্তা আবার বলে চলেছেন,—

"আমার নমস্য সেই সাহিত্যিক, মানুষের মাঝে যে মানুষকেই প্রতিষ্ঠিত করবে—দেবতাকে নয়। তুচ্ছ গৃহকোণের স্তিমিত দীপালোক থেকে যে প্রতিভার আগুনে বিপর্য্যস্ত করে দিতে পারে বিশ্বের নৈতিক মানদণ্ডের মেকী শান্তিবাদ—জাগতিক পরিস্থিতির শক্তিমত্ত পদক্ষেপ, জাতীয় জীবনের অসাড় দৌর্ব্বল্য;—ক্ষমাহীন, দয়াহীন, তীক্ষ্ণতায় যে বিশ্লেষণ করে দিতে পারে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক জীবনের ভুলভ্রান্তি—সেই সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিকই আমার নমস্য। আসুন সেই প্রতিভাবান ঋষি আমাদের মধ্যে—অকারণ উচ্ছ্বাসে যাঁর লেখনী অপব্যয়িত হবে না;—অসাধুজনের প্রচারকার্য্যে—অপখ্যাতির ভয়ে যার লেখনী সত্যের প্রকাশে কুণ্ঠিত হবে না—জীবনব্রতের সামগানে যার লেখনী সূর্য্যের মতই ভাস্বর থাকবে। আজ জাতির এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে আমরা চাই বজ্রগর্ভ সেই সাহিত্যিককে, যিনি রচনা করবেন মাতৃভূমির অপমৃত্যুর সত্য ইতিহাস, যিনি জীয়নকাঠি ছোঁয়াবেন লক্ষ লক্ষ কঙ্কালের

সমাহিতপ্রায় স্তূপে—যিনি জাগরণ গানে সঞ্জীবিত করে তুলবেন জাতিকে—সন্ত্রস্ত করে তুলবেন শত্রুকে—সম্ভ্রমিত করে তুলবেন সমগ্র জগৎকে! সেই অনাগতের আগমনী গান আমার শিরায় শিরায় বাজছে—রক্তের জ্বালায়, প্রাণের পিপাসায়, মর্ম্মের যন্ত্রণায় তার পদধ্বনি জেগেছে! বন্ধুগণ—আপনারা কি এখনো সেই পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না?"

বক্তার চোখদুটি জলে ভরে উঠেছে উত্তেজনায়—কাঁপছিলো সে। কালী পাশের লোকটিকে শুধুলো—কে এই লোকটি—কি নাম ওঁর?

—লোকাধীশ! উনিই "শিকল-অলঙ্কার" বইখানার লেখক। সাতদিনে যে বই হাজার কপি বিক্রী হয়েছে, একমাসে তিনটে সংস্করণ হোল।—উত্তর দিল লোকটি সোচ্ছ্বাসে।

কালীপদ বিস্ময়ে বাক্যহারা। সত্যি নাকি? বাংলা সাহিত্য এতখানি উন্নত আর পাঠক এত বেশি বেড়েছে বাংলায়! আঠারো বছর আগে তো কালীপদ দেখেছিল, একখানা বই পাঁচশো কপি ছাপিয়ে দু' বছর পরে প্রকাশককে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যেতো—'বই কাটছে, তবে উইপোকায়।' সেই বাংলার এতখানি উন্নতি! তবে কি কালী সাহিত্যিকই হয়ে যাবে নাকি—নাম করা একজন সাহিত্যিক! হতে সে পারে। সে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, নিশ্চয় হতে পারে; সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সাধারণ জীবনে সে অনেক কিছুই দান করতে পারে! —কালীপদর শিরায় রক্তটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে; নিজেকে সম্বরণ করতে সে নিজের উদ্দেশেই বললে—"ধীরে কালীপদ, ধীরে"। কিন্তু ধীরতা ওর স্বভাবের বিরুদ্ধের বিষয়। সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল বক্তার কাছে। নমস্কার করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো তাঁর। আলাপ করলো বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। সগর্ব্বে জানালো সেও একজন দেশসেবক, সাহিত্যিক এবং স্বাধীনতাকামী সন্তান। বক্তা লোকা-

যীশের চোখদুটি আনন্দে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো একজন গুণী মানুষ পেয়ে। নিজের স্থায়ী ঠিকানাটা ওকে দিয়ে তিনি চলে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—

"জীবন এবং মৃত্যু এই দুটি প্রান্তবিন্দুর মাঝে যে কালের সেতুটুকু, কালীপদ যেন তাকে কালাতীত করে রেখে যেতে পারে দেশের বুকে—"

ওঁর শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, সত্যাদর্শ সবই জ্বলজ্বলে হয়ে রইল কিছুক্ষণ কালীর মনে। ফিরতি পথে কালীপদ ভাবতে লাগলো, যে কথাগুলো ওর বক্তৃতায় শুনেছে, সেগুলো সত্যের অনুভূতিতে অভিমন্ত্রিত, জাগ্রত? না কি, চণ্ডীমণ্ডপের পূজারীঠাকুরের চালকলা আদায়ের ফন্দীর মত পুঁথিপড়া—যে পুঁথি লালকালীতে লেখা নয়—ছাপা;—অর্থহীন উচ্চারণে অশুদ্ধ,—কিও?

কালীপদর বি, এ, পাশ ইংরাজিনবিশ মন সন্দেহে দুলছে।

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে কারখানার প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। কালী খদ্দরের উত্তরীয়টার আঁচলা লুটিয়ে এসে পৌছালো—সবাই সমস্বরে অভ্যর্থনা করলো ওকে। ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন। প্রকাণ্ড দুখানা গোড়ে মালা রাখা হয়েছে টেবিলের উপর। ওর একটা নিশ্চয় কালীপদর জন্য, অপরটা তারাপদর জন্য—কালী অনুমান করলো। কিন্তু কোথায় তারাপদ? এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে কোনোদিকে সে তারাপদকে দেখতে পেল না। অথচ সে জানে, তারাপদর জন্যই আজকার উৎসব। সময় হয়ে গেছে শুভ আরম্ভের; কালী যথাসময়েই এসে পৌছেছে, কিন্তু ম্যানেজার বাবু বললেন—তারাপদ এখনো আসে নি।

কিছুদূরেই মালিকবাবুদের থাকবার দোতালা বাড়ীটা। ছোট একটা জানালার ফাঁক দিয়ে কুণ্ডলিকৃত ধূম বের হচ্ছে—মিঃ চ্যাটার্জির সিগারেটের ধোঁয়া। উনি ঐখান থেকেই দেখছেন সভাটাকে। সাফল্যের গর্ব্বে চোখদুটো ওঁর জলজ্বল যেন! তারাপদ আসছে, সঙ্গে অশনি, দেখতে পেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। যে ফাঁদ উনি পেতেছেন, তাতে তারাপদকে পড়তেই হবে। ওকে খ্যাতির চরকী-বাজিতে ঘুরিয়ে নাগরদোলায় তুলিয়ে দেবেন মিঃ চ্যাটার্জি—তারপর হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে নাগরদোলা থামিয়ে দেওয়ার ধাক্কায় তারাপদ ছিটকে গিয়ে পড়বে অতল কোন্ অন্ধকারে—কেউ খবরও নেবে না। এ দেশকে উনি ভাল করেই জানেন। একনিষ্ঠ দেশসেবক কেমন করে উন্নতির চরমে উঠে, মানুষের শ্রদ্ধাকে ভাঙিয়ে বিদেশীর এজেন্ট হয়; কেমন করে স্ব-স্বার্থ এবং স্বখ্যাতিটুকু বজায় রাখবার জন্য জাতির পরম মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড জাগরণকে স্তোক্ আর কু-পরামর্শের ফক্কি বাজিতে স্তব্ধ করে রাখে—চতুর বিদেশী বণিক কেমন করে তাদের প্রতিষ্ঠার অটুটতাকে আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে—উনি জানেন! উনি জানেন—হুজুগের এই দেশটায় সর্ব্বস্বত্যাগী সহিদদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ শ্রদ্ধার মিছিলকে যাত্রার আসরে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাভাজনের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায়। একটা হুজুগের উপর অন্য একটা হুজুগ এনে যোগালেই প্রথম হুজুগটা চাপা দেওয়া যায়—এসব তিনি ভালই জানেন। দেশকে এরা কেউই ভালোবাসে না—দেশের নিষ্ঠাবান নেতাকেও ভালবাসে না। ওরা চায় হুজুগ—চায় নেতৃত্ব, চায় নাম-যশ-অর্থ। প্রত্যেকেই দাঁড়াতে চায় পুরোভাগে; তাই এত দল, এত বিরোধ, এত বিদ্বেষ। বুদ্ধির খেলায় ওরা প্রদেশে-প্রদেশে, দেশে-দেশে, জেলায়-জেলায় হানাহানি করে, শক্তির খেলায় ওরা খেলার মাঠে মাথা ফাটাফাটি করে মরে—শান্তির

খেলায় ওরা সকলেই নির্ব্বিকল্প সাধু বনতে চায়—কে কত বেশি নির্ব্বিকার তারই প্রতিযোগিতা চালায়! নেতাকে ভুলতেও ওদের দেরী হয় না—কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর কথা ওরা ভুলে গেছে। যে রাসবিহারীর জন্য ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিল, যে রাসবিহারী এই সেদিনও নেতাজী সুভাষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বিদেশের মাটিতে দেহরক্ষা করলেন, সেই একনিষ্ঠ সেবকের কথা ওরা কদাচিত করে—ওরা তখন কুইট ইণ্ডিয়া নিয়ে মেতেছিল, এখন আবার গণপরিষদ নির্ব্বাচন নিয়ে মেতেছে। মাঝে কয়েকদিন মন্ত্রিমিশন নিয়ে মাতামাতি করলো! মিঃ চ্যাটার্জি হাসলেন—এটা আবার একটা দেশ! এরা নেবে স্বাধীনতা!

তারাপদ ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, ম্যানেজার তাকে বসিয়ে দিলো সাদরে—তারপর যথারীতি সভাপতি বরণ, মাল্যদান এবং সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রচুর করতালির মধ্যে আসন গ্রহণ করলো। কালীপদ প্রশান্ত হাস্যমুখে সভার কাজ চালাতে লাগল।

বক্তৃতাও দিল কালীপদ—বেশ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা। সমবেত জনতা বারম্বার করতালিধ্বনি করলো—উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো। অতঃপর তারাপদকে তার দেশসেবা, সমাজসেবা ইত্যাদির পুরস্কারস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকার তোড়াটা দিতে হবে—কালীপদ বলতে লাগলো—

—"ভাইএর গৌরবে আমি আজ সত্যি গৌরব অনুভব করছি ;—আজ আপনাদের অন্তরে সে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে তার নিস্বার্থ কর্ম্মের দ্বারা, তার ত্যাগের দ্বারা, তার দুঃখ বরণের দ্বারা। আপনাদের দেওয়া এই অভিনন্দন, এই সম্মানের পুরস্কার সে মাথায় করে গ্রহণ করুক—দেশের, জাতির জয়যাত্রার পথে আপনাদের আশীর্ব্বাদ সম্বল

করে সে অকম্পিত পদে অগ্রসর হোক—(উচ্চ করতালিতে উচ্চকিত হয়ে উঠলো সভামণ্ডপ)।

শিল্কের থলিতে সুন্দরছাঁদে বাঁধা টাকাগুলি কালীপদ তুলে নিল টেবিল থেকে। তারাপদ এবার এগিয়ে এসে নেবে এবং প্রত্যুত্তরে তার বাণী দেবে ; শুনবার জন্য লোকগুলো উন্মুখ হয়ে উঠেছে—কিন্তু তারাপদ এগিয়ে আসছে না। মৌন নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। কালীপদ আবার বলল,—"আপনাদের দেওয়া এই অর্থ নিয়ে সে দেশের কাজে, দশের কাজে ব্যয় করুক। সে আপনাদের বিশ্বাসভাজন নেতা। আপনাদের মধ্যে থেকে এবং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে আরো প্রচুর অর্থ আসবে তার সৎকর্ম্মের জন্য ..."

—এগিয়ে আসুন তারাপদবাবু....ম্যানেজার বললো। কিন্তু তারাপদ এগিয়ে এলো না—যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখান থেকেই বলতে লাগলো—মাননীয় সভাপতিমহাশয় এবং সমবেত ভাইবন্ধুগণ, আপনাদের কি আমি করেছি, কতটুকু করতে পেরেছি এবং তার জন্য পুরস্কার পাবার যোগ্যতা আমার আছে কি না, আমার জানা নেই। তবু আমি আপনাদের এই শুভাশিস্ এবং স্নেহভালবাসা মাথায় তুলে নিলাম— ; কিন্তু হে আমার দরিদ্র শ্রমজীবিগণ, আমার জন্য এই টাকার তোড়ার প্রয়োজন কি? আপনাদের কাছ থেকে টাকা তুলে আপনাদের দারিদ্র্যকে আরো বাড়িয়ে দেবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। আমার উপর আপনাদের স্নেহভালবাসাকে আমি স্বার্থের ব্যবসায়ে লাগাতে চাই না—আপনারা ক্ষমা করবেন। কয়েক বছর থেকে দেখছি, বড় বড় নামকরা নেতাদের ডেকে টাকার তোড়া দেওয়া একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে—অটোগ্রাফ্ খাতায় সই দিয়ে টাকা আদায় করা আর— আরো নানান্ উপায়ে টাকা আদায় হয়—জনসেবার নামে, স্মৃতিরক্ষার

নামে—সমাজের ভূত এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নামেই হয়—বড় বড় নেতারা সেটাকা—সেই লক্ষ লক্ষ টাকা নিরন্ন দেশবাসীর অন্নের অংশ থেকেই গ্রহণ করেন—তারপর সে টাকায় কি হয়, কদাচিৎ কেউ জানতে পারে। কৈফিয়ৎও হয়তো পাওয়া যায় একটা খবরের কাগজের মারফৎ কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কোথাও হয়তো সত্যই কিছু কাজ হয় সে টাকায় কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র নগণ্য! অথচ টাকা দেশের লোক দেয়, অকৃপণ হস্তেই দেয়। জাতির এই ত্যাগ-মনোবৃত্তিকে নিজের কাজে লাগাবার অপচেষ্টা হতে আমাকে আপনারা মুক্তি দিন। আর—(তারাপদ আধমিনিট থামলো)—আর আমি জানি, এ টাকা আপানাদের কাছ থেকে আসেনি, এসেছে আমাদের মনিবদের কাছ থেকে, যাঁরা এই দীর্ঘকাল আমাদের অন্ন মেরে মোটরগাড়ী চড়ে এলেন, মালিকানা করে এলেন। মুক্তি-সংগ্রামের কোনো খবর না-রেখেও যাঁরা মোটরের মুখে জাতীয় পতাকা তুলে কংগ্রেস খাতায় নাম লেখাতে ছুটছেন আজ টাকার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে! কিন্তু তাঁরা চিরদিনের ব্যবসায়ী বণিক-মনোবৃত্তির মানুষ, ঐ টাকা দেওয়া তাদের দাদন দেওয়ার সামিল। ঐ টাকা জাতীয় মনোভাবের দৌর্ব্বল্যে ইন্‌ভেষ্ট করে অর্থাৎ দাদন দিয়ে ওঁরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করতে চান—নেতাদের মনোনয়নের প্রশংসাপত্র কপালে এঁটে ওঁরা 'সোনা-কপালে' হতে চান—আর যে-সব নিষ্ঠাবান নেতা স্বদেশের মুক্তির জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করেছেন—টাকার মায়াচক্রে তাঁদের মাহাত্ম্যকে হত্যা করতে চান—তাদিকে প্রতারক প্রমাণ করতে চান!

ভাই সব, আমাকে পাঁচ হাজার টাকার তোড়া দিয়ে লক্ষ টাকার প্রলোভনে ফেলবার এই অপচেষ্টা আপনারা কেন সমর্থন করছেন? এ টাকা নেওয়া আমার পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। তাই আমি

প্রস্তাব করি—প্রার্থনা করি, আজ যিনি আমাদের সভাপতি, তিনি এক দিন দেশের মুক্তিযজ্ঞের একনিষ্ঠ হোতা ছিলেন—দেশহিতের জন্য ঐ টাকা যদি সত্যি কেউ ব্যয় করতে চান তাহলে উনিই এখানে যোগ্য পাত্র—টাকাটা ওঁর হাতেই দেওয়া হোক।”

অদ্ভুত একটা গুঞ্জন উঠলো সভামণ্ডপে! কালীপদ বিস্ময়ে নীরব হয়ে তাকিয়ে আছে। ম্যানেজার ঠোঁটমুখ চাটছে জিভ দিয়ে, আর ওদিকে বাংলোবাড়ীর জানালায় কুণ্ডলিত ধোঁয়ার আড়ালে চাটার্জ্জির চোখ জ্বলছে যেন।

--ভাই সব—তারাপদ বলে চলেছে—ঐ টাকায় আজ যে তহবিল খোলা হোল, তার কোষাধ্যক্ষ থাকুন আমাদের সভাপতি মহাশয়। ঐ টাকা জনসেবায় ব্যয় করা হবে ; উপস্থিত নদীর ধারের বাঁধ বাঁধানো হোক—আমাদের দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ঐ তহবিলে আমিই সর্ব্বপ্রথম দিচ্ছি দশটি টাকা......আপনারাও যথাসাধ্য দেবেন—কিন্তু দেখবেন, বাঁধ যেন ঠিক বাঁধানো হয়—আর আমি আপনাদের স্নেহ-শুভেচ্ছা ভাল-বাসার নিদর্শন স্বরূপ প্রার্থনা করছি যে আপনারা আমার কথা সমর্থন করুন!’

সামান্য একটু বিশৃঙ্খলা, গোলমাল, তারপর ঝনঝন টাকা পড়তে লাগলো টেবিলে—নোট, টাকা, আধুলি, পয়সা—স্তূপাকার হয়ে গেল টেবিলটায়। কালীপদ কি করবে ঠিক করতে পারছে না। ম্যানেজার হতভম্ব হয়ে গেছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জি এসে হাত তুলে দাঁড়ালেন—বললেন, —সভাপতির অনুমতি না নিয়ে সভায় প্রবেশ করা এবং কথা বলার জন্য মার্জনা চাইছি প্রথমেই। আপনারা আমায় কয়টি কথা বলতে অনুমতি দিন।

কালীপদ অনুমতি দিল। ও চ্যাটার্জিকে চেনে না, তবে অনুমান করতে পারছে। মিঃ চ্যাটার্জি বললেন :

—তারাপদ বাবু ধনিক-বিদ্বেষী। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরীতি হয় —কিন্তু তিনি কর্ম্মী এবং নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, এতে আমার সন্দেহ নাই। তাই আমি তাঁকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলাম, শুধু টাকা দিয়ে নয়, সম্মান দিয়েও। টাকাটা এখানে গৌণ, সম্মানের অনুপূরক! আমি জানি, পৃথিবী থেকে ধনতন্ত্রবাদ হয়তো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু সেদিনের দেরি আছে ; ধনিকেরা বড় সহজে সেটা হাতে দেবে না। তাই আমি তারাপদকে অনুরোধ করেছিলাম যে অশান্তির সৃষ্টি না করে একটা আপোষ রফা করা হোক। রফা হয়েছে এবং ওরই চেষ্টায় হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য্য। এর জন্য প্রাপ্য সম্মান ওকে দেওয়া উচিত. তাই এ টাকা ওকে দেওয়া হচ্ছে, ওর বিপন্ন দেশবাসীকে বন্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীর বাঁধ বাঁধবার কাজে লাগাতে! আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। উনি শক্তিমান, খ্যাতিমান এবং যোগ্য ব্যক্তি—উনি ভার নিলেই আমি খুশী হই।

—অনেক ধন্যবাদ, মিঃ চ্যাটার্জি, কিন্তু আমি সত্যিই তার যোগ্য নই। শক্তি, খ্যাতি এবং যোগ্যতার অহংকারকে আমি কখনো বাড়তে দিই নি—এই আমার অভ্যাস। আপনার উদ্দেশ্য যদি সত্যই নদীর বাঁধ বাঁধিয়ে দেশের জনগণের কল্যাণ করা হয়, তাহলে টাকাটা যোগ্যপাত্রের হাতেই দিন—আমি একান্ত অক্ষম।

জলের মাছ জালে পড়ছে না ; মিঃ চ্যাটার্জি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছেন। কিন্তু ম্যানেজার তাঁর কানে কানে বললো—কালীবাবু তো ওঁরই দাদা—উনিই নিন না টাকাটা, তাহলেই তারাপদর নেওয়া হবে ; বুঝলেন ?

—আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করাবার কোনো কারণই আমি রাখবো না—বেশ, কালীবাবুই আপনার হয়ে ঐ জনমঙ্গলের কাজ আরম্ভ করুন।

—আমার হয়ে নয়—দেশের হয়ে, দশের হয়ে—তারাপদ বললো।

—ভালো! ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে এবং গভর্ণমেণ্ট থেকে যাতে ভাল রকম গ্রাণ্ট পাওয়া যায় তাও আমি দেখবো—এবং বড় বড় লোকের কাছ থেকেও টাকা আদায় করে দেব—কিন্তু আপনিও এর মধ্যে যোগ দিন তারাবাবু....।

মালিকের ব্যঙ্গ উত্তরে তারাপদ হাসলো একটু—বললো তারপর, —আমাকে যোগ দিতে বললেই আপনার উদ্দেশ্যে সন্দেহ জাগে মিঃ চ্যাটার্জি। তার চেয়ে আমার যোগ দেবার ইচ্ছা নেই—মাফ্ করবেন। ও কাজটা ঠিকই দেশ একটা ভালো কাজ—আমিই একদিন ঐটা করবার জন্য মেতেছিলাম পুরস্কার দিয়েই, কিন্তু আজ আমার কর্ম্মক্ষেত্র অন্যত্র—আমাকে মাফ করতে হবে পুরস্কার

সভাপতি কালীপদ এতক্ষণে কথা বললো, বেশ ধীর গম্ভীর গলায় বলল,—এই ফাণ্ডের টাকা দেশের একটা মঙ্গলজনক কাজে ব্যয়িত হবে, সেটা ঠিকমত হচ্ছে কি না, তাই আপনাদের দেখা দরকার। আপনারাই বলুন—কার হাতে এটাকা দেওয়া যায়?

—আমাদের সভাপতি মশাই-ই আমাদের বিশ্বাসভাজন—অশনি বললো একধার থেকে।

মিঃ চ্যাটার্জি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন অশনির পানে—সঙ্গে সঙ্গে কালীপদ এবং ম্যানেজারও। কিন্তু সমবেত সকলেই অশনির কথাটারই প্রতিধ্বনি করলো — সভাপতিমশাই — সভাপতিমশাই — সভাপতি-মশাই—! উনিই বিশ্বাসী আমাদের !!!

মিঃ চ্যাটার্জি রোষরুদ্ধকণ্ঠে বললেন—বেশ, উনিই তাহলে রাখুন। কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি আরম্ভ এবং শেষ হয়, তা কিন্তু দেখবেন আপনারা।

ম্যানেজার টাকাপয়সাগুলো গুটিয়ে গুনতে লাগলো। মাল্যধারী কালীপদ এরমধ্যে কয়েকটা কথা ভেবে নিচ্ছে—এই টাকার অছিগিরির কাজে সে জবাব দেবে, কি দেবে না। না—জবাব দেবে না কালীপদ। সে জানে, "পাবলিক মানি" যখের ধন—যে সাহস করে সিন্ধুক ধরতে পারে—সে ধন তারই! কালীপদ নির্ব্বোধ নয়। সে নীরবেই রইল। এই কাজটাকে অবলম্বন করে সে আবার দেশের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠবে, আবার বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা ছুতো পাবে, আবার তার নাম খবরের কাগজে ছাপা হবে। এবে, কালীপদ বিখ্যাত, প্রখ্যাত, অতিখ্যাত হয়ে উঠবে অচিরে। দশ মিনিটের মধ্যে কালীপদর হাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা উঠে এল, আর দু-এক দিনের মধ্যে আরো হাজার খানেক টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। স্বয়ং নিত্যানন্দই একশো টাকা দেবে, বললো। তারপর সভাপতিকে ধন্যবাদ ইত্যাদি দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হোল। তারাপদ অশনিকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে এর মধ্যে!

—উনি এসব কাজে তো বেশ দক্ষ, দেখলাম!—অশনি বললো তারাপদকে।

—খুব—তারাপদ অল্প হাসলো—নিজেকে পাঁচজনের মধ্যে বিশেষ একজন করে তোলবার ঝোঁক ওর চিরদিনের। এই সুযোগটাকে ও ভাল করেই কাজে লাগাবে।

—হুঁ—আপনি তাহলে সব-কিছু ছেড়েই দিলেন!—অশনির কণ্ঠে ক্ষুব্ধতার গ্লানিমা।

—না, অশনি! সব-কিছু ছাড়লে চলবে কেন? এখানকার কাজ একরকম হোল। এবার বৃহত্তর কর্ম্মের আহ্বান এসেছে, মহত্তর কর্ত্তব্যের পথে আমার যেতে হবে। এখানকার অর্থের প্রলোভন আর খ্যাতির মোহ ছাড়তে না পারলে আমার মুক্তি নেই।

—যেখানেই যান, খ্যাতিমান আপনাকে হোতেই হবে। মানুষ আজ নেতাকে চিনতে শিখেছে—নিষ্ঠাকে ভালোবাসতে শিখেছে,—নিজেকে আপনি লুকোবেন কি করে!

—লুকুতে চাই নে! আমি যে তাদেরই লোক—এই কথাটাই যেন তারা সবসময় আমার কাণে বলতে থাকে। তাদের জন্যই আমার সব-কিছু আমি করতে চাই অশনি, নিজের জন্য নয়, এই অনুভূতি যেন আমার জীবনভোর জাগ্রত থাকে।

—কিন্তু এই দেশসেবার পুরস্কার....

—দেশসেবার পুরস্কার দেশকে সেবা করতে পাবার অধিকার। ওর থেকে বড়ো পুরস্কার তো আর নেই অশনি! দেশসেবকের সব থেকে বড় পুরস্কার, আমৃত্যু তাকে দেশসেবক থাকতে দেওয়া। জানো অশনি, কত বিপুল রাজ-গৌরব, কত বিরাট ব্যক্তিত্ব, কত অতিমানবীয় প্রতিভার কূটনীতিত্ব অতি সামান্য ভুলের জন্য দেশসেবকের আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে! অতি তুচ্ছ অহঙ্কারের জন্য দেশবাসীর ঘৃণাভাজন হয়েছে! ইতিহাসের কালোপাতায় তাদের নাম লিখতে আজ ঘৃণা করি আমরা। দেশসেবক চিরদিনের সেবক, নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী, নিরহঙ্কার,—তার শক্তি অনমনীয়, তার আহ্বান দুর্ব্বার, তার তপস্যা জ্বলন্ত হোমশিখা; সে কিছুই নেবে না, কিছুই চাইবে না, যা-কিছু দিতে চাও, তার তপস্যার আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। যে-দিন সেই আগুনের শিখা অহঙ্কারে অপবিত্র হবে, হব্যের জন্য

লোলুপ হবে, সেদিন সে আর সেবক নয়।—একটু থেমে আবা
বললো,—

দেশসেবকের ভুল হওয়া চলে না; পরবর্ত্তী যুগের দেশ তার ভুলে কখনো ক্ষমা করবে না। দেশসেবকের একটা ভুলের জন্য, তুচ্ছ প্রলোভনের জন্য, অথবা সামান্য গাফিলতির জন্য একটা বিরাট জাতি শতাব্দির পর শতাব্দি হয়তো শৃঙ্খলিত থাকতে পারে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে পৃথিবী থেকে। তাই জেনে রেখো, দেশসেবকের মত কঠোর কর্ত্তব্য কারো আর নাই। তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেবক থাকতে পাওয়ার সৌভাগ্য—তারাপদ থামলো।

আজকাল তো দেখি, দিনকতক দেশের কাজ করার পরেই বড় বড় মাইনের আর বড় বড় কণ্টাক্ট-কারবারের দরজা খুলে যায়, অধিকাংশই ঢুকে পড়েন।

—তাঁরা আর দেশসেবক থাকেন না। মূক, সহনশীল দেশবাসী মুখে কিছু না বললেও তারা বোঝে; আর ভবিষ্যৎ দেশ-পুত্র তাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবে না;—কোনো দেশে কখনো ভবিষ্যৎ দেশপুত্র তাকে ক্ষমা করে নি!

তারাপদর গম্ভীর কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ হয়ে উঠলো উত্তেজনায়।

—আজ যারা ভুলের পর ভুল করবে, একটা বিরাট জাতির সংস্কার সংস্কৃতি, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যত্ববোধকে পরিচালিত করবে, তাদের মধ্যে কে কতখানা ভুল করলো, আজ হয়তো আমরা নিশ্চিতভাবে তা বুঝতে পারবো না, কিন্তু একদিন আমাদের সন্তানগণ বুঝবে—তারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে সেদিন—নির্ম্মম হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক ভুলের ক্ষমা নেই—ক্ষমা থাকা উচিৎ নয়। স্তোকবাক্য, তোষণনীতি, প্রদত্ত ক্ষমতার অতি-ব্যবহার এবং অপব্যবহারকে অতিন্দ্রিয়গম্য অবাস্তব কিছু দিে

আচ্ছাদন করার চেষ্টা বর্ত্তমান কালকে হয়তো ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ভাবীকাল তাকে আবিষ্কার করবেই—সেদিন সে ক্ষমাহীন হয়ে উঠবে, নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে অতীতের ইতিহাসের উপর।

অশনি চুপ করে শুনে গেল, কোনকিছু বলতে ওর ইচ্ছে হচ্ছে না। ওর মুখ বড় বিষণ্ণ। তারাপদ ওর মুখপানে তাকিয়ে ম্লান হাসলো ;—বললো,

—আমি জানি অশনি, তুমি কি ভাবছো, জানি আমি। আমার জীবনকে আমি সর্ব্বত্র বন্ধনহীন, মুক্ত রাখতে পেরেছি, একটামাত্র বন্ধন আছে—সে কৃষ্ণা। আমার জীবনের একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহের সম্পদ সে। তোমার হাতে তার ভার······

—থাক্ থাক্······ওসব আপনি এখন ভাববেন না—অশনি বাধা দিল কথায়।

—হ্যাঁ থাক! ও আশা তুমি ছেড়ে দিয়ো অশনি, আমার অনুরোধ। আর যদি সে আশা করো তবে দেশসেবকের আসন পাবার আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিও।

—কেন?—অশনি বিস্মিত হয়ে বললো—ওকে পেলে জীবন আমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যে ভরে তুলতে পারতাম কাকামণি।

—সর্ব্বৈশ্বর্য্যে নয়, শুধু ঐশ্বর্য্যে, অহঙ্কারে, অভিমানে! সর্ব্বৈশ্বর্য্য শিবের,—তিনি নৈর্ব্ব্যক্তিক, নির্ব্বিকার। মানুষের কাছে তিনি শুধু একটা আইডিয়া, রূপায়ন! ওঁর কিছু নাই, তাই সব আছে—কিছুই চান না, তাই সবই পাওয়া হয়েছে।

—বুঝতে পারছি না, কি আপনি বলতে চান কাকাবাবু?

—বলছি, নারীর জন্য দেশ-সেবক সব কিছুই করতে পারে। দেবতাও হতে পারে, কিন্তু নারীকে সাথে নেবার বাসনা তার ত্যাগ করা উচিৎ। নারী থাকবে তার কাছে শুধু একটা 'আইডিয়া'।

—হুঁ—অশনি নিশ্চুপ হয়ে গেল। মনের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠছে ওর। কিন্তু ও জানে, সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে। তবু কিছুটা পথ হাঁটতে হাঁটতে আবার বললো—অনুমতি করেন তো আমি একবার আপনার দাদার কাছে প্রার্থনা করি কৃষ্ণাকে!

—তুমি জানো না অশনি, দাদা এখন দিবাস্বপ্ন দেখছে বড়লোক হবার, বড়ো মানুষ হবার, সকলরকমে বড়ো হবার। তোমার আত্ম-মর্য্যাদাকে আহত হতে দিতে আমি অনিচ্ছুক। তাছাড়া……

—বলুন!

—তোমাকে আমি কর্ম্মীরূপেই দেখতে চাই—ভাববিলাসীর কাব্যকুঞ্জে নয়!

—বেশ, তাই হবে—বলে অশনি আকাশের পানে চাইলো, তারপর প্রণাম করলো তারাপদকে।

কালীপদ জানে, কেমন করে দেশের রাজনৈতিক মনোবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হয়; জেলে যাওয়াকে পদাধিকার অর্জনের ছাড়পত্র হিসাবে কি করে ব্যবহার করতে হয়; অপ্রতিরোধ্য কষ্টভোগটাকে স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য দুঃখবরণ হিসাবে চালাতে আজকালকার দিনে দরকার গোটাকয়েক পাব্লিসিটির কায়দা—আর কিছু নয়। এরকম ভুয়ো দেশ-সেবক আজকাল অনেক দেখা যাচ্ছে। ওরা না জানে দেশের অতীতের ইতিহাস, না বোঝে বর্ত্তমানের সমস্যাকণ্টকিত অবস্থা, না ভাবে ভবিষ্যতের মঙ্গলময় কর্ম্মপদ্ধতির কথা। ওরা সুরে চলে, হুজুগে নাচে, হামবড়া ভাবটাও

সকল সময় বজায় রাখে। কিন্তু সে হুজুগ থামাবার কায়দাও ভালোই জানা আছে প্রতিপক্ষের। একটার পর একটা বিরাট বৈপ্লবিক হুজুগের পরেই দেখুন-না, এক একটি চমৎকার আড়ম্বরমাখা প্রস্তাব আর প্রতিশ্রুতি এসেছে,—দিনকতক খুব হৈ হুল্লোড়, খবরের কাগজের মাতামাতি, তারপর সব ঠাণ্ডা। অনেকেই বলবেন:দেশোদ্ধারের কত বড় বড় কথা, আবার তাঁরাই সৃষ্টি করবেন বৃহত্তম বিভেদের বহ্নিবলয়। ওঁরা রাজনীতিক, ওঁরা সমাজনীতিক, ওঁরা জনমতের প্রতিভূ! কিন্তু পরাধীনতার সর্ব্বনিকৃষ্ট গ্লানি—ওঁরা—দেশের অতবড় চিন্তাশীল মনীষীরা নিজেদের সুচিন্তিত মঙ্গলময় কথাগুলি কদাচিৎ প্রকাশ করবেন। কিন্তু কালীপদ জানে না, এযুগের সবাই তা নয়—অনেকে আছেন, সত্য কথা বলতে যাঁদের কলম কখনো কুণ্ঠিত হয় না ; কদাচিৎ তাঁরা মানুষের নৈতিক দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেন। তাঁদের সংখ্যা কালীপদর আমলে কম ছিল, এখন সে সংখ্যা বেড়েছে কি না, কালী জানে না। বর্ত্তমান বাঙলার গণচেতনায় সুদৃঢ় গণমনের ক্ষমাহীন প্রকাশক জনমতগুলির সঙ্গে সে পরিচিত নয়। আজকার জনমত কতখানি উন্নত, তার সমর্থকসংখ্যা কত বৃহৎ এবং তার ভবিষ্যৎ কতখানি আশাপ্রদ, জানে না কালীপদ।

কিন্তু তাতে কিইবা যায় আসে! সুযোগকে সদ্ব্যবহার করবার জন্য কালীপদর বুদ্ধিশক্তি যথেষ্ট। সে সভাক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই কাজে লেগে গেল। চারিদিকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সংবাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষের সেবাধর্ম্ম পালনের সুযোগ খুবই কম—ব্যক্তিগতভাবে সে ধর্ম্ম পালন প্রায় অসম্ভব ; কারণ যুদ্ধ-বিরতির পরেও এমন সব ব্যবস্থা বর্ত্তমান যাতে যে-কোনো কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এই তো সুযোগ,—মহত্তর সুযোগ! কালীপদ কয়েকদিনের মধ্যেই সুযোগটাকে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে নিল। মিঃ চ্যাটার্জির

সাহায্যে সে জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলো, জেলাবোর্ডে সাহায্যের জন্য আবেদন করলো, বড় বড় নেতাদের কাছে চিঠি পাঠালো এবং দেশের নানা স্থানে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আবেদন লিখে সাহায্য চাইলো। বক্তৃতার প্লাবন বইয়ে দিল কালীপদ। চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে হীরাপুরের যে হলটায় লোকাধীশের বক্তৃতা শুনে সে মুগ্ধ হয়েছিল, সেই হলেই আজ কালীপদর বক্তৃতা শুনবার জন্য হাজারখানেক মানুষ সমবেত। তার উদ্দীপনাময়ী বাণীতে উত্তেজিত জনতা শুধু টাকার তোড়া দিয়েই নিরস্ত হোল না, পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে টাকা বৃষ্টিও করলো ওর উপর। 'কারাবরণকারী দেশপ্রেমিক সে,দেশের জন্য সে দীর্ঘ,দীর্ঘকাল, —জীবনের শ্রেষ্ঠ যৌবনকালটাই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়েছে—ওর থেকে বেশি বিশ্বাসভাজন আছে কে আর এখানে! মানবহিতৈষণার যা-কিছু কাজ ওর থেকে ভালোকরে আর কেউ করতে পারবে না'—এই রকম গালভরা কথা প্রচার করার জন্য দুতিনজন ভাড়াটে বক্তাও নিযুক্ত করে ফেলেছে কালীপদ। এই বুদ্ধিটা অবশ্য মিঃ চ্যাটার্জির ;—তিনি ভেবেছিলেন.—কালীপদকে হাত করেই শেষটায় তারাপদকে ক্যাপচার করবেন। কিন্তু যখন জানলেন, তারাপদ বাড়ীর সংস্রব একেবারে কেটে বেরিয়ে এসেছে, তখন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মিঃ চ্যাটার্জির। কালীর পিছনে অনর্থক সময় অপব্যয় না করে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু কালী এরমধ্যে যেটুকু সুবিধা তাঁর কাছে পেয়েছে, তাই যথেষ্ট। কলকাতার একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর দৈনিক কাগজ—মিঃ চ্যাটার্জিদের মূলধনে যে কাগজ দেশসেবার ছদ্মবেশে ধনিকপোষণ আর সরকারতোষণ নীতি শিক্ষা দেয়—কালীপদ তাতে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়ে গেছে। নিজের মহকুমায় কালীপদ সেই কাগজের প্রচার-সংখ্যাও বাড়িয়ে নিচ্ছে।

দেশ দরিদ্র—কিন্তু টাকা তো অজস্র আসছে, দেখতে পাচ্ছে কালী। এই হতভাগ্য দেশে গুরুগিরি করে, ধর্ম্মের ব্যবসায় করে লক্ষ লক্ষ টাকা বহু লোক রোজগার করেছে, এখনো করে, কিন্তু দেশোদ্ধার, দেশসেবা ইত্যাদির নামে টাকা কিছু কম রোজগার হয় না। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, যাহোক একটা কিছু নিয়ে নামতে পারলেই হোল; তারপর সেই বৈদিক সংস্কৃতির পুরোনো বুলি—"দরিদ্রনারায়ণের সেবা, বুভুক্ষু-মানবাত্মার মুক্তি" —"জাতীয় জীবনের পুষ্টি—" ইত্যাদি বলতে থাক—হু-হু করে টাকা এসে যাবে। মানুষের সেবাধর্ম্ম, দয়াধর্ম্ম, ত্যাগমনোবৃত্তি এবং দুঃখবরণের স্পৃহাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে কাজে লাগাতে আর কোনো দেশে দেখা যায় না। আপনার অন্নের অর্দ্ধাংশ কেটে যারা বুভুক্ষুর জন্য দান করলো, তারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি—কিন্তু সেই দানের সুযোগটা গ্রহণ করলো মাত্র জনকয়েক বুদ্ধিমান। নিজের দেশ সম্বন্ধে এতবড় গ্লানির কথা প্রচার করা যে-কোনো লেখকের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে তাই ঘটে থাকে—, বড়ই নির্ম্মম সত্য একথা।

কালীপদর হাতে টাকা আসতে লাগলো। নদীর ধারে বাঁধ বাঁধাবার কাজে লোকও লাগানো হোল। জনকল্যাণের কাজ—তাই বহু শ্রমিক নামমাত্র বেতনে কাজ করে যেতে লাগলো। পনের দিনের মধ্যে কালীপদ সারা জেলাটায় সুবিখ্যাত হয়ে উঠলো। তার নামের সঙ্গে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিবিড় পরিচয় ঘটতে লাগলো দিনদিন। চরকীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে কালীপদ এই কয়দিন। কংগ্রেস কিম্বা হিন্দুমহাসভা—কোনটায় যোগ দিলে বেশি সুবিধা হবে—এখনো ঠিক করে উঠতে পারে নি—আজ তাই হীরাপুরে বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে ভাবছিল, কংগ্রেসই বেশি লোকের সমর্থন পাচ্ছে, অতএব কংগ্রেসেই যোগ দিতে

হবে। নিজেকে নেতা করে তুলতে কালীপদর কিছুমাত্র দেরী হবে না; —তারপর একদিন, কে বলতে পারে রাষ্ট্রপতি হয়ে সে দেশের সর্ব্বোচ্চ আসনে বসতে পারবে কি না! মানুষের ভাগ্যের কথা কি বলা যায়! এই যে আজ আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকগুলিকে সম্মান আর শ্রদ্ধার উচ্চতম আসনে বসিয়ে দেশবাসী পূজা করছে, ওঁদের এই মহাভাগ্যের কথা কি ওঁরা সকলেই পূর্ব্বে জানতেন? ওঁদের মধ্যে অনেকেই তো, নানা কর্ম্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়েছিলেন! ওঁদের মধ্যে ভারতসরকারের উচ্চতম কর্ম্মচারীও ছিলেন কেউ কেউ। তাঁরা স্বপ্নেও হয়তো সেদিন ভাবেন নি, যে দেশের অন্তরাত্মার মাঝখানে তাঁরা স্থান গ্রহণ করতে পারবেন কোনদিন। আজ তাঁরা দেশের চোখে দেবতা। কালীপদর ভাগ্যে যে এমন সুযোগ আসবে না, তা কে বলতে পারে! সুযোগ আসে নিয়তির নির্দ্দেশে, অদৃশ্য কোন শক্তির আধার থেকে। মানুষ জানে না, কবে সে-সুযোগ আসবে; কিন্তু সুযোগ এলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা নির্বুদ্ধিতা। অবশ্য বিপদ আছে, বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাও আছে, কিন্তু তাবলে বসে থাকা চলে না। নির্ব্বোধ কালীপদ ভাবলো না যে, দেশের অন্তরে স্থান পেতে হলে আজাদী সৈনিকের মত নিষ্ঠাবান হতে হবে!

মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে নেতাদের আলাপ-আলোচনা চলছে দিল্লীতে। মহাত্মাজী সদলবলে হরিজন পল্লীতে আবাস স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের কাগজে কাগজে খাদ্যাভাবের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের ভীতি এবং ঐ কাগজেই হাজার হাজার মণ খাদ্য-অপচয়-এর সংবাদ বড় বড় টাইপে ছাপা হচ্ছে। ন্যাসনালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস, নিরপেক্ষ, ইত্যাদি নামের সব পার্টিরা জল্পনা আর জটলায় বেশ সোরগোল সৃষ্টি করেছেন দেশের মধ্যে।—এদিকে বিদেশী সাহিত্যের সস্তা কারবারে দুএকজন দুপয়সা বেশ কামিয়ে নিলেন। নেতাজীর কাহিনী আর কাজ নিয়ে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক বই বাংলা

সাহিত্যে ঝলমল করছে—দেশের গণজাগরণ সুস্পষ্ট,—স্বাদেশিকতা-বোধ তীব্রতর, সাহিত্যপ্রীতি সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত। ওদিকে পৃথিবীর পটভূমিকায় ত্রিশক্তি-সম্মিলন, মানবতার নামে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ—ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তির জন্য অ্যাটাম্ বোমের পরীক্ষার ঢক্কা নিনাদ, তার সঙ্গে কোন্ কোন্ শক্তি কোন্ কোন্ হতভাগ্য দেশের উপর কতখানি বাণিজ্য করবার-ক্ষমতা রক্ষা করতে পারবে, তারও চুক্তি চলেছে; এমন সময় কালীপদর আবির্ভাব নিশ্চয় তার ভাগ্যের সুফল সূচনা করে। সহর থেকে ফেরার পথে কালীপদ এই সব কথাই ভাবছিল—আর হাঁটছিল। কয়েকদিন আগে কাবুল থেকে ফেরবার সময় এই পথেই সে এসেছিল, দেখেছিল এই সাঁকো, ঐ বাবলা গাছ দুটো, তারপর মাঠ, গ্রামের সীমারেখা—ভেবেছিল গ্রাম্য জীবনের শান্ত শুদ্ধ পরিবেষ্টনীর মায়াময়তা,—না-দেখা একটি কিশোরী কন্যার স্নেহসজল মুখ, আর বিস্মৃত দিনের বিরহ-গুঞ্জিত ইতিহাস। আর আজ! কালীপদ নিজেকে দেখছে দিগন্তের দূরপ্রসারী সীমাহীনতায়, যেখানে সে আর গ্রাম্য তৃনাঙ্কুর নয়, কাবুলী কালীপদ নয়, কৃষ্ণার পিতা নয়। সে এক বিরাট রাষ্ট্রের ভাগ্য-বিধাতৃর গর্ব্বিত সম্ভাবনাময় ভ্রূনাঙ্কুর।—কালীপদর মুখখানা উৎসাহের দীপ্তিতে ঝলোমলো!

কিন্তু কৃষ্ণার কথাও একেবারে ভুলে যায় নি কালীপদ। গত পরশু যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন কৃষ্ণার মুখখানা বড্ড শুকনো দেখেছিল যেন। মনের উচ্চাশার আর বক্তৃতার উদ্দীপনার তাড়নায় তখন কালীপদ ভুলে গিয়েছিল কৃষ্ণাকে শারীরিক সুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করতে। এখন বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেছে, প্রাপ্য করতালি এবং প্রশংসা, তার সঙ্গে টাকার তোড়াও এসে গেছে; অধিকন্তু পেয়েছে তিন-খানা মানপত্র, পাঁচখানা চরকা, কুড়ি পঁচিশখানা সাধারণ ব্যবহার্য্য বস্ত্র,

ছুটো ফাউনটেন পেন (অবশ্য বিদেশের তৈয়ারি) এবং রাশিখানেক ফুলের মালা। এ ছাড়া কালীপদ বড় একভাঁড় মিষ্টি কিনেছে কৃষ্ণার জন্য—হয়তো বা আরো কারো কারো জন্য, কিন্তু সে চিন্তাটা কালীর মনের অজ্ঞাত রাজ্যের গোচরীভূত। পিছনের মুটেটা সবজিনিষ বয়ে আনছে—মিষ্টির ভাঁড়টা ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কালী নিয়েছে স্বহস্তে। কৃষ্ণার হাতে দেবে গিয়ে। কৃষ্ণা পাড়ার পাঁচজনকে—না, তার বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয়—ছুএকজনকে দেবে, নিজেও খাবে। কালী ভাবছিল—একটা নতুন জিনিষ সে কিনেছে কৃষ্ণার জন্য—কানের পাশা। সোনার নয়,—বেনারস থেকে আমদানী কাচের একরকম সৌখিন গহনা ; আজকাল বেজায় চলতি জিনিষটার—বড় থেকে ছোটলোকের মেয়েরা সবাই পরছে ; দেখতে বেশ লাগে। জিনিষটা একদম মেকী—তাই আসলকে সে ব্যঙ্গ করে চলেছে প্রতি তরুণীর কানে কানে। ওর দীপ্তি এত প্রখর যে মানুষকে ভাববার সময় দেয়না—ওটা মেকী। র‍্যাপিড্ টেম্পোতে-চলা সিনেমার গল্পের মত ওর চাকচিক্য দোল খায় যাদের কানে, তাদের সম্বন্ধে মানুষ কত না কল্পনার অবকাশ পায়—কত না সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে, কিন্তু সে-সব ঐ সিনেমার গল্পের মতই ধোঁকা দিয়ে দেখানো আতসের ফুলকী। কালীপদ এসব কিন্তু ভাবেনি ; তিনজোড়া কানের পাশা সে কিনেছে, কৃষ্ণা অবশ্য ছুজোড়া নেবে, আর—আর একজোড়া....না, কালীপদ ভাবনাটা শেষ করেনি। বয়স্ক পিতা সে, শিক্ষিত ভদ্রলোক সে, দেশের ভাবী নেতা সে, বাড়ী থেকে আসবার সময় হাসির মা'কে বলে এসেছিল কৃষ্ণাকে দেখাশুনা করার কথা—অতএব আর একজোড়া হাসির কাজের পুরস্কার। জিনিষটা পল্লীতে নূতন,—হাসির নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে ; হাসিমুখেই নেবে হাসি। সেদিনের সেই হাসির মামা আর মা'র সঙ্গে কথা বলার পরে হাসি বহুবার এসেছে কৃষ্ণার কাছে, কালীপদর জন্যও চা করে দিয়েছে,

কাগজপত্র গুছিয়ে দিয়েছে, বক্তৃতা নকল করে ছাপাবার জন্য খবরের কাগজে পাঠিয়েছে। কৃষ্ণা যা করতে সময় করে উঠতে পারে নি, হাসিই সেই সব অতি-দরকারী কাজগুলো করে দিয়েছে কালীপদর জন্য। হাসির মা উৎসাহ দিয়েছে তাকে।

কিন্তু কৃষ্ণার কথা তখন ভাবেনি কালী। ছোট মেয়ে নয় কৃষ্ণা; মেয়েদের মনের মানসিকতা, প্রবৃত্তির গোপন গতির সঙ্গে প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানের নারী-ইতিবৃত্ত ওর অজানা নয়; কিন্তু মনকে সে আর মানুষের বিলাস-পর্য্যায়ে লালন করে না—বজ্রের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে চায়; —কৃষ্ণা তাই এড়িয়ে গেছে হাসি আর তার মায়ের সব কিছুকে। আপনার গতিবেগে উচ্ছ্বসিত অন্ধ কালীপদ দেখতে পায় নি কৃষ্ণার অন্তর।

কালীপদ বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লো! নতুন ইমারতটা অশ্বিনী বাবু কালীর জন্যই তৈরী করে দিচ্ছে; অবশ্য কথাটা এখনো পাকাপাকি হয় নি; তবে, যে বাড়ী আরম্ভ হয়েছে, সেটা শেষ তো হতে হবে। কালীকে দেখে অশ্বিনী বললো—সকালের ট্রেণে নামলে নাকি বাবাজী? শরীর ভালো?

—হ্যাঁ ভালো? তোমরা ভালো আছ সবাই?

বয়সে খুব বেশি তফাৎ নেই, তাই কালী প্রণামটা আর করলো না, কিন্তু করা তার উচিৎ ছিল। অশ্বিনীর ওকে "বাবাজী" বলে সম্বোধন করার অভ্যন্তরে যে ইঙ্গিত রয়েছে, কালী তার অর্থ বোঝে। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা বোধ করলো সে প্রণাম করতে, আর এই তো মাত্র দুদিন সে বাড়ী ছিল না—প্রণাম করবার দরকারও নেই এমন। কালী ঘর পানে এগুলো; হাতে সেই মিষ্টির ভাঁড়টা।

—ওবেলা একবার দেখা কোরো কালী—আশ্বিনী হেঁকেই বললো। কথাটা।

কালী জানে, অশ্বিনী কেন তাকে দেখা করতে বললো ; আন্দাজেই বুঝেছে। হাসিতে কালো মুখখানা লাল হয়ে উঠবার কথা, কিন্তু সে এর মধ্যে তার বাঁশের ফটকের কাছাকাছি এসে গেছে। ফটকটা আধ-খোলা করে দাঁড়িয়ে হাসি। মিষ্টির ভাঁড়টা সেই নিল কালীর হাত থেকে, শুধুলো—মোরব্বা নাকি ?

—না – আসানসোলের চম্‌চম্—বলতে বলতে—কালীপদ উঠানে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, মোটা একখানা চাদর গায়ে দিয়ে কৃষ্ণা কয়েকটা থালাবাটি ধুয়ে নিচ্ছে কূয়োতলায়।—গায়ে চাদর কেন ?—কালী কাছাকাছি এসে শুধালো, হাসিই বললো—পরশু থেকে কৃষ্ণার জ্বর।

—জ্বর ! জ্বর কেন হোল আবার !—কালীর স্বরে উৎকণ্ঠার সঙ্গে উপেক্ষার মাত্রাটা কতখানি, ঠিক বোঝা গেল না ; কালী এঘরের বারন্দায় উঠলো এসে। কৃষ্ণা নীরবে বাসনগুলো ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। এঘরে কালীপদ বসেছে একটা জলচৌকিতে। বসবার জন্য ভালো কয়েকটা আসন কুশন দরকার। কে জানে কবে ওর বাড়ীতে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট এসে পড়বেন। গান্ধী, জহরলালের মত লোকও এসে তো পড়তে পারেন। বাড়ীখানা তৈরী হবার যা দেরী ; কালী তার পরেই কলকাতা গিয়ে দেখে শুনে এক প্রস্ত ফার্নিচার কিনে আনবে। একটা রেডিও-সেট্‌ও দরকার হচ্ছে তার।

মুটের মাথা থেকে হাসি বাকি জিনিষগুলো নামালো। সুটকেশ আর বেডিং আর মানপত্রের প্রকাণ্ড তসবীরক'খানা। কোথায় টাঙাবে এগুলো ?

—নেতাজীর ছবি আনেন নি ?—হাসি প্রশ্ন করলো আচম্‌কা।

—না—কালী পকেট থেকে পয়সা বের করে মুটেকে বিদায় করলো—বললো,—কি হবে নেতাজীর ছবি ?

—কৃষ্ণা বলেছিল আপনাকে আনতে—আস্তে বললো হাসি, কণ্ঠ ওর করুণতম।

—ও! যা কাজের ভিড়! ভুলে গেছলাম। খোলো তো সুটকেশটা!

কালীপদ ঝনাৎ করে চাবিজোড়া ফেলে দিল হাসির পায়ের কাছে। হাসি আস্তে খুললো সুটকেশ। উপরেই ছুটো নতুন ফাউণ্টেনপেন। (ফাউণ্টেন পেন আজকাল পাওয়া যায় না বাজারে, কালীর ভক্তরা কালো-বাজার থেকে কিনে ওকে উপহার দিয়েছে) তারপর খদ্দরের কয়েকটি সৌখীন এমব্রয়ডারী করা রুমাল, টেবিল-ক্লথ, তার নীচে কালীর পরবার কাপড়চোপড়। কয়েকটা নোটবই, খাতা, পেনসিল, খবরের কাগজের কাটিংও রয়েছে, আর কাগজের বাক্সে সেই কান-পাশা। হাসি দেখছে জিনিষগুলো উল্টেপাল্টে; কালী এরমধ্যে হাতমুখ ধুয়ে নিল। কৃষ্ণা চা নিয়ে দাঁড়িয়েছে এসে; কালী পুনরায় বসে বললো—বেশ দেখতে জিনিষগুলো, না?—কানপাশাগুলো তুলে দেখালো সে ওদের।

—চা খাও বাবা—কৃষ্ণা শুষ্কমুখে বললো। সারা মুখে ওর ক্লান্তির পাথার নেমেছে।

—হুঁ, তুই কোন জোড়াটা নিবি, কৃষ্ণা?—কালী শুধুলো চায়ের কাপ নিতে নিতে।

—থাক যে-হোক একজোড়া—কৃষ্ণা নতমুখে বলে দাঁড়িয়েই রইল। হাসিই ওর মধ্যে সব থেকে ঝকঝকে জোড়াটা তুলে কৃষ্ণার কানে পরিয়ে দিতে দিতে বললো—এইটা তোকে ভালো মানাবে, ফর্সা গায়ে লাল রঙ!

কৃষ্ণা কিছুই বললো না—ধীরে ধীরে চলে গেল রান্নাঘরে। ওর মনের পরতে পরতে শুধু ওর কাকার কথাটা বিদ্যুতের চাবুক হানছে। বাবা এই পনরদিনের মধ্যে একবারও কাকার কথাটা শুধুলো না পর্য্যন্ত!

কৃষ্ণা অসহায় নিস্তব্ধতায় নিবিয়ে গেছে যেন—ওর মনের অতল গহ্বরের আগ্নেয়গিরিটা ছাইচাপা পড়ে গেছে—ওর উপরের সমৃদ্ধিশালী মহানগরী আজ মৃত।

সেদিন রাত্রে অশনি এসেছিল, কালীপদর বাইরে যাওয়ার পর। তার কাছে কৃষ্ণা খবর পেয়েছে, শ্রমিক আন্দোলনে সাফল্য লাভ করার জন্য তারাপদ মিলের কর্ত্তাদের সুনজরে পড়েছে। তাঁরা ওকে বৃহত্তর কাজের ভার দিতে চান। অর্থাৎ তারাপদকে কোনোরকম প্রলোভনে ফেলতে না পেরে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চান। তারাপদও চলে যেতে চায় বৃহত্তর কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে। যাবার আগে তার স্নেহদুলালীর বর্ত্তমান অবস্থাটা জানতে পাঠিয়েছিল অশনিকে। কৃষ্ণা বিশেষ কিছুই বলেনি, শুধু কাকাকে একবার দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকা তো এলো না। বাবা না ডাকলে কাকা নিশ্চয় আসবে না। কৃষ্ণার জ্বরাক্রান্ত দেহখানা অভিমানের অসহায়তায় আর্ত্তনাদ করছে। দীর্ঘ এই পনর দিন ধরে তার অচেনা বাবার কর্ম্মশক্তি দেখছে শুধু, নীরবেই দেখছে। দেখছে, হাসির মা কেমন ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নিতে চায়—হাসি কেমন স্বচ্ছন্দ হয়ে চলাফেরা করে এবাড়ীর উঠোনে, ঘরে, রান্নাঘরে। কৃষ্ণা যেন পাথরের পুতুল—শুধু ওর চোখদুটো জীবিত, শুধু দেখে যেতে পারে।

কালীপদ দেখলো, কৃষ্ণা চলে গেছে। এতক্ষণে অন্য কানপাশা-জোড়া তুলে হাসির হাতে দিতে গিয়ে বললো—তোমার জন্য এই জোড়াটা।

—আমার জন্য ? কেন, আমি কি করলাম আপনার ?

—করেছো বৈকী, অনেক উপকার তো করছো—নাও !

—ওম্মা—সে উপকার নাকি আট আনার মেকী কাচ দিয়ে শোধ করবেন ? জিনিষটা তাও যদি একটু দামী হোত !—হাসি হাতে নিল পাশাজোড়া হাসতে হাসতেই। বিব্রত কালীপদ বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে গেল। বহুদিন ওর অভ্যাস নেই এরকম কথা শোনা। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে, নইলে সম্মান বজায় থাকে না ;—দামী জিনিষ কী আর আছে, বলো ? আমার বক্তৃতা নকল করে দিও, ঐ কলমটাও নাও তুমি।

—বক্তৃতা নকল করে দিতে হবে ? তাহলে তো ওটা দাদন দেওয়া হোল মশাই !—বলেও কিন্তু হাসি নিল একটা কলম, যেটা ওরমধ্যে ভালো এবং দেখতে সুন্দর। আধমিনিট দেখে বললো—কৃষ্ণার জন্য নেতাজীর ছবি কিন্তু আনা উচিৎ ছিল।

—আচ্ছা, পরে এনে দিলেই হবে—বলে কালী নিশ্চিন্তে চা খেতে লাগলো।

হাসির মা আসছিল, গেটের কাছ থেকেই দেখতে পেলো, মেয়ে তার বেশ জমিয়ে নিয়েছে এর মধ্যে। কি-জানি-কি ভেবে আর এলো না, ফিরে গেল। হাসি সুটকেশটা আবার গুছিয়ে রেখে দিতে দিতে বললো—

—কাল সারাদিন খুব জ্বর ছিল কৃষ্ণার ; জ্বরের ঘোরে সারাদিন 'কাকা' আর 'কাকামণি' করেছে।

—হুঁ !—কালীপদ চা খাওয়া শেষ করে বললো—শুয়ে থাকতে বল। রান্নাঘরে কেন যাচ্ছে ?

কালী উঠে পড়লো। ওর মনের ভেতর একটা ক্রুততার তাগিদ যেন

অনর্থক ঘুরছে। কাজ নয়, কাজের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা। এই কদিনের পরিশ্রমে কালী যে সুবিধেগুলো যোগাড় করেছে, সেগুলো কাজে লাগাবার জন্য ওর মন ছট্‌ফট্ করছে এখন। ওর মনটা অনতিবিলম্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চায় এখানে ;—ভাইএর ভাবনা বা কন্যার কান্না সে-মনের উপর আল্‌তো ছোঁয়াচের মত নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। সে-মন এখন আর দেশের জন্য কারাবরণকারী বিপ্লবী কালীপদর মন নয়— মাতৃভূমির যজ্ঞসমিধ আহরণকারী কালীপদর মন নয়, সে-মন এখন আত্মগর্ব্বে সচেতন, আত্মপ্রতিষ্ঠায় অপ্রতিহতচিত্ত বিলাসী কালীপদর মন। সেখানে হাসির হাস্য-ঝঙ্কার প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার ক্রন্দন পৌঁছবে না।—কালী বেরিয়ে গেল, কোথায়,—কে জানে!

হাসিই তুলে রেখে দিল কালীর সুটকেশ, বিছানা। রান্নাঘরে এসে দেখলো, কৃষ্ণার জ্বরটা ভোর রাত্রে যেটুকু কমেছিল, এখন আবার সেটুকু পুরণ করে নিয়েছে। তবু কৃষ্ণা উনুনে কি একটা রান্না চড়ালো। হাসি বললো—থাক্, যা তুই শো, আমি রেঁধে দিচ্ছি আজ!

—থাক, আমিই পারবো।—কৃষ্ণার কথাগুলো কাঁপছে জ্বরের ধমকে।

—না, পারবি না—বলে হাসি ওকে টেনে এনে এঘরে একখানা তোষক পেতে শুইয়ে দিল। গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল। বললো,—ঘুমো! জল খাবি?

—দে! বাবা কোথায় গেল হাসি? কাকার কাছে গেল না?

—না!—তোর বাবা সম্বন্ধে সব ধারণাটাই কিন্তু আমার বদলে গেছে কৃষ্ণা!—হাসি বলতে বলতে হাসলো একটু; কৃষ্ণা সজল চোখে চেয়ে আছে। হাসি ফের বললো—তোর কথা শুনে ভাবতাম, তোর বাবার গায়ের রং কালো হতে পারে, কিন্তু অন্তরটা নিশ্চয় আগুনের মত লাল।

আজ দেখলাম, অন্তর লাল বটে, কিন্তু আগুনের মত নয়, নির্গন্ধী পলাশ ফুলের মত ; এতোটুকু উত্তাপ নেই।—হাসি একটু হাসলো আবার ; কিন্তু হাসিটা করুণ দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণা কিছু বললো না। ছলছল চোখ দুটি ওর ধীরে বুজে এলো। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললো আস্তে—আমি কাকাকেই 'বাবা' বলে জানি! তার অন্তর শুধু লাল নয়, আগ্নেয়গিরি। কাকা তোকে নিল না হাসি—বাবাকে তুই অনায়াসে পেতে পারিস। ঘরকন্নার পক্ষে বাবা ভালো লোক।

কৃষ্ণাও ক্ষীণ হাসি হাসলো একটু। হাসি বললো—আজকার মেয়েরা শুধু ঘরকন্না নিয়েই সুখী হয় না কৃষ্ণা, এটা তুই নিশ্চয় জানিস। বীরপূজার দিন আবার ফিরে আসছে ভারতে ; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের—হয়তো তোর বাবাকেই বিয়ে করতে হবে আমায়।

হাসি চলে এলো রান্নাঘরে। কৃষ্ণা শুয়ে শুয়ে কতকি ভাবছে!

উঠোনের গাছগুলো বৃষ্টির জলে ভিজছে। কৃষ্ণা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছিল। শরীর অসুস্থ থাকলে মানুষের মনে অনেক অহেতুক চিন্তা এসে জট পাকায়। সমস্ত দিন জ্বর ভোগের পর বিকেলের দিকে চোখ মেলে কৃষ্ণা দেখতে পেল, বাদল নেমেছে। গ্রীষ্মের প্রথম বাদল, ভারী সুন্দর লাগবার কথা ; মন-জুড়ানো মেঘ, গা-জুড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া—কাকা থাকলে কৃষ্ণা আজ কতোকি কবিতা বলতো, কতোকি রান্না করবার বায়না ধরতো, কতোকি গল্প শুনতে চাইতো কাকার কাছে।

ভারী নিশ্বাসটা আস্তে বের করে কৃষ্ণা গায়ের চাদরখানা ভালো করে জড়িয়ে নিল। জ্বরটাকে ওর শীঘ্র তাড়ানো দরকার। এমন করে শুয়ে

থাকলে চলবে কি করে! একটু জল খেতে হবে। উঠবার দরকার হোল না, দেখলো, হাসি এক গ্লাস জল মাথার কাছে রেখে গেছে। হাসি তাহলে বাড়ি চলে গেছে। বেলা এখন কতটা বুঝতে পারছে না কৃষ্ণা, বাবা খেয়েছে কি না, তাও জানে না, জ্বরের ঘোরে ও প্রায় অচেতন ছিল। বাড়ীতে কি কেউ নাই এখন? কৃষ্ণা আস্তে ডাকলো—হাসি? হাসি রয়েছিস?

না, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বাদলবৃষ্টি মাথায় করে বাবাই-বা কোথায় গেছে! কৃষ্ণা উঠে বসে জল খেল। পা'দুটো কেমন আড়ষ্ট লাগছে, কিন্তু ওর একবার ওঠা দরকার। ঘরের জানালা খোলা রয়েছে, বন্ধ করে না দিলে বৃষ্টির ছাঁটে বাবার বিছানাটা ভিজে যাবে। কাকার বইগুলো ভিজছে কি না, দেখতে পাচ্ছে না কৃষ্ণা। মনের উপর অসীম জোর এনে কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো। জানালাটা বন্ধ করতে এসে দেখলো, বাবার বিছানা ভেজে নি, বৃষ্টির ছাঁট এ জানালায় ঢুকছে না, কিন্তু ওদিকের জানালায় ছাঁট ঢুকে কাকার দামীদামী বইগুলো সব ভিজিয়ে দিয়েছে। আহাহা! কৃষ্ণা আঁচল চাপা দিয়ে উবুড় হয়ে পড়লো বইগুলোর উপর। কাকার আদরের বই, এতোটুকু ধুলো লাগলে কাকা কীরকম যে অস্থির হয়ে ওঠে, কৃষ্ণার মনে পড়ে গেল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কৃষ্ণা দেখেছে, কাকা যেমন যত্নে কৃষ্ণার চোখ-কান-নাক মুছে পরিষ্কার করতো, ঠিক তেমনি যত্নে বইগুলিকে পরিষ্কার করতো। কাকা আজ নাই, কিন্তু কৃষ্ণা তো রয়েছে; এখনো বেঁচে আছে কৃষ্ণা! কাকার আদরের বস্তু সে নষ্ট হতে দেবে না।

কৃষ্ণা উঠে বসে বইগুলো মুছতে লাগলো আঁচল দিয়ে। কাকার বিছানাটাও অল্প ভিজেছে—ভিজুক গে। কাকা তো আর শুতে আসবে না। কিন্তু কেন আসবে না? যতদূর জানে কৃষ্ণা, বাবার সঙ্গে এমন

কিছু কথা কাকার হয় নি, যাতে কাকা গৃহত্যাগ করতে পারে। তবে কি কৃষ্ণার জন্যই কাকা গৃহত্যাগ করে গেল? কেন? কৃষ্ণা কি আজ কাকার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে? কৃষ্ণাকে কাকা মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করতে পারলো না বলেই কি কাকার মনে ক্ষোভ জেগেছে? অথবা, কৃষ্ণা বড় হয়েছে, তাই কৃষ্ণাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়ে কাকা চলে গেল? কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত বড় তো আজো হয় নি কৃষ্ণা! কাকাকে নির্ভর করে সে লতার মত বেড়ে উঠেছে—কিন্তু মূলতঃ সে লতা। কোনোকিছু অবলম্বন না করলে সে দাঁড়াতে পারে না।

বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, ওরই মধ্যে আধভেজা হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালো অশনি। কাপড়চোপড় সামলে কৃষ্ণা বেরিয়ে আসতে আসতে বললো—আসুন, ভিজে গেছেন যে!

—তা হোক, তোমার জ্বর নাকি? এতো শুকনো দেখাচ্ছে?

—হ্যাঁ; কাকা কেমন আছে?

—ভাল আছেন! শোনো কৃষ্ণা, বিশেষ একটা দরকারী কথা তোমায় বলতে এসেছি! তোমার বাবা কারখানার সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ছেন, দেখলাম।

—হুঁ—কৃষ্ণা অপেক্ষা করতে লাগলো শুধু 'হুঁ' দিয়ে। অশনি বলে চললো,—উনি কারখানার কিছু শেয়ার কিনেছেন। এখুনি দেখলাম, এখানে একটা ব্যাঙ্ক চালাবার জন্য উনি পরামর্শ করছেন, তাছাড়া একটা ছাপাখানা, তার সঙ্গে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ। মানে, উনি এই ক'দিনেই এখানে চমৎকার জমিয়ে নিয়েছেন। বৃষ্টিতে এখন উনি হয়তো

বাড়ী ফিরতে পারবেন না, ভেবে আমি এলাম তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে……কিন্তু তোমার অসুখ……

—তা হোক, আপনি বলুন।

—তোমার বাবা অবিলম্বে ধনী হয়ে উঠবেন, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। তোমার জন্য হয়তো তিনি রাজা বা রাজকুমার……

—থামুন—কৃষ্ণা ধমক দিয়ে উঠলো—রাজা বা রাজকুমারের জন্য আমি মালা গেঁথে বসে নাই। মালা আমি কারোর জন্যই গাঁথি না—, এমন কি, আপনার জন্যও না।

—জানি—অশনি হাসলো রিক্ততার বিষাদময় হাসি—তোমার মাল্য পাবার যোগ্যতা আমার নাই কৃষ্ণা—কিন্তু যে পাবে, যে পেতে পারে, তার কাছে তোমায় পৌঁছে দিই কেমন করে! আশা করি, পৌঁছে দেবার অধিকারটুকু আমায় দেবে!

—না। মালা কাউকে দেবার যদি দরকার হয় আমার, তাহলে আমি নিজেই তার কাছে যেতে পারবো। হোক ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ, আমার অভিসার-পথ একাকীত্বের গৌরবে দীপ্ত থাকবে—অম্লান থাকবে অন্যের সহায়তা থেকে।

অশনি যেন রূঢ় আঘাত পেল একটু। বৃষ্টিটা আবার নামছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি—ছাঁচকোলের দিকে সরে দাঁড়াবার সুযোগে অশনি নিজেকে সামলে নিল—পরে বললো,—জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার খুবই কম কৃষ্ণা। জীবনের বাস্তব রূপ বড় কঠোর, বড় রুক্ষ।

—হোক! আমি চাইছি তাই। বড় গাছের আওতায় লতিয়ে লতিয়ে পাণ্ডুর হয়ে বেঁচে থাকতে আমার ইচ্ছে নেই। আমি চাই মুক্ত আকাশ, সোনালী সূর্য্যালোক, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা!

—বেশ! তোমার জীবনে হয়তো সেদিন সমাগত হোল। কাকামণি পরশু চলে যাবেন এখান থেকে।

—কোথায়? কেন যাবেন?—কৃষ্ণা অধীরভাবে প্রশ্ন করলো।

—কলকাতা! কারখানার মালিকরা ওখানে আরো বড় একটা কারখানা, তার সঙ্গে অন্য অনেক রকম ব্যবসায় করবেন; কাকামণিকে সেখানকার ম্যানেজার করে নিয়ে যাচ্ছেন।

—তার মানে? কাকা রাজি হোল?

—আপাততঃ হয়েছেন। মালিক মিঃ চ্যাটার্জি এমন কতকগুলো সর্ত্তে কাকাকে কারখানা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, যেখানে ধনিক-শ্রমিক ভেদ থাকবে না। ধন-সাম্যবাদ যেখানে পরীক্ষিত হতে পারবে পূর্ণভাবে। কাকার ওপর সেই এক্সপেরিমেণ্ট করবার ভার দিয়ে ওঁরা বলছেন যে, ওঁরাও যুগের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন।

—সব মিছে কথা ওঁদের। কাকাকে আস্তে আস্তে টাকার বিষ খাওয়ানোর মতলব। ধনী যারা, ধনীর ঘরে জন্মে যারা ধনের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কখনো শ্রমিক হতে চাইবে না—শ্রমিকের দুঃখ তারা কিছুই বোঝে না, বুঝতে চাইবে না—এ প্রস্তাব কাকার মনটাকে বিষাক্ত করে দেবার কৌশল। এখানে যেটা ওরা পারলো না, কলকাতার মায়াবিনী বাতাসে ওরা সেটা করতে চাইছে!

—কাকামণি সেটা বোঝেন। বোঝেন বলেই এই এক্সপেরিমেণ্ট উনি করতে চাইছেন। তাছাড়া, দেশের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে ওঁকে এবার যেতে হবে কৃষ্ণা। ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। আমাদের স্নেহে বদ্ধ করে অত বড় প্রাণটা আটকে রাখা উচিত নয়।

—আমরা ওঁর সঙ্গে যেতে পারি। আমি অন্ততঃ যাবো। আপনি কাকাকে গিয়ে বলুন, আমি যাবই!

—তোমার বাবা আপত্তি করবেন।

—না—তাঁর কোনো অধিকার নেই আমার উপর।

কৃষ্ণা কথাটায় এতো জোর দিয়ে ফেললো যে ওর অসুস্থ কানে যেন চীৎকারের মত মনে হোল। হাসি আসছিল জলে ভিজতে ভিজতে। কৃষ্ণার কথাটা শুনতে পেল।

—কার অধিকার নাই রে ?—বলেই কিন্তু অশনিকে দেখে থেমে গেল হাসি। কৃষ্ণা আস্তে বললো,—যমের। মৃত্যুর, যে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চায় কাকার কোল থেকে—বলতে বলতে উচ্ছ্বাসে, আবেগে ওর চোখ দুটো জলভরা হয়ে গেল,—কণ্ঠে ঘুমিয়ে থাকা সঙ্গীতের আকস্মিক জাগরণ—আমি বেঁচে থাকতে চাই, আমার সমস্ত সত্তাকে অতিক্রম করে আমি এগিয়ে যেতে চাই সেই পথে, যে পথের নিশানা কাকা আমায় দেখিয়েছে জন্মভোর। আমি জননী জন্মভূমির শৃঙ্খল চূর্ণ করবার জন্য ফুলের মালার কোমল বন্ধনকে অস্বীকার করবো, আমি স্নেহের নীড়কে ভেঙে ফেলবো—জীবনকে জ্বালাময় করে তুলবো জ্বলে থাকবার জন্যই—আমি যাবো, আপনি কাকাকে শুধু জানিয়ে দিন।

এতখানা উত্তেজনা ওর রোগদুর্ব্বল শরীরে সইছিল না, ও কাঁপছিল, পড়ে যেতে পারে, হাসি ত্বরিতে এসে ধরলো ওকে, হেসে বললো—যাবি, শরীরটা একটু ভাল কর।

—শরীর ভালই আছে! শরীরের জন্য চিন্তা করে আমি সংসারী হতে চাইনে হাসি। লাভ-ক্ষতির ভগ্নাংশ দিয়ে আমার জীবন গড়া নয়; রোগ আর আরোগ্য দিয়ে আমি জীবনকে ভোগ করতে আসিনি। আমাকে অতিক্রম করে যে পথ, সেই আমার পথ।

কৃষ্ণা আস্তে হাসির হাত ছাড়িয়ে নিজের বিছানায় এসে বসলো। এই দুদিন ওর জ্বর, কিন্তু কোনো চিকিৎসক আসে নি, কোনো ওষুধ

ও খায় নি। ওর অন্নের এতখানি অবহেলা এই প্রথম। অশনি শুধু চেয়ে দেখলো ওকে, তারপর ভিজে উঠোনে নামতে নামতে বললো, —আমি তোমার সব কথাই বলছি গিয়ে কাকামণিকে।

অশনি দৃষ্টির বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা শুয়ে পড়লো অসহায়তার অগাধ ক্লান্তিতে; মুহূর্ত্তের উত্তেজনা যেন ওর সবশক্তিটুকু হরণ করে নিয়ে গেছে; কিন্তু কৃষ্ণা চোখ মেলে আছে, নীল আকাশ থেকে ঝরছে বারিধারা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এর মধ্যে অশনি নির্ভয়ে চলে গেল। ওরা পুরুষ, ওরা পারে। নারী কি পারে না? পারে কি না, কৃষ্ণা পরীক্ষা করবে।

অশনি যখন বৃষ্টির মধ্যে কৃষ্ণার বাড়ী এসে কথা বলছিল, ঠিক সেই সময় কালীপদ কথা বলছিল ম্যানেজার নন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানায়। নন্দবাবু পরম সমাদরে কালীপদকে বসিয়েছে। কারণ তার ওপরওয়ালা থেকে এই রকম আদেশ আছে এবং তার নিজেরও একটু গোপন উদ্দেশ্য আছে কালীপদকে খাতির করবার। বৃষ্টিটা বেশ জোরে নামলো দেখে ম্যানেজার খুশী হয়ে বলে উঠলো,—এবার বোধ হয় বর্ষা নাগবে—, কি বলেন!

—না, এই তো গ্রীষ্মের সবে আরম্ভ।—বলে কালী যেন একটু চিন্তিত হয়ে চুরুট টানতে লাগলো। হালে দিনকতক হোল, ও চুরুট টানতে আরম্ভ করেছে। মোটা, দুপাশ ছুঁচোলো, সোনালী গয়না-পরা দামী চুরুট, তার পোড়া ছাইগুলো ঠিক হাতীর দাঁতের মত সাদা—গন্ধটা আধ মাইল দূর অবধি যায়। ম্যানেজার বলল,—বীজধান ছড়ানো যেতে পারে এই বৃষ্টির জলে, তাছাড়া ঝিঙে, কাঁকুড়, উচ্ছে, লাউ……

—হুঁ—কালী কথাটা কাটিয়ে দেবার জন্য মাঝপথে হুঙ্কারের মত শব্দ করে উঠলো। নন্দবাবু নিরীহ মানুষ, অন্ততঃ বর্তমানে তিনি ছা-পোষা গৃহস্থ,—চুপ করে গেলেন।

—অন্নং বহু কুর্ব্বীথ—গ্রো মোর ফুড—ফসল বাড়াও, ইত্যাদি নীতি-কথাগুলো আপনার মাথায় খুব জলজল করছে, দেখছি ম্যানেজার বাবু—কেমন ?

কালী হাসলো, কিন্তু ম্যানেজারের মুখে রা নাই ; কালী কি বলতে চায়, বুঝতে না পেরে সে বিপন্ন বোধ করছে। কালীর জোরাল ব্যক্তিত্বকে সত্যি প্রশংসা করা উচিত! ম্যানেজার মিইয়ে উঠছে। কালী বললে,—ওসব অভিধানের কথা নন্দবাবু। চামড়ায় বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখে কাচের আলমারীতে রাখলে বৈঠকখানার শোভা হয় এবং দরকারও। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভেও ওগুলো দরকার—কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে আপনি-আমি ওগুলো বাদ দেব,—শুনুন, ওগুলো হচ্ছে ইঙ্গিত।

—কিসের ইঙ্গিত ? ম্যানেজার বেয়াকুবের মত প্রশ্ন করে বসলো।

—বুদ্ধিমানরা বুদ্ধিমানদিকে ইঙ্গিত জানাচ্ছেন যে আর একটা সুযোগ এসে গেল—তাকে আনা হবে। অতএব এই সুযোগে যে-যা পার, করে নাও।

ম্যানেজার কিছু বুঝতে না পেরে কালীর পানে চেয়ে রইলো। কালী বলে চললো,—ঝিঙে-কাঁকুড়-উচ্ছে জন্মিয়ে আমাদের কিছু লাভ হবে না। ওগুলো যারা জন্মায়, তাদের জন্য আমাদের দরদী হাতকে দরাজ করতে হবে, দেখাতে হবে যে ওদের জন্যই দুশ্চিন্তায় আজ আমাদের চোখে ঘুম নেই। অতএব ওরা আসুক আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে। খদ্দরের টুপীর তলায় আমরা মাথায় বুদ্ধিকে

আড়াল করে আধময়লা পাঞ্জাবীর খোলা বুক ওদের কাছে এগিয়ে দেব—পাঞ্জাবীর হাতা ছুটো খুব লম্বা হওয়াই চাই, যেন হাতের চেটো ঢাকা থাকে, আঙুলের ডগা থাকে বেরিয়ে। আঙুল দিয়ে ছোঁব ওদের স্নেহভরে, আর হাতের চেটোয় চলে আসবে ওদের রুধির—বাকী কাজটা আমাদের টুপীঢাকা মস্তিষ্কের।—কালী মধুর মধুর হাসতে লাগলো।

ম্যানেজার নন্দবাবু এই রূপক কাব্য-কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। জোরে হাঁক দিলো চাকরকে—চা দিয়ে যা—ওরে ও নদীয়াচাঁদ!

—বুঝতে পারছেন না নন্দবাবু? এখানে একটা ব্যাঙ্ক খুলতে হবে। আপনি, আমি এবং আমাদের আরো দু'একজন তাতে টাকা জমা দেবেন। নতুন ব্যাঙ্ক অবশ্য আজকাল করা শক্ত—কিন্তু কোনো ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অনায়াসে খোলা যেতে পারে—আমি তার ব্যবস্থাও করেছি। তার সঙ্গে একটা ছাপাখানা এবং সাপ্তাহিক কাগজ, যে কাগজ এখানকার অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হবে আর তাতে থাকবে, ...কালী হাসলো—থাকবে আমাদের প্রোপাগ্যাণ্ডা, আমাদের গুণগান, আর রাজনৈতিক মোটামোটা খবর, তার সঙ্গে দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য আবেদন, এ্যাপিল। সরকার সম্বন্ধে দুটোচারটে শক্ত শক্ত কথা থাকা চাই-ই, যাতে লোকে বলবে, "বাঃ, আচ্ছা লিখছে"।

—তাতে লাভ! ম্যানেজার আবার বোকার মত শুধুলো।

—লাভ! আপনার বুদ্ধি দেখছি কিছুমাত্র খোলেনি ম্যানেজার বাবু! লাভ কোটিপতিত্ব।

ম্যানেজার একটুখানি ভেবে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো,

—ব্যাঙ্ক কি চলবে এখানে?

—চালাতে হবে। ভালো ব্যবসা চালাবার অত সহজ এবং সুন্দর

পথ আর নাই। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি নন্দবাবু—কাল একটা "ডিরেকটার্স মিটিং" কল করে ব্যবস্থাটা সব পাকাপাকি করে নেওয়া যাক। খদ্দরের ধুতি চাদর আছে তো আপনার এক সেট?

—না—খদ্দর আজকাল তো কিনতে পাওয়া যায় না। সুতো লাগে টাকায় যেন ক' তোলা!

—ওসব বাজে! খদ্দরের সুতোরও ব্ল্যাক মারকেট হয়। ব্ল্যাক মারকেট করবার জন্যই ওসব কথা আছে! কত চান আপনি খদ্দর? কি চান? মিলের ধুতিশাড়ী, কোট পাঞ্জাবীর সিল্ক—পোলাও এর সরু চাল, সরষের তেল, গাওয়া ঘি? পাবেন সবই, তবে একটু হাত ঘুরিয়ে। মাত্র এই কয়েকট বছরের মধ্যে দেশটা এমন চমৎকার ব্যবসার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, কাবুলে বসে তা জানতে পারি নি! এখানে সরষের মধ্যে ভূত থাকে —শত-সহস্রমারী হলে তবে চিকিৎসক হয়। সেবকের খাতায় নাম লেখালে তবে সেবা পাওয়া যায়,—মানে, ভেখ্ নিলেই ভিক্ষা মেলে!

কালীপদ হাসলো মৃদুমধুর; ম্যানেজার কতক বুঝলো কতক বুঝলো না, তাই বিনীত কণ্ঠে বললো—আপনার আইডিয়াটা খুলে বলুন স্যার।

—আঃ—কালী ধমকে উঠলো—দেখছেন না, মন্ত্রিমিশন, কংগ্রেস ইলেকশন, মধ্যবর্ত্তী সরকার, গণপরিষদ নির্ব্বাচন, হিন্দু-মুসলমান-শিখের দলাদলি, করপোরেশনের আর মিউনিসিপ্যালিটির ভোট-সংগ্রহ, বড় বড় লোকের কথার ফিরিস্তি, গ্রামে গ্রামে দল, ঘরে ঘরে মামলা, ভাইএ ভাইএ কাটাকাটি—তার সঙ্গে মন্বন্তরের, মহামারীর, বন্যার প্লাবন, এর ওপর শ্রমিক ধর্ম্মঘট, রেলে, ষ্টিমারে, মিলে-কারখানায়, নানাবিভাগে। বোঝা যাচ্ছে,—স্বাধীনতা লাভের সেন্টিমেণ্টকে উস্কে উস্কে সব পলতেটুকু প্রায় নিঃশেষ করে আনা হয়েছে—নতুন পলতে আর লাগাতে দেওয়া হবে না—নির্জীব নিস্তেজ হয়ে বাতিটা জ্বলবে যতক্ষণ জ্বলে—আলোর থেকে

আঁধার বেশি হচ্ছে—এই তো আমাদের সুযোগ! লোকোত্তর দয়ামায়া, সত্য-অস্তেয়-অক্রোধ-অহিংসায় ভরা জীবনবেদটাকে লোকায়ত্ত করতে আধুনিকতার উগ্রগন্ধী ইংরাজী ভাষার অনুবাদ;—যে বেদের অর্থ চাষার গান—যার যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বোধের ঘি-দুধ-মধু নষ্ট করা, যার সংস্কার সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রাচীনপন্থীর অলসতার জাড্য—যার ঐতিহাসিক মূল্য অর্ব্বাচীনের প্রলাপ, তাকে আর মানবার দরকার নেই—ওর নতুন অর্থ করে দিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গুরুদেবরা—জীবনে ত্যাগের দ্বারা নয়, ভোগের দ্বারা, ভোজ্যের দ্বারা যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জগতে—আজ তাঁরাই আমাদের আদর্শ।

কালীপদ কবি ছিল, ওর কথাগুলো তাই বড় বেশি মিষ্টিক্। কিন্তু ম্যানেজার বুঝলো—বুঝলো যে কালীর সংস্পর্শে এলে সে ধনীও হয়ে উঠতে পারে। জীবনের প্রথম স্বপ্ন দেশোদ্ধার আজ ম্যানেজারের মনে পড়ে না—আজ নতুন স্বপ্ন সে দেখছে, অথচ সে স্বপ্ন সফল তার হয়নি—হবার সম্ভাবনাও কম ছিল—কালীর প্রস্তাবটা তাই ওর ভালই লাগলো। অতঃপর কয়েকটা কথা আরো হোল চা খেতে খেতে—অত্যন্ত গোপনে। শেষে ম্যানেজার বললো—চমৎকার মেয়েটি আপনার! আমার ইচ্ছে, ওকে বৌ করে ঘরে আনি—ছেলের মারও ইচ্ছে। আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হলে সত্যি আমি খুসি হই।

—বেশ তো! ছেলে কি করছে আপনার? পড়ে?

—না, এখানেই চাকরী করে কারখানায়। তাকে চেনেন না আপনি? আমি ডাকি—ম্যানেজার ছেলেকে ডাকবার জন্য ডাকাডাকি করছে, কিন্তু ছেলে তখন বাড়ীতে নেই! কোথায় গেল এত বৃষ্টি-বাদলে?

—থাক-থাক, দেখলেই চলবে এর পর—বলে কালী উঠলো,

—আচ্ছা, আসি, নমস্কার।

কালী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বৃষ্টি ধরেছে, আকাশটা কিন্তু বড় ঘোলাটে।

কদিন থেকে তারাপদ খুব বেশি চিন্তিত; কৃষ্ণার জন্য চিন্তা তার আছেই কিন্তু তার থেকে বড় চিন্তা এসে জুটেছে ওর মাথায়—কলকাতার মিলমালিক মিঃ চ্যাটার্জির কাছ থেকে আমন্ত্রণ। মিঃ চ্যাটার্জি একখানা লম্বা 'প্রাইভেট এণ্ড পারশোন্যাল' চিঠি লিখে তারাপদকে জানিয়েছেন যে—

"কারখানা দেখতে এসে তিনি তারাপদর মত একজন সুযোগ্য দেশ-প্রাণ কর্ম্মীকে লাভ করেছেন—এর চেয়ে বড় আনন্দ তাঁর কাছে আর কিছুই নাই। তারাপদর অতুলনীয় শক্তি দূর মফঃস্বলের একটা ছোট কারখানায় ব্যয়িত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে—এটা তিনি চান না। আর চারিদিকে যে-রকম শ্রমিক ধর্ম্মঘট, সোস্যালিজম্, সাম্যমন্ত্র প্রচারিত হতে আরম্ভ হয়েছে, তাতে যুগের এই দাবীকে ঠেকিয়ে রাখার শক্তিও ধনিকদের ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই জন্য মিঃ চ্যাটার্জি এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব কয়েকজন ঠিক করেছেন যে—ক্যাপিটেলিষ্ট মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করে তাঁরা যন্ত্রশিল্পের একটা বিরাট কারখানা গড়ে তুলবেন কলকাতার কাছাকাছি একটা জায়গায়। সে কারখানায় শ্রমিক-ধনিক ভেদ থাকবে না—প্রাদেশিক গণ্ডিবদ্ধতাও থাকবে না তার—বর্ণগত বৈষম্যও থাকবে না। শ্রমই হবে সেখানকার দ্রব্যমূল্যমান এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমষ্টিগত ভাবে সেই বিরাট কারখানা চালাবেন। অর্থাৎ এক কথায় শ্রম-শক্তি মূল্যের সাম্যবাদের মূলনীতি এখানে পরীক্ষিত হবে। এর জন্য সব স্বার্থই মিঃ চ্যাটার্জিদের দল ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু

এই হতভাগ্য দেশে সে-রকম প্রণালীতে কারখানা চলবে কিনা, তাঁরা জানেন না—তাই তারাপদকে তাঁদের দরকার ঐ প্রণালীটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করবার জন্য। তারাপদই হবে সে কারখানায় পরিচালক। তারাপদ যেন অবিলম্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এসে কাজে আত্মনিয়োগ করে। মিঃ চ্যাটার্জির দল এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশের মধ্যে প্রথম, পাইওনিয়র হতে চান। তারাপদ যেন দেরী না করে।”

চিঠিখানায় ছিল আরো অনেক কথা। অনেক ভেদনীতির ইঙ্গিত পেল তারাপদ সে-চিঠি বিশ্লেষণ করে এবং অনেক কদর্য্য মতলবও, কিন্তু তারাপদ আজ সত্যি চলে যেতে চায় এদেশ, এই চিরদিনের স্নেহ-ক্রোড় ছেড়ে; তাই সে এতো চিন্তিত। চলে সে যাবে, কিন্তু এই কারখানার ব্যাপার নিয়েই যাবে কিনা, সেখানে গিয়ে জড়িয়ে পড়বে কি না, এবং গেলে কি ভাবে কি করবে, তাই ভাবছে সে।

মিঃ চ্যাটার্জির মনের আভ্যন্তরীণ ইচ্ছেটা বুঝতে তারাপদর দেরী হোল না; ধনিক কোনদিন শ্রমিকের গণ্ডীতে নেমে আসতে চাইবে না যতক্ষণ জোর করে তাদের না নামিয়ে দেওয়া হবে। মিঃ চ্যাটার্জির ঔদার্য্য এবং ত্যাগ-স্বীকারের কথাগুলির অন্তরালে লুকিয়ে আছে গভীর একটি মতলব,তারাপদকে ক্যাপচার করার মতলব। অর্থাৎ চার ফেলে মাছ ধরার মত ধীরে ধীরে বড় চাকরী দিয়ে,বড় খাতির দিয়ে, মোটা এলাউন্স দিয়ে, গাড়ী-ঘুড়ি-বাড়ী ইত্যাদিতে বড়লোক করে তুলতে চান—তার সঙ্গে তারাপদর গঠন-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিরাট একটা শ্রম-কেন্দ্রও গড়ে তুলতে চান। তার কাজ শেষ হলেই তারাপদকে তিনি খোসার মত ছুড়ে ফেলে দেবেন। এতটা বুঝেও কিন্তু তারাপদ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার কথাই ভাবছে; বড় লোক হবার জন্য নয়, বড় কাজ করবার চেষ্টায়। নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারার মত আত্মবিশ্বাস তার আছে।

চিরব্রহ্মচারী, বন্ধনহীন ব্যক্তি সে। যে-প্রবল স্নেহের বন্ধন তাকে আটকে রেখেছিল, সে বন্ধন কৃষ্ণার কোমল মুখ। আজ তারাপদর জীবন থেকে সে মুখ সরে গেছে—হয়তো সুদৃঢ় আশ্রয়ে সে আরো পুষ্ট, পরিণত হয়ে জীবনকে সফল করে তুলতে পারবে, তবু তারাপদর কাছে এখনো কৃষ্ণার চিন্তাটাই প্রবল বাধা। কে জানে, কালীপদর সাঁওতালী গোঁ কি রকম্ ভাবে লালন করবে কৃষ্ণাকে! কোথায় কোন্ অযোগ্যের হাতে তাকে তুলে দিয়ে চিরজীবনের জন্য অসহায় করে দেবে! এ ভাবনাটাও হয়তো এড়িয়ে যেতো তারাপদ। কিন্তু অশনির মুখে সে শুনতে পেল, হাসি রয়েছে তাদের বাড়ীতে এবং বেশ জমিয়েই রয়েছে সেখানে। হাসির মা-ও যাচ্ছে-আসছে। তারাপদ অসাধারণ বুদ্ধিমান। প্রাপ্তযৌবন কুমারী হাসিকে কেন তার মা এবং মামা যেতে দেয়, কেনই বা কালীপদ সেটা সহ্য করে,—বুঝতে তারাপদর দেরী লাগল না। কৃষ্ণার মুখখানা মনে পড়ে চোখে জল ঝরে পড়লো ওর।

স্নেহের বন্ধন কি সাংঘাতিক! যে তারাপদর জীবনে দেশের মঙ্গল-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই স্থান পায় না, সেই তারাপদ আর্ত্ততায় আকুল হয়ে উঠলো। ওর মনে পড়তে লাগলো, পাঁচ বছরের কৃষ্ণা ওর কোলে মুখগুঁজে শুধুতো—সবারই যে মা আছে, কাকামণি, আমার মা কৈ?

—আমি! আমি যে তোর মা রে—তারপদ উত্তর দিত, চুমা দিত ঠিক মার মতন। ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে অবলম্বন করে তারাপদ জীবনের পথে চলে এল; ওকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের পথে চলবে, এই ছিল আশা। সে-সম্ভাবনা পরিপূরণের পথে আজকার অন্তরায় আকস্মিক শুধু নয়, অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তারাপদ কি কিছু করতে পারে না? নানাদিক দিয়ে বিষয়টা ভেবে দেখলো তারাপদ—

কিছুই করতে পারে না সে। কৃষ্ণার অদৃষ্ট এর পর কি ভাবে কোথায় তাকে নিয়ে যাবে—কোন কিছুতেই সেটা জানা সম্ভব নয়। অথচ কৃষ্ণা তার হাতে গড়া—কৃষ্ণা তার আদর্শের মূর্ত্ত প্রতিমা—কৃষ্ণা তার মানস-লোকের সৃষ্টি······তারাপদ চোখের জলটা সমলে নিল।

প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় বসে ছিল সে এতক্ষণ। সামনের রাস্তা দিয়ে কারখানার মজুররা যাচ্ছে আসছে। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা-ধুলো করছে অদূরে—অবিশ্রান্ত! ওদের পানে চেয়ে তারাপদর মনে পড়তে লাগলো কৃষ্ণার ছেলেবেলাকার কথা—কৃষ্ণার আদর-আব্দার-অভিমান—কৃষ্ণার আশা-উদ্দীপনা—কৃষ্ণার উপলব্ধি, আদর্শবোধ!—কিন্তু এভাবে কৃষ্ণার চিন্তায় সময় কাটিয়েও কোন লাভ নেই, তারাপদ সে-দিকটাও ভাবলো। নিয়তির মহারহস্যে মানুষের অসহায় জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে—কোথায় কে কখন তলিয়ে যাবে, কে কখন ভেসে উঠবে, কারো জানা নেই। এইখানে এসেই মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে স্তব্ধ হতে হয়। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আকস্মিকভাবে আঘাত করে' সব পরিকল্পনা চূর্ণ করে দিয়ে যায়; অসহায় মানুষ সেদিন অনুভব করে—সে কত ক্ষুদ্র।

তবু মানুষ তার প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের সুদুর্গম শব-সাধনার পথে, মৃতকে অমৃত করবার জন্য—জড়কে চেতন করবার সাধনায়। তারাপদকেও যেতে হবে। বিশাল এই ভারতের অতিক্ষুদ্র একটি গ্রামের ক্ষুদ্রতম অধিবাসী সে। কিন্তু সে তার রক্তে অনুভব করে অখণ্ড ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরবগাথা! পাঁচ-দশ শতাব্দীর ইতিহাস নয়—যুগযুগান্তরের ইতিহাস-বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-পাঁচালীর ঐতিহ্য; স্মরণাতীত কালের শ্রুতি-স্মৃতি। স্বদেশের মুক্তি-সাধন-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে সে শহীদ হবে। স্বাধীনতা-হীনতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ, অনপনেয় কলঙ্ক নৈতিক অধঃপতন। আজ সারা

পৃথিবীতেই ঘটেছে নৈতিক শৈথিল্য; কিন্তু ভারতে যেন অতিরিক্ত। মুক্তি-সংগ্রামের মুক্তদ্বারপথে তাদের মানবত্বের ব্যাভিচার জাতিকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার গৌরবে, ত্যাগের তপস্যায়, সত্যের জ্যোতির্ম্ময়তায় ওদের মনকে অলঙ্কৃত করবার কোনো প্রচেষ্টা নাই কারো—শুধু স্বাধীনতা-হীনতার বাঁধা বুলি ঝেড়ে ওঁরা যে যার পথ করে নেবার চেষ্টায় ফিরছেন। সর্ব্বত্র দুর্নীতি, সকল ব্যাপারে অসাধুতা, সকল কথায় অসত্য। স্বাধনীতা চাই—দীর্ঘ দীর্ঘ হাজার বছরের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, কিন্তু মনের নৈতিক নিষ্ঠার স্বাধীনতা যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন! তারাপদর চিন্তাধারা বাঁক ফিরলো।

দেহে যারা দুর্ব্বল,মনে যারা বিলাসী—মননে যারা অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাস-বাদী, স্বাধীনতা পেলেও তারা রাখবে কেমন করে? দেশরক্ষাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে এরা হিংসবাহিনী অথবা অহিংসবাহিনী গঠন করবে, তাই নিয়ে ঝগড়া করে। ওরা ভেবে দেখে না যে দেশরক্ষা ব্যাপারটা হিংসা বা অহিংসা পর্য্যায়ে পড়ে না, আত্মরক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু ওরা স্ব স্ব নেতাকে তোষণ করতে চায়।

অখণ্ড ভারতের নেতা হিসাবে যাদের সম্মান—কাগজের স্তম্ভে যাঁদের নাম দেবতার পর্য্যায়ে পাঠ করতে হয়, প্রাদেশিকতা থেকে তাঁরাও মুক্ত নন। আপনার ধর্ম্ম, আপনার দল আর আপনার স্বার্থটাই বড় হয়ে উঠেছে,—মানুষকে নীতির পথে, সত্যের পথে, নিষ্ঠার পথে চালাবে কে? উত্তেজিত হয়ে উঠলো তারাপদর মনটা ক্রমশ। আকাশের পানে চেয়ে সে উদ্যত করলো মুষ্টি, কার উদ্দেশে, কে জানে! কিন্তু ওর মুষ্টি উত্তোলনের নির্ব্বুদ্ধিতা ওকে আত্মসম্বৃত করে তুললো তন্মুহূর্ত্তেই। কার উদ্দেশে এই বজ্রমুষ্টি? দেশের মানুষের উপর এই ক্ষোভ পোষণ করবার কি তার

অধিকার! কতটুকু কি করেছে সে দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের মানুষের জন্য? স্বাধীনতাহীন দেশ ধীরে ধীরে নির্বীর্য্য হয়ে গেছে; ধীরে ধীরে গোলামের জাতে পরিণত হয়েছে, অসূয়া আর বিদ্বেষে বিষাক্ত হয়েছে, দুর্নীতিতে আর দুর্গতিতে অভ্যস্ত হয়েছে—তার প্রতিকারের উপায় কিছুইতো করেনি তারাপদ? করবার চেষ্টাও করেনি। মুষ্টি কার উদ্দেশে তুলবে সে! স্বরবে মনের মধ্যমে নামিয়ে তারাপদ এগিয়ে চললো একদিকে। একটা অশত্থগাছের নীচে দারয়ানরা পাথরের একটা নুড়ি-বসিয়ে পূজা করে। মাত্র বছর তিনেক হোল ঐ ঠাকুরটি স্থাপিত হয়েছে নদীধার থেকে শিবলিঙ্গবৎ ঐ পাথর কুড়িয়ে এনে। ঐ পাথরটির ইতিহাস কি? কোন্ অনাদিকালে, হয়তো পৃথিবীর প্রথমতম প্রভাতে কোন্ সুদূর শৈলশিখর থেকে ও যাত্রা করেছিল ওর বিশাল, কর্কশ, কুৎসিত দেহখানা গড়াতে গড়াতে। আঘাতের বেদনায়, অপঘাতের সম্ভাবনায় ও থামে নি—নিজেকে ধীরে ধীরে মসৃণ, সুন্দর, সংস্কৃত করে এনেছে—তাই আজ ও পূজা পায়। পূজা পাবার এই যোগ্যতা অর্জন করতে ঐ পাথরটিকে যে স্মরণাতীত সাধনা করতে হয়েছে; তা ভাবলে মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওর সাধনা সত্য,—ওর সিদ্ধি প্রত্যক্ষ!

তারাপদকেও যেতে হবে, দূর দুর্গম পথ পার হয়ে সাধনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে, সিদ্ধির পাদমূলে। বাধা এবং বন্ধন তার আজ আপনি খসে গেছে—কিন্তু, সত্যি কি খসেছে? দূর থেকে অশনিকে দেখতে পেয়ে তারাপদ থমকে দাঁড়ালো। অশনিও সাইকেল থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়ালো তারাপদর সম্মুখে। কথা কিছুই বলছে না। তারাপদ বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলো—দেখা হলো তো কৃষ্ণার সঙ্গে?

—হ্যাঁ! ওর জ্বর হয়েছে। এখন জ্বর বেশি নাই; তবে বড্ড রোগা

দেখলাম। আপনার দাদা বাড়ী ছিলেন না—হাসি দেবী রয়েছেন, দেখলাম—উনিই দেখছেন কৃষ্ণাকে !

—হুঁ—তারাপদ মাটির পানে চাইলো নিবিষ্টভাবে। মাটি-মার মধ্যে যেন ও কৃষ্ণার জন্য কাউকে অনুসন্ধান করছে। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললো—আমি চলে যাচ্ছি শুনে সে কি বললো ?

—বললে, সেও যাবে—সে যাবেই। আপনি যেন তাকে নিয়ে যান।

—হুঁ—তারাপদ আবার মাটির দিকে চাইলো। বাধা আর বন্ধন তো তার ছিন্ন হয় নি ! বন্ধনকে অতিক্রম করে সে যেতে পারে না। বন্ধন নিয়েই তাকে যাত্রা করতে হবে ; কিন্তু সে-যাত্রা কি তীর্থ-যাত্রা হবে ?

—আমিও যেতে চাই আপনার সঙ্গে !—অশনি বললো তারপদর চিন্তাকে বিপর্য্যস্ত করে। ব্যাকুলভাবে তারাপদ ওর পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ ; পরে বললো—তোমার যাওয়া তো সম্ভব নয় অশনি ! তোমার বাবা-মা, তাঁদের উপর কর্ত্তব্য তো আছেই। এখানে এই শ্রমিকদের উপর, আর এই হতভাগ্য দেশের উপর তোমার কর্ত্তব্য অগাধ। তোমাকে এই জন্যেই আমি এখানে রেখে যেতে চাই। সবাই চলে গেলে এদের দেখবে কে ? এদের জন্য এমন একজন থাকা দরকার, আপনার সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে যে ওদের মঙ্গল করবে।

—আমি তেমন ত্যাগী নই, কাকামণি—ততখানি শক্তি নেই আমার। আমার তপস্যা স্বার্থ-কলুষিত, সঙ্কীর্ণ !—অশনির দৃষ্টিতে করুণ আবেদন তার সঙ্গে আত্মগ্লানিও আছে হয়তো। তারাপদ নীরবে দেখলো কিছুক্ষণ।

—তুমি ভুল করছো অশনি ! কৃষ্ণাকে আমি মানুষ করেছি কারো ব্যক্তিগত জীবনের প্রিয়া হবার জন্য নয়—সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রেরণা

যোগাবার জন্য। জাতির তুমিও একজন। তাই তোমাকেও তার চরিত্র অভিভূত করেছে। কিন্তু তুমি যদি তাকে নিয়ে নীড় বাঁধবার কল্পনা করে থাকো তো ভীষণ ভুল করবে। তুমি—অশনি শক্তিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃষ্ণা অনন্ত আকাশের অদৃশ্য রশ্মি, সে একটা আইডিয়া, একটা জ্বালাময়ী অনুভাব মাত্র।

—কিন্তু বাস্তব কৃষ্ণা ?

—নাই। তার বাস্তব সত্বাকে আদর্শের সাধনায় সে অবলুপ্ত করে দিয়েছে—যেমন করে মহাযোগী তার মানসপদ্মকে মহত্তম সত্বাতে লয় করেন, মিলিয়ে দেন সকল কামনা-বাসনা সর্ব্বকামনার অতীত বস্তুতে, অতিন্দ্রিয়গত পরম-ইন্দ্রিয়ে।

তারাপদ থামলো, কিন্তু ওর উচ্ছ্বসিত কথাগুলি অশনির কানে বাজতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। কয়েক মিনিট দুজনেই নীরবে আপন আপন চিন্তায় বিভোর। হঠাৎ অশনি বলে উঠলো—

—কৃষ্ণা আইডিয়া-অনুভাব, কিন্তু তার সে অনুভাবকে রূপান্তরিত করবে কে ?

—তুমি, তোমরা—তারাপদ উত্তর দিল আস্তে—তারই জন্য তোমাদের মধ্যে তার অনুভাব সঞ্চারিত হয়েছে। বিবাহিত জীবনের গণ্ডিবদ্ধতায় কৃষ্ণার সত্বাকে কালো করতে চেও না অশনি ; বিবাহ সাধারণের জন্য ; কৃষ্ণা অসাধারণীয়া।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অশনির মনের মধ্যে কে যেন অশনির আঘাত হানছে। তারাপদই বললো—তুমি ভাবছো, কৃষ্ণার মত ছোট্ট একটা মেয়ে কেমন করে, কোথায় গিয়ে কি কাজ করবে ? আমি বলছি, —সে করবে ; কাজ করিয়ে নেবে তোমাদের দিয়েই। সে কাজের উৎসভূমি,—শক্তিরূপা। যে শক্তিরূপা দেবী অগ্নির দাহনশক্তিতে,

জলের শীতলতায়, বায়ুর বহমানতায় বিরাজমানা, কৃষ্ণার মধ্যে সেই শক্তি-রূপার আবির্ভাব হবে। তার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরাই করবে কাজ—এইভাবেই আমি তাকে গড়েছি অশনি। তাকে পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমায় পাবার আইডিয়া তুমি ত্যাগ কর।

—কিন্তু ওর বাবা যদি সেই গণ্ডিতেই ওকে আটকে ফেলেন বিয়ে দিয়ে?

—পারবে না। ওর বাবা স্নেহ-মমতা দিয়ে হয়তো কিছুদিন ওকে আটকাতে পারতো—জোর করে ওকে আটকানো যাবে না। ওকে তার বাবা এখনো চেনেনি, তাই হয়তো সে চেষ্টা করবে; কিন্তু কৃষ্ণা সে বন্ধন সইবে না।

—আমি কি তাহলে এইখানেই পচে মরবো? আপনারা চলে গেলে কি নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকবো?—অশনির কণ্ঠস্বর বেদনাতুর।

—আমাদের আদর্শ এবং অসমাপ্ত কাজ নিয়েই থাকতে হবে। যদি এখানকার কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করতে পার তাহলে বহির্জগৎ থেকে আসবে তোমার আহ্বান—তখন যেও সেখানে।

আবার কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরবে হাঁটতে লাগলো। তারাপদ বললো, —এখানে অবস্থাটা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠছে অশনি—অসহ্য হয়ে উঠবে ক্রমশঃ। আমার দাদা তোমার বাবাকে হাত করেছেন; অশ্বিনী বাবু তো তার হাতের মুঠোয়। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, দারোগা-পুলিশও হাতে এসে যাবে—তারপর চলবে ধনিকের বিজয়রথ দরিদ্রের বুকের পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়ে। তারই আয়োজন চলছে, ষড়যন্ত্র হচ্ছে ব্ল্যাকমারকেটের, ধাপ্পাবাজির, ধোঁকাবাজির। এই দেশের দুর্ভাগ্য এই যে যারা একদিন থাকে সর্ব্বত্যাগী বীর-সন্ন্যাসী, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে উন্মুখ—তারাই পরে হয় সর্ব্বভুক দস্যু—কিন্তু থাক সে কথা—দেশের সেবা করবার জন্য

আমায় যেতে হচ্ছে দূরে—তোমায় রেখে যাচ্ছি আমার আশাদীপটুকু এখানে জ্বালিয়ে রাখবার জন্য। আশা করি, তুমি অপারক হবে না।

অশনি নীরবেই রইল। তারাপদ ওর মুখের পানে চেয়ে বললো, —কৃষ্ণাকে পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় অশনি, একটা জন্মে সে যোগ্যতা তোমার নাও আসতে পারে। যদি আসে, তবে. পাবে। মনে রেখ, কৃষ্ণা শুধু নারী নয়, নরের মানসী সে।

কালীপদর কথা বলার মধ্যে একটা বিদ্রূপের সুর লক্ষ্য করবার বিষয়। যে-নীতি এবং যে-কাজ সে আজ করতে যাচ্ছে, তাতে তার মনের সমর্থন কতখানি—ঐ কথা বলবার ভঙ্গী আর ভাষা বিশ্লেষণ করলে তা ধরা যেতে পারে কিছুটা। কালীপদকে বুঝতে হলে সেই বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। লোকটা জেদী, গোঁয়ার, কিন্তু লোকটা একদিন ছিল ত্যাগী, কর্ম্মী। আজ সে ধনী হতে চায়, সুখভোগে দিন কাটাতে চায়; একদিন চাইতো শুধু স্বদেশের মঙ্গল, স্বজাতির কল্যাণ, সারা ভারতের স্বাধীনতা! আজ ওর পরিবর্ত্তনের মূলে যে-দুঃখ-বঞ্চনার ঘুণকীট, যে লোভ-পাপের প্রশস্ত পথ—তাকে আশ্রয় করতে ওর সজাগ মন সতত চেষ্টিত থাকলেও ওর রক্তের গভীর অভ্যন্তরে রয়েছে দুর্ব্বিসহ ক্ষোভ—জাতীয় জীবনকে সহস্র রকমে বঞ্চিত রিক্ত দেখার গ্লানি—জাতীয় কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণগুলির উপর জাতির অবহেলা, স্বরাজ্য-সাধনার বড় বড় ফাটলে পঙ্কিলতার বিষম বিষধর। কালী ভাবে—সবাই, অন্ততঃ অনেকেই প্রথম জীবনে দেশকর্ম্মী, পরজীবনে দেশনেতা, এবং তৎপর জীবনে দেশের একজন অ্যারিষ্টক্রেট্ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। সকলের না হলেও অনেকেরই কারাবরণ ভোগ-সুখ লাভের সিংহদ্বার, অর্থার্জ্জনের

অবারিত মাণিকোঠা। কালীই বা তাহলে সেটা না করবে কেন? বঞ্চনার ব্যথাকে প্রাচুর্য্যের প্রলেপে জুড়োবে না কেন? কিন্তু কালীর রক্তের গভীরে আছে স্বদেশের গ্লানির জন্য বেদনাবোধ, যার উত্তাপ এখনো ওর ধমনিকে উত্তপ্ত করে রাখে; আজো যা ওকে জেদী এবং গোঁয়ার করে রেখেছে। ওর মর্ম্মের মূলদেশে সঞ্চিত এই গ্লানিই ওর মুখে ফুটে বেরয় বিদ্রূপের ভাষায়—বিদ্রোহের প্রচ্ছন্ন সুরে। কালীর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের বিষয় হয়তো কালী নিজেই জানে না—কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব আছে—অত্যন্ত প্রবলভাবেই আছে। যথাকালে হয়তো জেগে উঠবে ভৈরব গর্জনে।

নন্দবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে কালী ফিরতি পথে এসে ঢুকলো অশ্বিনীর বাড়ীতে। বৃষ্টিটা থেমেছিল, আবার আরম্ভ হোল গুঁড়ি গুঁড়ি! অশ্বিনী সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো।

—এ্যাঃ! ভিজে গেছ বাবাজি! ওরে হাসি, একখানা শুকনো গামছা নিয়ে আয়!

—না, না, এমন কিছু ভেজেনি মাথা!—বলে কালী বসলো চৌকীটার উপর। হাসি বাড়ী ছিল না—এলো হাসির মা শুকনো একটা তোয়ালে নিয়ে। কালীর হাতে ওটা দেবার কথা, কিন্তু অশ্বিনীই বললো—মাথাটা ভালো করে মুছে দে কাদু—হাসি কোথায়?

—কৃষ্ণার জ্বর! হাসি তার কাছেই আছে—বলে কাদম্বিনী এগিয়ে এসে কালীর মাথা মুছে দিতে লাগলো। চল্লিশোর্দ্ধের কালীপদ বয়সে ছোট এবং দৃশ্যতঃ তরুণী কাদম্বিনীর কাছে এতখানি সেবা গ্রহণ করতে হয়তো লজ্জা বোধ করতো কিন্তু ওর লজ্জাটা ঘুচিয়ে সহজ করবার জন্যই হয়তো কাদম্বিনী বললো—বড্ড ভিজে গেছ বাবা, কাপড়খানাও ছেড়ে ফেল দিকিন! নতুন বর্ষার জল,—লাগলেই অসুখ করে।

কান্থ বেরিয়ে গেল শুকনো কাপড় আনতে। হয়তো তারও লজ্জা করছিল দাদার সামনে কালীর মাথাটা এমন করে মুছে দিতে, কিন্তু ওদের প্রয়োজন—প্রয়োজন কালীকে আত্মীয় করবার, তার সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার।

—কাপড় তেমন ভেজে নি! কিছু দরকার নেই শুক্‌নো কাপড়ের। কালী বললো বটে কিন্তু কান্থ ততক্ষণ একখানা ধোয়া ধুতি আর শুকনো চাদর এনে ধরেছে তার কাছে। বৃষ্টিটাও ঝম্‌ঝম্‌ করে সশব্দে আরম্ভ হয়ে গেল। শীত শীত করছে। কালী কাপড় ছেড়ে চাদরখানা গায়ে দিল নেহাত যেন ওদের সম্মান রক্ষা করতেই, কিন্তু কাপড় ছেড়ে ওর কী যে আরাম লাগছে, বলবার নয়। এমন যত্ন, এতখানি আত্মীয়তা কত কাল যে ও পায় নি! হাসি থাকলে সেবাটা আরো সুরভিত হোত নিশ্চয়ই,—তবে তার মা'র হাতের সেবাও খুবই ভাল লাগছে কালীর। নিজকে যেন যথেষ্ট তরুণ মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, তরুণ কালী নতুন শ্বশুরবাড়ী এসেছে। কিন্তু কালী নিজের চিন্তায় নিজেই যেন লজ্জা বোধ করলো। হাসি আছে কৃষ্ণার কাছে, খবরটা এইমাত্র শুনলো কালী। অতএব লজ্জাটা ওর বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার কথা নয়, হোলও না। ইতি-মধ্যে কাদম্বিনী চা আর হালুয়া তৈরী করতে বসেছে গিয়ে। কালী সুস্থ হয়ে বসলো।

—কোথায় গিয়েছিলে বাবাজি!—প্রশ্নটা করে অশ্বিনীর হয়তো লজ্জা করছে। সামান্য দুচার বছরের বড় হলেও অশ্বিনী খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে কালীর সঙ্গে—ডাণ্ডাগুলি খেলেছে, মারামারি করেছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন মানুষকে বুড়ো করে, আবার তরুণও করে। প্রয়োজনটাই বড়—এই-ই সত্য!

কালী দুচার কথায় জানালো ম্যানেজারের সঙ্গে তার কথোপকথন।

সব শুনে অশ্বিনী বেশ ভারিক্কি চালে অভিভাবকের মতই রায় দিল,—সব দিক সাম্‌লে উঠতে পারবে তো ? ভারতরক্ষা আইন বিধিবদ্ধ রয়েছে !

—ঐ জন্যেই তো আরো সুবিধে ! যা কিছু করবার এই-ই সময়। বুঝলেন না—(কালী "আপনি" সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছে এবার থেকে) আইন আছে সুবিধার জন্যই। আজকালকার আইন তো মানুষের জন্য নয়—আইনের জন্যই মানুষ। আইনকে বাঁচিয়ে যা-কিছু করুন—কোনো ভয় নেই। আইনতঃ আপনি খালাস পেয়ে যাবেন।

—তাতো বটেই বাবাজি ! তুমি ছোটবেলা থেকে দেশে দেশে ঘুরছো। জ্ঞানবুদ্ধি তো তোমার কম নেই। তাছাড়া, পাশকরা ছেলে....হ্যাঁ, একটা কথা......।

অশ্বিনী থামলো। কালীও আন্দাজ করতে পেরেছে, কথাটা কি, কিন্তু অশ্বিনীর মুখ থেকে সেটা প্রথম উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাই শুনবার অপেক্ষায় চুপ করে রইল আধ মিনিট, তারপর বললো—বলুন !

চা-হালুয়া এখনো তৈরী হয়ে আসেনি, অশ্বিনী হয়তো তারই জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু কালীর অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সে চিরদিন দ্রুত কাজ করবার পক্ষপাতী। কোনোকিছু শুনবার বা করবার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে যায়। প্রায় মিনিট দুই কোনরকমে ধৈর্য্য রক্ষা করে কালী বলে বসলো—কথাটা কি, বলুন ?

—মেয়ের বিয়ে তো তোমায় এবার দিতেই হবে ! তারাপদও বিয়ে করলো না। অথচ তোমাদের দুভাইএরই এমন কিছু বয়স নয়, যাতে বাকি জীবনটা হাতপুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কাটাতে পার।—তাই বলছিলাম, ...অশ্বিনীর থামবার উপলক্ষ হোল তার বোন কাদম্বিনী ; চা এবং হালুয়া নিয়ে সে এসে ধরলো কালীপদর সামনে, বললো—খাও ; হাত-পুড়িয়ে রেঁধে কি ব্যাটাছেলে খেতে পারে বাবা ! হাসি আমার

রান্নাবাড়ায় ওস্তাদ ; তাছাড়া, লেখাপড়া, শেলাই বোনা, অল্প গান বাজনা, সবই শিখেছে ? কৃষ্ণার সঙ্গেও খুবই ভাব ওর ; দেখ না, তোমাদের ওখানেই সারাদিন থাকে !

—হুঁ—কালীপদর স্বভাবসিদ্ধ হুঁঙ্কারটা একটু কোমল হয়ে বেরুলো ! বললো,—কৃষ্ণার বিয়ে দুএকমাসের মধ্যে দিতে পারবো না, তবে দিতে তো হবেই। তাই ভাবছি !

—ভাববার কি আছে !—কাদম্বিনী অতি সহজে বলে দিল—ভাবনার তো কিছু নাই বাবা, কৃষ্ণার মত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজপুত্তুর আসবে। তবে তোমাকে তো তারপর একবারে ভেসে যেতে দিতে পারি না আমরা ! হাসি বেশ বড়-সড় মেয়ে—চালাক, চটপটে, তোমার সঙ্গে কিছু বেমানান হবে না তার !

কালীপদর হুঙ্কারটা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়েই রইল। ওদিকে অশ্বিনী আরম্ভ করেছে বোনের কথার রেশ ধরে—তোমার আর এমন বয়স কি কালী ! চল্লিশও হয়নি এখনো। তাছাড়া শরীর, স্বাস্থ্য তোমার পঁচিশ বছরের যোয়ান ছেলের মত, আর বিয়ে না করলে চলবেই বা কেন তোমার ! হ্যাঁ, তারাপদর ছেলেমেয়ে, বৌ থাকতো তো আলাদা কথা ছিল ! বুড়ো-বয়সে নিজের পরিবার না থাকলে কে তোমায় দেখবে বাপু ! কথাটা আজকেই পাকা হয়ে যাক ; দিনও ভাল আছে; আমি আশীর্বাদ করে দিচ্ছি ! পাঁজিটা আন তো কাদু !

পাঁজি আনতে এক মিনিটও দেরী হোল না। কালীপদ তৎক্ষণ হালুয়া মুখে দিয়ে চিবুতে ভুলে গেছে ! অশ্বিনী পাঁজি দেখলো,—হেসেই বললো—এই সামনের পরশুই তো দিন রয়েছে একটা। তারপর ১৮ই, তারপর তেইশে, সাতাশে। ওঃ, বিস্তর দিন ! আঠারই তারিখটাই ভাল, দিন দশ সময় পাওয়া যাবে।

কালী কিছুই বলছে না। ওর স্বপ্ন এবং জাগরণ একাকার হয়ে গেছে ; কিন্তু ওকে ভাববার সময় দিতে চায় না অশ্বিনী—তাই বলেই চললো, —হাসির বাবা তো একটি পয়সাও দেবে না, সব খরচই আমাকে করতে হবে। আমিই বা পাই কোথায় ? তোমার বাড়ীর যে অংশটা কিনেছি, সেইটুকুই ইট আর ভিৎ সমেত হাসিকে যৌতুক দেব ; আর কিছু দিতে পারবো না বাবাজি। ঐ নিয়েই গরীবকে উদ্ধার করতে হবে !

কালী একবার তাকালো অশ্বিনীর পানে। কিন্তু অশ্বিনীর স্ত্রী ভেতরে শাঁখ বাজিয়ে দিল। কালীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল বোধ হয় !

অতিরিক্ত উত্তেজনায় কৃষ্ণা শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো অশনি যাওয়ার পর। হাসি ওর মাথার চুলে হাত বুলুচ্ছে, আর নির্ণিমেষে চেয়ে আছে মুখপানে।

—তুই কি সত্যি যাবি কৃষ্ণা ?—হাসি প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ !—কৃষ্ণা আস্তে উত্তর দিয়ে পাশ ফিরলো, তারপর আস্তে আবার বললো,—এখানে আমার কোনো কাজ নেই হাসি ; বিয়ে করে সংসার করতে আমি জন্মাই নি ! আমার আদর্শ আমার কাকা—ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের একনিষ্ঠ সৈনিক। আমি মরবো ভারতের স্বাধীন মৃত্তিকায় ; আমার মৃতদেহের চিতা জ্বালাবার মাটিটুকু নিশ্চয় সেদিন স্বাধীন হবে !

—তুই কি ভাবছিস, ভারত অচিরে স্বাধীন হবে ?

—না ! কিন্তু স্বাধীন হবেই। চল্লিশকোটি মানুষের জন্মভূমিকে দাসত্বে বন্দী করে রাখবার অধিকার কারো নাই ? ওদের বন্ধনরজ্জু জীর্ণ হয়ে গেছে !

—মন্ত্রীমিশন এসেছে, অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করছেন। হয়তো এবার আমরা স্বাধীনতা পেয়ে যেতে পারি!—হাসির কণ্ঠে আশার ঝঙ্কার।

—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—কৃষ্ণা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসিটা হাসলে, বললো,

—তুই আছিস কোথায় হাসি! এখনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তঃপুরেই যে! অত সহজে ইংরাজ দেবে স্বাধীনতা! অ-স-ম্ভ-ব!!! ওসব মিসন টিশন ফাঁকি-ফক্কিকার। ওর কারণটা শোন, বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন, নেতাদের কারাবরণ, তারপর যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাবীর্য্যের গৌরব-গাথা আসমুদ্র হিমাচল ভারতের বুকে যে বিক্ষোভের তুর্য্যনাদ জাগিয়েছে, যে বিপ্লব-বহ্নিতে আগ্নেয়গিরিবৎ হয়ে উঠেছে, তারই প্রকাশমুখটি চাপা দেবার কৌশল ঐ মিশন ইত্যাদি! সুভাষের মূর্ত্তি আজ জাতির অন্তরে হোমশিখাবৎ জ্বলছে—"জয়হিন্দ" বাণী এখন জাতির কণ্ঠে অগ্নি বর্ষণ করেছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড বিপ্লব জেগে উঠতে পারে—এখন এই ধূমায়িত অগ্নিকে যেমন করে হোক চাপা দিতে হবে—তাই ঐ সমস্ত দিব-দিচ্ছির অছিলায় সময় নষ্ট করে জাতীয় জাগৃতিকে জুড়িয়ে দেবার কৌশল।

—জাগৃতি কি সত্যি এতে জুড়িয়ে যাবে মনে হয়? —হাসি আবার শুধুলো!

—যাতে না জুড়িয়ে যায়, তাই আমাদের করতে হবে। আমরা কিছুতেই জাতিকে ভুলতে দেব না আমাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকারের কথা! কিন্তু ওরা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান। ওদের রাজনীতি, রণনীতি আর রক্ষণশীলতা এমনি ভয়ঙ্কর যে ওদের কৌশল কিছুটা সাফল্য লাভ করবেই!

—কি ভাবে ?

নেতায় নেতায় বিদ্বেষের কথা ইংরাজ জানে, তাই নেতার সাহায্য তাদের দরকার। ইতিমধ্যে সুভাষের নাম এবং আজাদহিন্দের গান খানিকটা জুড়িয়ে যাবে—মন্ত্রিমিশন কাঁঠালের আমসত্ত্ব দিয়ে ফিরে যাবে——ব্যস্! ওদিকে হিন্দু-মুসলমান-হরিজন-শিখ সমস্যা তো আছেই। আদৎ কথা কি জানিস হাসি ? এই দুর্ভাগা দেশটায় যারা রক্ষা করবার যোগ্যতা নিয়ে জন্মায়, তারাই ভক্ষণ করে। অবতারবাদের দেশ—তাই রাজনৈতিক নেতাও অবতার হয়, ভগবানকে দর্শন করবার পথ বাৎলে দেয়—আর দেশের লোক তারই মূর্ত্তি পূজো করে পরলোকে স্বর্গে যায়। —ভারতের চাই একজন রাজনৈতিক নেতা—অবতার তার বুকে বিস্তর এসেছে, আরতো দরকার নেই।—

·······কিন্তু আমি কারো নিন্দা করতে চাই না হাসি—এ আমার দেশের দুর্ভাগ্য। —পঁচিশ বছর পূর্ব্বের সেই সঙ্ঘবদ্ধ জাগরণের কথা স্মরণ করে কংগ্রেসের সেদিনের পরিচালককে সত্যি পূজা করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু আজ দরকার শক্তিশালী বীর্য্যবান স্বর্ব্বস্বত্যাগী বীর নেতার —যার নেতৃত্বের আহ্বান হবে ইর্‌রিজিষ্টিব্‌ল্‌!

কৃষ্ণা থামলো! কালীপদর মূর্ত্তি বাগানের ফটক ঠেলে ঢুকছে! হাসিও আর কোনো কথা শুধুলো না; আস্তে উঠে চলে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে যাবার আগেই এসে পড়ল কালী। হাসিকে দেখে শুধুলো, —কেমন রয়েছে কৃষ্ণা ?

—খুব দুর্ব্বল। জ্বর নাই এখন—বলে হাসি পাশকেটে বেরিয়ে গেল। কালীপদ কৃষ্ণার কাছ অবধি আর এল না। বারান্দার একদিকে, যেখানে ওর কাগজপত্র থাকে, সেইখানে বসলো গিয়ে। অশ্বিনীর সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা ওর পাকা হয়ে গেছে। আগামী আঠারোই

বিয়ে ওর হাসির সঙ্গে! বরপণ বাবদ অশ্বিনী সামনের কেনা কালীর বাস্তুটুকু ছেড়ে দেবে, তার সঙ্গে যে ইট এবং ভিৎগাঁথার খরচ হয়েছে, সেটাও ছেড়ে দেবে। বিনিময়ে কালী ঐ জমিতে বাড়ী তৈরী করিয়ে হাসির নামে দানপত্র করে দেবে—কারণ হাসির কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত। জমী-জমা কালী যা এর পর কিনবে, সবই হাসির নামে কিনবে! ভবিষ্যতে হাসি যাতে ভেসে না যায়, তার ব্যবস্থা কালীকে করতে হবে তো! এই সব কথাবার্ত্তা দুখানা কাগজে লেখা হয়েছে অশ্বিনী আর কাদম্বিনীর সামনে বসে! হাসিকে উপহার দেওয়া ফাউন্টেন পেনটাই কাদম্বিনী এনে দিয়েছিল লিখবার জন্য—ভুলক্রমে, কিম্বা ইচ্ছাক্রমে কে জানে; কালী সেটা বুকপকেটে গুঁজেই বাড়ী চলে এসেছে। মনটি ওর অপূর্ব্ব প্রেম রসে ভিজে রয়েছে এখন! ফর্দ্দটা একবার দেখলো—তারপর আগামী কাল সহরে গিয়ে যে বক্তৃতাটা দিতে হবে, সেটার কপিতে চোখ বুলিয়ে চললো-কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না। পকেট থেকে হাসির পেনটা বার করে কালীপদ বক্তৃতার কাগজের উপরেই লিখে ফেললো কবিতা :—

"মরমদেউলে মুরছিত ছিল, হাসি,
গুমরিতেছিল কথা
তুমি এসে আজ বাজালে যে মধু-বাঁশী—"

পরের কলিটার মিল খুঁজছে কালীপদ! কবিতা অনেকদিন লেখা ওর অভ্যাস নেই, তাছাড়া প্রেমের কবিতা লেখবার ঠিক বয়সটাও সে পার হয়ে এসেছে—কবিতাটা ভাল হচ্ছে না, এটা যেন বুঝতে পারছে কালী কিন্তু মধুবাঁশী বাজাবার দিন যেন ওর এখনো চলে যায় নি, আজ কবিতা লিখে সেটা ও প্রমাণ করবেই! নিবিষ্টমনে ভাবছে,—উজ্জলতা—স্বপ্নরতা কাজললতা, ইত্যাদি ভালভাল সব শব্দ মাথায় দল বেঁধে আসছে মিল

জোটাবার জন্য,—হাসি ফিরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো পেছনে; শাড়ীর খসখস আওয়াজে কালীপদ ফাউন্টেন পেন হাতেই তাকালো ওর দিকে, যেন অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে ধরা পড়ে গেছে! হাসি চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম-কোপে বললো,—চোর! কেন নিয়েছেন আমার কলম?

প্রেমিক কবি কালীপদ কি উত্তর দিল জানবার দরকার নেই। বিছানায় শুয়ে কৃষ্ণা শুনলো কথাটা; ওর মুখে ক্ষীণ একটু হাসি জেগেই মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ!

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারকে আজ অভিনন্দিত করছিল কৃষ্ণা। আজ ওর জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণ। ওর আদর্শ-পূজারী মন পূজ্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে—দেহকে অকারণ বন্দীত্বে ও আর রাখতে চায় না এখানে। কিন্তু বাপের সঙ্গে কোনো কথাই এখনো তার হয় নি। বাবা গেছে সহরে বক্তৃতা দিতে, এখনো ফেরেনি। ফিরবার ট্রেণও চলে গেল, শব্দ শুনলো কৃষ্ণা। কিন্তু কৃষ্ণা আর অপেক্ষা করতে পারছে না! ওর চঞ্চল মানসপাখী মুক্তির জন্য ডানা ঝটপট্ করছে—অথচ দেহে তার জ্বর, এবং বাহিরে বিরামহীন বৃষ্টিধারা। কিন্তু কাকা খবর পাঠিয়েছে, আজই রাত্রি বারোটার ট্রেণে সে কলকাতায় যাবে।

কৃষ্ণা একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লো বৃষ্টিধারার মধ্যেই—হাতে একখানা শাণিত ছুরিকা মাত্র। দরজায় শেকল তুলে বাঁশের ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত সে গিয়ে দাঁড়ালো যেখানটায় অশ্বিনীবাবু তাদেরই জমিতে ভিৎ গেঁথেছেন। ঐখানে ছিল একখানা মেটেঘর; কৃষ্ণা ছোটবেলা সেই ঘ'র খেলা করেছে। আজ সে ঘরের চিহ্নও নাই, কিন্তু কৃষ্ণার মনে তার স্মৃতি জাগরূক রয়েছে। কৃষ্ণা দুইহাত জোড় করে কপালে

ঠেকিয়ে নমস্কার করলো—মনে মনে বললো,—'হে আমার জন্মভূমি মা, তোমার বন্ধন মুক্তির জন্যই আমি আজ তোমাকে ছেড়ে গেলাম ; যদি কখনো তোমায় মুক্ত করতে পারি, তাহলে আবার ফিরে আসবো—নইলে এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা হোক ! আবার নবজন্ম নিয়ে যেন তোমার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য জীবন দান করতে পারি—এমনি জন্মে জন্মে মৃত্যুর পথ বেয়ে যেন তোমার মুক্তির সন্ধানে চলে আমার অভিযান·····"

আরো হয়তো অনেককিছুই বলতো সে, কিন্তু দেরী হয়ে যাবার ভয়ে এবং কারো নজরে পড়ে যাবার আশঙ্কায় কৃষ্ণা সতর্ক পদে এগিয়ে চললো। অশ্বিনীবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়েই যেতে হবে, সন্তর্পণে সেই পথটুকু অতিক্রম করছে কৃষ্ণা,—কে-যেন ভেতরের জানালা থেকে চাপা গলায় বললো—কৃষ্ণা !

চমকে উঠলো কৃষ্ণা, কিন্তু ভয় পেল না, দাঁড়ালো। হাসি ভেতর থেকে বলল—সত্যি তুই চললি কৃষ্ণা ? এই দুর্য্যোগ রাত্রি, অতটা রাস্তা একা যেতে পারবি ?

—হ্যাঁ—ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্য্যোগ মাথায় করেই যেতে হবে হাসি ! আরামের—পুষ্পাকীর্ণ পথ আমার নয়। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোল। বাবার যত্ন করিস, আর বলিস, যাবার সময় আমি তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে গেছি ; আমার জীবনের আদর্শের পথে চললাম আমি....

কৃষ্ণা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হাসি সেই নিকষ-কালো তিমির রাত্রির অদৃশ্য পথ পানেই তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর বললো,

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি—"

ওর নিশ্বাসটা উষ্ণ হয়ে বেরুচ্ছে। ওর অন্তরের অন্তরস্থ অগ্নিলেখা সুপ্তিভঙ্গের নিশ্বাস ছাড়ছে যেন—যেন ওর ইচ্ছাকৃত অচেতনতা ইচ্ছার

বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে উঠছে! বাইরে বিরামহীন বাদল আর বজ্রালোক; হাহাকার-করা বাতাসের দাপটে জানালার কপাট আছড়ে পড়ছে, হাসি শয্যাতলের আশ্রয়ে এসে বালিশে মুখ গুঁজলো—ওর যৌবনের বীর্য্য অবরুদ্ধ, ওর মানস-লোকের মূর্ত্তশ্রী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবেষ্টনীর অসহায়তায়! বিংশতি বর্ষের প্রদীপ্ত যৌবনকে গাঁঠছড়ার বন্ধনে আটকে রেখে ওকে সংসার করতে হবে কালীপদর সঙ্গে; যে কালীপদর বীরমূর্ত্তি ধ্যানে ছিল, তার সঙ্গে নয়, নিতান্ত বস্তুজগতের বিলাস-ব্যসনাসক্ত, চাপল্যে আর চঞ্চলতায়, সুখে আর সৌখিনতায়, সাধারণ এক কালীপদর সঙ্গে; —হাসির তরুণ মনের আদর্শ-স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু ওর নিয়তি, ওর বিধিলিপি, ওর জীবন-দেবতার নিদারুণ বঞ্চনা! অসহায় হাসি একবার মাথা তুলে দেখলো জানালা পানে। গভীর অন্ধকার, বিদ্যুতের জ্বালাময়ী ভ্রূকুটি আর বাতাসের হাহাকার! ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চেয়ে দেখলো হাসি, চাঁদ নাই, তারা নাই—নাই কোনো আশার জ্যোতিলেখা। সমস্ত আকাশটা গভীর কালো এক অদৃশ্য রহস্যের আবরণে আচ্ছন্ন, শুধু বিজলীর চমক সেই রহস্যকে গভীরতর করছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু কোনো উপায়ই হাসির নাই; রহস্যকে রহস্যই থাকতে হবে ওর জীবনে। জীবনকে জ্বালাময় করবার সাধনা ও কখনো করে নি। অতি সাধারণ শান্ত জীবনের সীমায় দু'একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ হয়তো কখনো আছড়ে পড়েছিল ওর, কিন্তু ওর সতর্ক অভিভাবক সাবধানে এড়িয়ে এনেছে ওকে। কখনো আঁচড় লাগতে দেয়নি। কিন্তু মন ওর জাগ্রত,—অনুভূতি ওর প্রখর এবং ইচ্ছা ওর গতিশীল। যে-কালীপদর কথা সে কৃষ্ণার কাছে শুনতো, সে-কালীপদ ছিল না-দেখা রহস্যে স্বপ্নদৃষ্ট বীরপুরুষ, দেশের জন্য মরণ-বরণকারী সহিদ—

হাসি তার কথা শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতো না, মনে মনে পূজা করতো; কিন্তু বাস্তবে যে-কালীপদকে সে দেখলো, তাতে তার তরুণী মন শুধু আহতই হোল না, বিজাতীয় ঘৃণায় গুটিয়ে গেল একেবারে। অথচ হাসিকে ওরই অঙ্কশায়িনী হতে হবে—এই বিধিলিপি। হাসি—সাধারণ হাসি দুটো-একটা চটুল কথা আর চঞ্চল ব্যবহার দেখিয়ে অনায়াসেই বুঝে নিল, কালীপদ শুধু বিলাসী-ব্যবসায়ী নয়, নারীলোভী কাপুরুষ। কোনো নারী তাকে ভালোবাসতে পারে—এমন বিশ্বাস করবার কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছে না হাসি! অথচ হাসির ভালবাসতে হবে ঐ কালীপদকেই। ঐ মুর্খ কালীপদ মনে করে, হাসি,—বিংশতি বছরের তরুণী হাসি—চত্তারিংশৎ বর্ষীয় কালীপদকে ভালবাসে। আহাম্মক!

হাসি হেসে উঠলো নিজের গোপন শয্যাতলে। ওর ঘরে ও একা, ওর যা ইচ্ছা ভাবতে পারে, যতখুসী হাসতে পারে—কিন্তু ওর ঘরে ঐ কালীপদই ভাগ বসাবে ওর বিছানায়—হাসির হাসিটা করুণ কান্নায় পরিবর্ত্তিত হচ্ছে—সেদিন হাসির হাসবার অধিকারও থাকবে না!

এর থেকে তারাপদ যদি হাসিকে বিয়ে করতো! কেন করবে? তারাপদকে পাবার কোন্ যোগ্যতাটা আছে হাসির! জীবনে সে একটাও স্বদেশের কাজ করেনি—একটা স্বদেশী গানও সে ভালো করে গাইতে পারে না; দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সবার নামও ওর ভাল জানা নেই! হাসি কি তারাপদর যোগ্য! কিন্তু হাসি একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে। তারাপদর আদর্শ সে কৃষ্ণার সঙ্গে মেনে চলতে পারতো; কৃষ্ণার মত না হোক, তার ছায়াও তো হতে পারতো হাসি—হবার চেষ্টা সে করেনি, পাছে তারাপদ মনে করে, তাকে বিয়ে করবার জন্য হাসির সেটা অভিনয়,—সেটা স্বাদেশিকতার ভাণ হাসির। কিন্তু আজ হাসির মনে হচ্ছে, তারাপদর মতন লোকের ঐ রকম মনে করবার

কারণ নেই, এবং মনে করলেও হাসির ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হোত। আজ সে কৃষ্ণার মত গৃহত্যাগ করতে না পারুক, মামাকে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারতো, কালীকে সে বিয়ে করবে না! কিন্তু আজ একথা ভাবা অবান্তর। হাসির অন্তরটা গুমরে উঠতে লাগলো কান্নায়। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না তার—ডাগর চোখ মেলে বাইরের দুর্যোগময়ী প্রকৃতিটা দেখছে।

প্রাণস্পর্শী-ভাষায় উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করলো কালীপদ :—বন্ধুগণ, যুদ্ধের ফলে কতকগুলি লোকের হাতে অপরিমিত-অর্থাগম হয়েছে; বড় বড় বিলাতী কোম্পানীগুলি আজ বহু দেশীয় ধনিক কিনে নিচ্ছেন; এঁরা সকলেই একটি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি! প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এঁরা যে দেশীয় শিল্প সম্ভারের প্রসার করছেন, তা ক্ষেত্রবিশেষে দেশের মঙ্গলজনক, কিন্তু···ভেবে দেখুন, এঁরাও শোষক শ্রেণীর অন্তর্গত! শুধু বিদেশী শোষকের স্থান অধিকার করছে দেশী শোষক—এরা আরো ভয়ানক। আমলাতান্ত্রিক সরকারের সহায়তায় এই সব স্বদেশী বণিক দেশের লোকের উপর উৎপীড়নে বিদেশী বণিকদেরও ছাড়িয়ে গেছেন—যুদ্ধের কয়টা বছরে আমরা তার বিস্তর প্রমাণ পেয়েছি চিনি, কাপড়, চামড়ার বস্তু, চাউল, গম, আর সরষের তেলের মূল্যবৃদ্ধি আর কালোবাজারী কসরতে! কিন্তু এই স্বদেশীওয়ালাদের জন্য দেশবাসী কতরকমে ক্ষতি স্বীকার করে ওদের প্রতিষ্ঠা করবার সাহায্য করেছে, আপনারা জানলেও হয়তো তেমন ভাবে জানেন না। বস্ত্র-শিল্পের প্রথম যুগে চটের মত মোটা কদর্য্য কাপড় আমরা দ্বিগুণ মূল্যে কিনে ওদের প্রেট্রনাইজ করেছি, বিদেশীবর্জন আন্দোলন এবং পিকেটিং করে কতলোক মাথা

কাটিয়েছে, জেল খেটেছে, স্বদেশী বিড়ি এবং সিগরেট খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে ; চার-পাঁচগুণ দাম দিয়ে স্বদেশী অব্যবহার্য্য জিনিষ কিনে ব্যবহার করেছে—কারণ তারা আশা করেছিল, দেশের শিল্প উন্নত হবে, এবং দেশবাসী এর শুভ ফল একদিন পাবে ; কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে মিলমালিকরা তার যে প্রতিদান দিলেন, তার ইতিহাস দেশবাসীর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা থাকবে। এঁরা কাপড়, চিনি, আটার বাজারে কে কতখানি মুনাফা শিকার করলেন, সামান্য অনুসন্ধানেই আপনারা তা জানতে পারবেন। আর এক কথা, বাংলার যে-সব বড় বড় বিলাতী কোম্পানী হস্তান্তরিত হোচ্ছে তার প্রায় সবগুলিই ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়রা কিনছেন—বাঙ্গালীর হাতে প্রায় কিছুই আসে নি—বাঙলায় বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে কেউ সাহায্য করে নি, বরং বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাধা জন্মিয়েছে। বিহার এবং উড়িষ্যায় যে-সব কলকারখানা বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার সবই যাচ্ছে ভিন্ন প্রদেশবাসীর হাতে, বোম্বাই, আমেদাবাদ কিম্বা ঐ রকম কোনো প্রদেশের আয়ত্তে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ আপনার অবশ্য-প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটাতে না পারলে প্রদেশগুলি কতো অসহায় হয়ে পড়ে, গত তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং বর্ত্তমান অন্নবস্ত্রের দুর্মূল্যতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাপড়ের জন্য বোম্বাই-আমেদাবাদের উপর নির্ভর করা যে কতখানি বিপজ্জনক, তার প্রমাণ আমাদের বর্ত্তমান বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ এবং অকথিত লাঞ্ছনা। অথচ আজ দেশে কংগ্রেস প্রচুর প্রতিপত্তি নিয়ে স্বদেশী শিল্প-পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন, কিন্তু দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের সুবিধামত স্থানে ছড়িয়ে না দিলে এই শিল্প-সংগঠন কার্য্য কখনই সুচারু হবে না—প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হবে না—এবং সব প্রদেশের লোককে কার্য্যক্ষম করাও সম্ভব হবে না। এর থেকে বড় কথা—এই

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনক্ষমতা থাকা উচিত সেই প্রদেশেরই লোকের উপর। নইলে প্রদেশান্তরের মালিকের হাতে লাঞ্ছনা অনিবার্য্য। কারণ বোম্বাইএর লোকের দ্বারা পরিচালিত বাংলার মিলের কাপড় এবং বোম্বাই থেকে আমদানী করা কাপড়ে মূল্যের তফাৎ খুব বেশি হবে না। এইজন্যই আমার মনে হয়—সব বড় বড় কলকারখানা ইত্যাদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান যতক্ষণ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত না হয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের প্রদেশের জন্যই আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো, ব্যাঙ্ক স্থাপন করবো, মিল প্রতিষ্ঠা করবো, মজুরকে অংশ দেব মালিকের সঙ্গে ভাগ করে। নইলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে—বিশেষ করে ভিন্ন প্রদেশের ধনীর হাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আটকে থাকবে—এই বিপদ সম্বন্ধে আমাদের আজই সতর্ক হওয়া উচিত……"

কালীপদর বক্তৃতা যারা শুনছিল, তারা সবাই শিক্ষিত ব্যক্তি—; বেছে বেছে তাদেরই আনা হয়েছে আজকার বক্তৃতার আসরে। একজন শ্রোতা কালীপদর প্রাদেশিক বিদ্বেষ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করলেন। কালীপদ তৎক্ষণাৎ তীব্র ভাষায় জানিয়ে দিল যে—তার বক্তৃতা কারো উপর বিদ্বেষপ্রসূত নয়; আত্মরক্ষার তাগিদ মাত্র। আর বিদ্বেষ যদি কারুর হয় তো ভিন্ন প্রদেশের বিদ্বেষ বাংলার ওপর সব থেকে বেশী!

কালীপদ নিদারুণ তীক্ষ্ণ ভাষায় বলতে লাগলো,—"যে বাংলার মাটিতে প্রথম স্বাদেশিকতার উদ্ভব, যে বাংলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সব থেকে বেশি রক্ত দিয়েছে, সব থেকে বেশী মৃত্যুবরণ করেছে, আজ সেই বাংলা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? যে-বাংলার বঙ্কিম-রঙ্গলাল-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ, যে-বাংলার উমেশচন্দ্র থেকে দেশবন্ধু পর্য্যন্ত, এমন কি আজকার দিনেও যে-বাংলার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সারা ভারতের গণচেতনা বিজয়গর্ব্বে স্পন্দিত

হচ্ছে, সেই বাংলাকে বঞ্চিত করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে আজ। বাঙ্গালীই স্বাদেশিকতার প্রবর্ত্তক, পরিচালক, পরিপোষক—এ সত্য শাসকের যতখানি জানা আছে, ভিন্ন প্রদেশেরও ততখানি জানা আছে —কিন্তু পাকা ফসলের দিকে ওঁরা সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে এসে ফসল কেটে ঘরে তুলতে চান। বাংলাদেশ তার হাজার সমস্যা নিয়ে মন্বন্তর আর মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে! পৃথিবীর মানুষ জানে, বাঙ্গালী-জাতিটাকে নিঃশেষ করতে পারলে, অন্ততঃ নির্বীর্য্য করতে পারলেই ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নৌকার হাল ভেঙে যাবে—তাই বাংলার উপরই তার দৃষ্টি রাহুর দৃষ্টি—তাই বাংলাতেই বারবার মন্বন্তর আর মহামারী।"

কালীপদ থামছে না, ওর অন্তরের আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেছে যেন—বলতেই লাগলো—"উচ্ছ্বাসপরায়ণ দুর্ভাগা বাঙ্গালী লাখ লাখ টাকা চাঁদা তুলে পাঠায়—নিজে থাকে অনাহারে—সেটাকা কোনো দিন বাংলার কারো জন্য একমুষ্ট অন্ন আনলো বলে জানা নেই। অসহযোগ, অহিংসা, পিকেটিং, বস্ত্রযজ্ঞ, লবণ-আন্দোলন, অগাষ্ট মুভমেণ্ট ইত্যাদি ব্যাপারে এবং আজাদ হিন্দ-দলে যে কত কত সোনার ছেলে, দেশমাতার কত রত্ন প্রাণ দিল, ইতিহাসে তা লেখা থাকবে না—কিন্তু মহাকাল জানেন, তার অর্দ্ধভাগ বাঙালীর ছেলে! —আজ সেই বাংলার স্থান কোথায়? জাতীয় জীবনে সেই বাংলা প্রায় একঘরে হতে চলেছে।—সবই অধিকার করবে বিদেশী আর প্রাদেশিক বণিক সম্প্রদায়। বাংলার কিছু নাই। কিছুই সে পেল না—এমন কি, আত্মাহুতি দানের গৌরবটুকুও পাবেনা হয়তো! —প্রাদেশিকতা কাদের বেশি ভেবে দেখ।"

আরো অনেক কিছুই হয়তো বলতো কালী; অন্তর ওর অবরুদ্ধ নদীস্রোতের মত গর্জ্জন করছিল যেন, কিন্তু কালীর বর্ত্তমান বিষয়ী-মন এবং হাসির হাসিমুখের স্মৃতিলেখা ওকে সামলে দিল। ওর মনে পড়লো, এখানে সে তেজোগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে আসে নি, স্বাধীনতা-হীনতার সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে এসেছে; অপ্রিয় সত্য এখানে অবান্তর। বুদ্ধিমান কালী বক্তৃতার সুরটাকে মোচড় দিয়ে ফিরিয়ে আবার স্বদেশের শিল্পোন্নয়ন, আর্থিক সংগতির সঙ্ঘবদ্ধতা এবং গণশক্তির সক্রিয় সাহচর্য্যের কথায় এনে ফেললো! কালীর বাচনভঙ্গী খুবই হৃদয়গ্রাহী, এবং যে-রকম ভাষায় সে বলছিল, তাতে তাকে বিশ্বাস না করে পারা যায় না। সর্ব্বোপরি তার বড় সার্টিফিকেট রয়েছে, সে একজন রাজবন্দী, দেশের জন্য দীর্ঘদিন কারাবরণকারী বীর সৈনিক! গণচেতনার পল্লবগ্রাহিতায় অহঙ্কারী, আত্মতোষণ-পরায়ণ শ্রোতা কয়জন কালীর কোম্পানীতে সত্যি সত্যি টাকা দিয়ে শেয়ার কিনলো, সাহায্য করলো!

প্রচুর পুষ্পমাল্য এবং প্রচার লাভ করে কালী বেরিয়ে এসে দেখলো—একটা কোম্পানীর অনেক ঝড়তিপড়তি মাল বিক্রী হচ্ছে এক যায়গায়! আধাদামে যাচ্ছে অনেক ভালো জিনিষ। কালীর সখ চাপলো একটা কিছু কিনবার—টাকাও হাতে এসে গেছে, কালী সাড়ে তিন হাজার টাকায় একখানা মোটর গাড়ী কিনে ফেললো—অশ্বিনীবাবুকে তাক লাগিয়ে দেবে, ম্যানেজারকে মুগ্ধ করে ফেলবে, আর হাসিকে ... হৃদয় জয় করে ফেলবে মুহূর্ত্তে তার!—কথাটা ভাবতে গিয়েও কিন্তু কালীপদর কবি-মন একবার ধাক্কা খেল—সত্যি কি মোটর দিয়ে রূপসী-হৃদয় জয় করা যায়? কালী তার নূতন কেনা মোটরের সাইড্‌কাচের আয়নায় একবার দেখলো নিজের মুখশ্রী—বিকৃত, কুৎসিৎ দেখাচ্ছে!

নূতন ড্রাইভার যোগাড় করে দিলেন ওখনকার লোকরাই ; কালী মোটরে চড়ে বাড়ী ফিরছে। রাত্রি তখন নটা বেজে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে, পথ অনেকটা, রাস্তা ভাল নয়, গাড়ী জোরে চালানো যাচ্ছে না, তার উপর প্রতিকূল হাওয়ার ঝাপ্‌টা। কিন্তু কালী গাড়ীর ভিতরের আরামদায়ক গদীতে বসে দুর্ভাবনায় অতিষ্ঠ হচ্ছিল। ঘোড়া হলে চাবুকের দরকার ; গাড়ী হলেও গ্যারেজ চাই। আজকার এই বৃষ্টি-বাদলে গাড়ীখানা কোথায় রাখবে কালী ! ষ্টেশনের সামনের রেললাইন ক্রশ করে গাড়ী গ্রামের পথ ধরলো,—নদীর সেই পুলটার উপর উঠলো এসে। হেড্‌ লাইটের তীব্র আলো পড়লো গিয়ে বাবলা গাছ দুটোর উপর আর—কে একটা মানুষ, মেয়ে ! কালী চম্‌কে উঠলো। এই বৃষ্টিবাদলে কে ঐ সাহসিকা ? কোথায় যাচ্ছে ! গদীর উপর সোজা হয়ে বসে চাইলো কালী !

কৃষ্ণা অনেক দূর থেকেই মোটরের হেড্‌লাইট দেখেছে। এখানে কারো মোটর নেই, ও তাই ভেবেছিল, মিলিটারী কোনো সাহেবের গাড়ী হবে, কিম্বা মিলের মালিক বাবুরা কেউ হয়তো কলকাতা থেকে আসছেন। আত্মগোপন করবার জন্যই সে বাবলা গাছের নীচু দিয়ে সাঁকোর তলায় নেমে যাচ্ছে, কিন্তু কালীর মোটরের আলো ওর সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করে ঝলক দিয়ে উঠলো ওর ভিজে গায়ে। কালী তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে ডাক দিল—কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা নাকি ?

—হ্যাঁ—বলে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে গেল বাবলা গাছের কণ্টকাকীর্ণ ডালের তলায়।

—কোথায় বেরিয়েছিস এত রাত্রে ? কি আশ্চর্য্য ! সাহস তো তোর সাংঘাতিক দেখছি !

—হ্যাঁ !—বলে কৃষ্ণা কয়েক সেকেণ্ড থেমে মোটরে আসীন বাপ্‌কে

দেখলো, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদরে শোভমান, গলায় পুষ্পমাল্য,—মুখে চুরুটের আগুন !

—আয়, উঠে আয় গাড়ীতে ! আমার দেরী দেখে ষ্টেশনে খুঁজতে যাচ্ছিলি নাকি ?

কালী হয়তো খুসী হতো যদি সে শুনতো, মেয়ে তার বাপের ফেরার বিলম্বের জন্য ষ্টেশনে খুঁজতে যাচ্ছে একা, এই দুর্য্যোগের মধ্যে ; কিন্তু কৃষ্ণা বললো,—না। যাচ্ছি ষ্টেশনে ; কাকার সঙ্গে কলকাতা যাব। তুমি বাড়ী যাও বাবা, আমাকে মাফ্ করো, মনে করো, কৃষ্ণা নামে তোমার কেউ ছিল না কখনো।

কৃষ্ণা পুলের উপর দৃঢ়পদে হেঁটে কালীর গাড়ীর পাশ দিয়ে চলে যাবে, বললো আবার—তোমাকে প্রণাম করে যাবারও আমার ইচ্ছা নেই ; তোমার আশীর্ব্বাদ আমার কাছে আজ একান্তই অকেজো বাবা—বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি নিয়ে তুমি বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাও ; আমি চল্লাম আমার আদর্শের সন্ধানে……

কৃষ্ণা চলে যাচ্ছে ; কালী যেন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল এই কয়েক মুহূর্ত্তের আকস্মিকতায়। কিন্তু ও সামলে নিয়েই বললো কঠোর কণ্ঠে, —ফিরে আয় কৃষ্ণা, আমি তোর বাবা !

—না—তুমি আমার কেউ নও। যে কাপুরুষ পিতা জন্ম দিয়েই দূর-বিদেশে পালিয়ে যায়—ফিরে এসে বিলাসের কুঞ্জ রচনা করে নিজের আরামের জন্য, আর দেশের সর্ব্বনাশের সন্ধানে ফেরে সর্ব্বক্ষণ, তাকে পিতৃগৌরব দিতে আমার লজ্জা করে ! তোমার কোনো অধিকার নেই আমার উপর। আমি স্বাধীনা এবং সাবালিকা ; তোমার কাজ তুমি করো গে, আমার কাজে আমি চললাম। আমার বাবা হবার কোনো যোগ্যতা তোমার নেই……।

কৃষ্ণা পুল পার হয়ে মেঠো পথে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার যবনিকার মত দেখাচ্ছে সেই দিকটা! যেন কোনো মহানাটকের চরম সঙ্কটের একটা দৃশ্য অভিনীত হয়ে যবনিকা পড়লো; কালীর কানে তপনো বজ্রের ঝঙ্কারের মত বাজছে কথাগুলো—"বাবা হবার কোনো যোগ্যতা নেই তোমার।"

ড্রাইভারটা বাঙ্গালী হলে হয়তো কালী তার পিতৃত্বগর্ব্বের এই লাঞ্ছনার জন্য অতিমাত্রায় লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হোত, কিন্তু প্রাদেশিকতার বিষয়ে বক্তৃতা করলেও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধাচারী সে নয়, প্রমাণ করবার জন্যই একজন আরা-জেলাবাসীকে ড্রাইভার নিযুক্ত করেছে! লোকটা বাংলা একেবারে বোঝে না। কালী কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবে দেখলো, কৃষ্ণাকে ফেরানো অসম্ভব। তাছাড়া, এই ভিন্ন প্রদেশের লোকটার সামনে মেয়ের সঙ্গে বিতণ্ডা করার কেলেঙ্কারী সে করতে চায় না। যাকগে কৃষ্ণা যে চুলোয় খুসী। ওর কাকা নিশ্চয় ষ্টেশনে আছে। কালী জানতো, তারাপদ শিগ্রি কলকাতায় যাবে—অতএব নিশ্চিন্তে সে ড্রাইভারকে আদেশ দিল—চালাও সিধা।

কৃষ্ণার উপর মমত্ববোধটা ওর সাময়িকই ছিল তাহলে! যাকে চোখে দেখেনি, মানুষ করে নি, নাম পর্য্যন্ত জানতো না, তার উপর মমতাটা হয়তো এমনি জোয়ারের মতই আসে, আবার ভাটার মতই শুকিয়ে যায়। শুকুতো না, যদি হাসির হাসিমুখ সে-মনে উঁকি না দিত,—বঞ্চিত জীবনের বিলাস-বাসনা উগ্র না হতো, সুযোগ-সন্ধানের বুদ্ধি-দীপ্তি প্রশ্রয় না পেত, স্বাধীনতা-হীনতার হীনমনোবৃত্তি আর নৈতিক অবনতির নগ্নতা ওর সকল কাজকে আশ্রয় না করতো আজ!

কালী এড়িয়ে গেল কৃষ্ণার চিন্তাটা! তরুণী কন্যার সুমুখে বর সেজে হাসিকে বিয়ে করে ঘরে আনতে হয়তো লজ্জাই হবার কথা তার—;

কৃষ্ণা চলে গেল, আপদ গেল। কাকার হাতে বড় হয়েছে—যাক সে কাকারই কাছে। কালী পরমানন্দে দিনকয়েক হাসির হাস্যামৃত পান করে নিক!—চুরুটটায় জোরে টান দিল কালী।

নিদ্রাহীন রাত্রির বর্ষণমুখরতাকে স্বপ্নায়িত করবার চেষ্টায় চোখ বুজেই পড়েছিল হাসি—আপন মনেই আবৃত্তি করে চলছিল—

—বজ্রমন্দ্রে কি ঘোষিলে, বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম, জয় তব জয়!—

অকস্মাৎ রূঢ় আলোলেখা লাগলো ওর চোখে! হয়তো বজ্রেরই আলোক, হয়তো জয়যাত্রায় বহির্গত হবার ইঙ্গিত; হাসি স্বপ্নের সত্য রূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষায় বাইরে তাকালো,—মস্ত একখানা কালোবরণ মোটর গাড়ী—তার ভেতর কালীপদ উপবিষ্ট। তরুণী হাসি হতাশ হয়ে গেল এক নিমেষে। মোটর-বিলাসী কালীপদর মূর্ত্তি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসির মুখ থেকে আপনিই উচ্চারিত হোল—ধিক্!

গাড়ীর পিছনের লাল আলোটা যেন হাসিকেই তিরস্কার করছে!

অশনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। সে জানে, কৃষ্ণা এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে ষ্টেশনে যাবে অসুস্থ শরীরে। নিজে গিয়ে কৃষ্ণাকে পৌছে দিয়ে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল সে, কিন্তু তারাপদর নির্ম্মম ভ্রূকুটি বাধা দিল। তারাপদ বললো, 'কৃষ্ণা যদি আসে, সে নিজের শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেই আসতে পারবে। অশনি তাকে সঙ্গে করে আনার অর্থ কৃষ্ণার আত্মশক্তির অপমান করা। তাছাড়া, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে অশনি এবং কৃষ্ণা সম্বন্ধে কুৎসিৎ মন্তব্য রটিত হতে সময় লাগবে না।'—অশনি কখনো তারাপদর কথা

অগ্রাহ্য করতে পারে নি। তারাপদর সৈন্যদলে সে নিয়মবদ্ধ সৈনিক। কিন্তু মনের ভেতর তার আগ্নেয়গিরির প্রকম্পন চলছিল। কৃষ্ণা চলে যাচ্ছে—জীবনে আর কোন দিন ফিরবে কি না জানা নেই;—কৃষ্ণা অশনির অন্তরের অগ্নি, অশনির আত্মার অধিদেবতা! কৃষ্ণার যাবার পথ অশনি অভিমন্ত্রিত করতে পারলো না—সঙ্গী হতে পারলো না, সাহায্য করতে পারলো না। দুরূহ কর্ত্তব্যভার মাথায় করে সে রয়ে গেল এই কারখানার কোয়ার্টারে বন্দী হয়ে!

কিন্তু বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, ঝড় বাড়তেই লাগলো। ঘড়ি দেখলো অশনি—কৃষ্ণা নিশ্চয় এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে পথে। টর্চ্চ আর ছোট একটা লাঠি নিয়ে অশনিও বেরুলো। ওর মা দেখতে পেয়ে বললেন,

—যাচ্ছিস কোথায় অশনি?

—কারখানাটা একবার ঘুরে আসি মা—বলে সে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মিথ্যাই বললো, কারণ অশনি কারখানার ধার দিয়েও গেল না—নদীর গর্ভে নেমে ঘুরে চলে এলো সাঁকোটার কাছাকাছি। বড় একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, মোটরে আলো, তার পরই একটি তরুণীর সিক্ত শাড়ীর অঞ্চল, শুনতে পেল কয়েকটা অস্পষ্ট কথা—তারপর মোটর চলে গেল গ্রামের দিকে, তরুণীকে আর দেখতেই পেল না অশনি! তাড়াতাড়ি পুলের উপর উঠে টর্চ্চ জেলে সে ডাক দিল অনুচ্চকণ্ঠে,

—কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

সিক্তবসনা কৃষ্ণা বহু দূরে চলে গেলেও জোরে হাঁটতে পারছিল না, ভিজে শাড়ীতে পা বেধে যাচ্ছিল, তারপর অন্ধকারে অসুবিধাও ঘটছিল। অশনির ডাক শুনে দাঁড়ালো, টর্চ্চের আলোটা দেখলো,

—বললো,—কে? কি জন্যে ডাকছেন?

দ্রুতপায়ে, প্রায় ছুটেই কাছে এসে অশনি বললো—চলো, এগিয়ে দিই!

—না!—কৃষ্ণার কণ্ঠে তীব্র তিরস্কার! চোখে আগুন জেলে বললো, —কেন এলেন! কেন এলেন আপনি আমার পিছনে? মেয়ে মানুষের উপর এতোখানা যার লোভ, আমার কাকা তাকেই রেখে গেল দেশের কাজ করবার জন্য! উঃ! লজ্জা করছে আমার! ছিঃ ছিঃ! আপনি পুরুষ না কাপুরুষ!

—আমি তোমার নিরাপদ যাত্রাপথটুকু দেখতে চাইছিলাম কৃষ্ণা!

অশনির কণ্ঠ কুণ্ঠায় ভরে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণার কণ্ঠে বিদ্যুৎঝঙ্কার, —আমার যাত্রাপথ নিরাপদ হবার জন্য আমি বের হইনি অশনিবাবু। আপদ-বিপদকে বরণ করবার জন্যই এই যাত্রা আমার! মেয়েদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যদি এতখানি আপনার দরদ থাকে, তাহলে কোনো নারীর নিরাপদ আঁচলের তলায় আশ্রয় নিন গে! আমার নিরাপত্তা দেখবার অধিকার আমি দিই নি কাউকে।

কৃষ্ণা সামনের দিকে পা বাড়ালো। অশনি কিছুই বলতে পারছিল না, কিন্তু কিছু তাকে বলতেই হবে, নইলে কৃষ্ণা চিরদিনের মত তাকে ভুল বুঝে যাবে, তাই নিজেকে প্রাণপণ শক্তিকে সংযত করে বললো,—সেই অধিকার অর্জ্জন করবো কৃষ্ণা, তোমাকে সেই কথাই জানাতে এসেছি!

—আমাকে নিরাপদ করলে সে অধিকার অর্জ্জিত হবে না। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করুন, নিরাপদ করুন দেশমাতৃকাকে; দেশের বীর সন্তান হোন, আপনার গলায় বরমাল্য দেবার জন্য আমিই জন্মজন্ম তপস্যা করবো! নইলে—বিদায়; আমি চল্লাম!—কৃষ্ণা অতিদ্রুত অপসৃত হোল।

অন্ধকারের অচল গর্ভগৃহে অশনি যেন বন্দী—অভিশপ্ত আত্মা! হাতের

টর্চের বোতাম টিপে আলো জ্বালার কথা সে ভুলে গেছে অনেকক্ষণ। দূরের মেঘপটলে বিজলীর জ্বালা—যেন আগুন লেগেছে কোন্ সুখের ঘরে। স্বর্গের দুন্দভি যেন মর্ত্ত্যবাসীর কাণে মরণের আহ্বানবাণী বহন করে আনছে! দূরশ্রুত মেঘের গর্জন আর মাথার উপরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ অশনির অন্তরকে অনেকক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করে রাখলো! ট্রেণের ঝম্ঝম্ শব্দ কানে আসতেই সচেতন হয়ে সে চেয়ে দেখলো—দূরে ষ্টেশনের আলো জ্বলে উঠেছে, বিরাটকায় লৌহ সরীসৃপ এগিয়ে আসছে কৃষ্ণাকে নিয়ে যাবার জন্য। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা বুক থেকে বেরিয়ে এলো ওর; আপনার মনেই বলে উঠলো,

"অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে, মৃত্যুর হোক লয়—"

মৃত্যুকে লয় করবার সুবিপুল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক কৃষ্ণা; জীবনকে জাগ্রত রেখে সহস্র জীবনাগ্নিকে জাগ্রত করুক সে হোমশিখার মত। নীড়বাসিনী নারী সে নয়—একথা অশনির অনেকদিন আগেই বোঝা উচিত ছিল। অশনি ফেরার পথ ধরবার জন্য ফিরলো—বললো, —'তোমার তুলনা তুমি!'

কোয়ার্টারে ওর মা বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ছেলের জন্য। কোথায় গেল এই দুর্য্যোগের মধ্যে! বাবা লোকজন ডেকে পেট্রম্যাক্স আলো নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরুবে, অশনি ফিরে এলো। বাবা ধমকের সুরে বললো,—কোথায় গিয়েছিলি? কোন্ চুলোয়?

—চুলোয় নয় বাবা, চিতায়! ভস্ম মেখে এলাম!—বলে অশনি পাশ কেটে চলে যাচ্ছে।

—খুব কথা শিখেছ তো দেখছি!—পিতার অভিভাবকত্ব বচনে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

—কথা দিয়ে কিছু হোল না বাবা,—এবার কাজ চাই! তাই দীক্ষা নিয়ে এলাম সন্ন্যাসের।

—কি সব বলছিস অশনি!—মা বিস্ময়ের আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন!

—কিছু খারাপ বলছি না মা, আজ থেকে কর্ম্মযোগীর জীবন বরণ করলাম,—যে-আশায় আর উৎসাহে মানুষ গৃহ রচনা করে, তাকে জ্বলিয়ে দিয়ে এলাম চিতায়—আর যে আকাজ্ক্ষায় মানুষ সব ছাড়ে, সেই ভস্মই মেখে এলাম!

অশনি সটান গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। ওর বাবা মা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলো না ওর কথা, কিন্তু তখনকার মত কেউ কিছুই বললো না ওকে। ঘরে তো ফিরেছে, এবার শুয়ে ঘুমোক। কাল সকালে দেখা যাবে। নিজের শোবার ঘরে এসে বাবা ওর মাকে বললো,—বিয়েটা এই মাসেই দিয়ে ফেলা উচিত, কিন্তু কালীবাবুর ইচ্ছা নয়।

—তুমি সকালেই যাও একবার কালীবাবুর কাছে। গিয়ে বলো যে কৃষ্ণাকে তিনি যেন আমাদের ভিক্ষা দেন। ও-মেয়ে ঘরে এলেই অশনির সব গরম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু কালীবাবুও শুনলাম নাকি বিয়ে করবেন?—অশনির মা শুধুলো।

—বলো কি? কোথায়? কার কাছে শুনলে?

—আমাদের ঝি বলছিল যে অশ্বিনীবাবুর ভাগিনী হাসিকে বিয়ে করবেন, এই মাসের আঠারোই নাকি বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে!

ম্যানেজার বিস্ময়ে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল স্ত্রীর দিকে, তারপর আস্তে বললো—বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু সেটা কি ভাল হবে ওঁর পক্ষে! অবশ্য মেয়ের বিয়ে দিলে ওঁকে দেখবার মানুষ চাই।

—পুরুষ মানুষের ঐ তো ব্যাপার গো! মেয়ের বিয়ে দেবার আগেই

নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। হাসি মেয়েটি বেশ বড়সড়, মামার ঘাড়ে পড়েছে। মামাও সুবিধা পেয়ে দায় সারছেন; কিন্তু সে যাক্, তুমি আমাদের জন্য কৃষ্ণাকে তো নিয়ে এসো। টাকাকড়ি কিছুই আমি চাই না—শুধু মেয়েটি পেলেই হবে।

ম্যানেজার চুপ করেই রইল উত্তরে। অশনির মা বললো আবার,—আমি শুনেছি, অশনির সঙ্গে ওর কাকাবাবুর খুব ভাব—কৃষ্ণাকেও ভালবাসে অশনি!

—তাহলে তো খুবই মুস্কিলের কথা! ওর কাকা যে আজ কলকাতা চলে গেল।

—মুস্কিল কিসের! মেয়ের বাবা তো রয়েছে!

—হ্যাঁ—কিন্তু কৃষ্ণা তার কাকাকেই চেনে!

—তা হোক, তুমি সকালেই যাও দেখি একবার!

অতঃপর ওরা ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু অশনি ওঘরে জেগে—সারা রাত জেগেই রয়েছে।

বৃষ্টিধারার বিরাম নাই, কৃষ্ণা উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে চলেছে। ওর অন্তরে মীরার ভজন গুঞ্জিত হচ্ছে—"গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া—" কিন্তু গান গাইবার এ সময় নয়,—ট্রেণের আগমনসংকেত শুনতে পেল কৃষ্ণা! দ্রুত, ওর সাধ্যের অতীত দ্রুতগতিতে এসে উঠলো প্লাটফর্ম্মে; সামনেই কাকা।

—ম্-মণি, আয়!—কাকা দুহাত বাড়িয়ে ধরলো ওকে, বিশাল পক্ষপুটে যেন আশ্রয় দিল জটায়ুপক্ষী রাবনের কেশাকর্ষিতা সীতাদেবীকে। যেন কোন্ অমোঘ মন্ত্রের সম্মোহনে কৃষ্ণা মিনিট

থানেকের জন্ত ভুলে রইল তার বর্ত্তমান, তার অতীত। কাকা হাতের তোয়ালে দিয়ে ওর গা-মাথা মুছতে মুছতে বললো,

—সব যে ভিজে গেছে মা-মণি, বাড়তি কাপড় আনিস নি ?

—না—ভিজুক গে কাকা, কিছু ক্ষতি হবে না। বৃষ্টিতে ভিজে আমার শরীর ভালো লাগছে।

কিন্তু তারাপদ জানে, জ্বর ছাড়ার অব্যবহিত পরই ভিজতে ভাল লাগলেও এ ভেজায় অসুস্থ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি—এমন কি, নিউমোনিয়াও হতে পারে। অস্থির হয়ে উঠলো তারাপদ ওকে কাপড় ছাড়াবার জন্য, কিন্তু ট্রেণ নিকট হয়ে আসছে। তারাপদ দুখানা টিকিট কিনলো দ্বিতীয় শ্রেণীর—বিলাসিতার জন্য নয়, ওর প্রয়োজন, নইলে ও চিরকাল নিম্নশ্রেণীর যাত্রী, দেশাত্মবোধের স্তাবকতার জন্য নয়, অর্থাভাবের জন্যই। আজ ওকে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে হোল, কৃষ্ণা সেখানে বাথরুমে গিয়ে কাপড় ছাড়তে পারবে, এবং হয়তো একটু ঘুমুতে পাবে অপেক্ষাকৃত খালি কামরায়। কৃষ্ণার হাত ধরে গাড়ীতে তুলে নিজের চামড়ার বড়ো সুটকেশ আর বেডিংটা তুললো তারাপদ—তার সঙ্গে খাবারের কৌটা আর জলের বোতল। কৃষ্ণা যাবে, জানা আছে, তাই তারাপদ যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করে এনেছে,—শাড়ী অবশ্য আনতে পারে নি ; পাবে কোথায় ? কন্‌ট্রোলের কল্যাণে শাড়ী-ব্লাউস ডুমুরের ফুল আজকাল, কিন্তু তারাপদর ধুতি-পায়জামা আছে অনেকগুলো, আর কিনে এনেছে অত্যন্ত চড়া দামে একখানা সূতী শাল—কৃষ্ণা গায়ে দিতে পারবে।

গাড়ীতে উঠেই তারাপদ সর্ব্বাগ্রে সুটকেশ খুলে শাল আর ধুতি বের করে বললো—কাপড় ছাড় মা—শালটা গায়ে দিয়ে বোস্।

কৃষ্ণা বাথরুমে ঢুকে কাপড় ছাড়লো গিয়ে। ওর মনে হচ্ছে, দীর্ঘ

কারাবাসের পর ও যেন গৃহে ফিরে এসেছে আজ। যেন ওর স্নেহনীড় এই ট্রেণের কামরাতেই অধিষ্ঠিত। আঃ! কি আরাম যে লাগছে কৃষ্ণার! গত কুড়ি-পঁচিশ দিন ওকে যেন অন্ধকূপে বন্দী করে রেখেছিল কেউ! আজ ও মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন!

'স্বাধীন!" কথাটা অনুচ্চ আবেগে উচ্চারণ করলো কৃষ্ণা! স্বাধীনতার আনন্দ অনুভবের বস্তু—কোনো লেখক কি তা লিখে বোঝাতে পারে? ভারত যেদিন স্বাধীন হবে, সেইদিন ভারতবাসী বুঝবে, কী অসহ্য আনন্দ স্বাধীনতার! আজ ভারতবাসী দলে দলে ঝগড়া করে, প্রদেশে প্রদেশে রেশারেশি চালায়, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধ বাধায়, –তার কারণ, স্বাধীনতার স্বাদ সে বহুদিন হোল ভুলে গেছে। ঐ স্বাদ তাকে কেমন করে আবার আস্বাদন করানো যাবে? কেমন করে? কবে?

কৃষ্ণা বেরিয়ে এলো। কাকা এর মধ্যে বেঞ্চে বিছানা পেতে ফেলেছে। গরম চা কিনেছে এক ভাঁড় ষ্টেশনের ষ্টল থেকে; গাড়ী চলছে। —আয় মা, বোস্! গরম চাটুকু খা দেখি, ঠাণ্ডা লাগবে না।

কাকা ধরে ধরে কৃষ্ণাকে বসিয়ে দিল বিছানায়। ও পাশের বেঞ্চে একজন যুবক দেখছিলো এই কাকা-ভাইঝিকে—দেখতেই লাগলো। চা খেতে খেতে কৃষ্ণা বললো—তুমি তো কিছু খেয়ে বেরিয়েছ কাকা?

—হ্যাঁরে মা, খেয়েছি, দাদা ফিরলো কখন?

—রাস্তায় দেখা আমার সঙ্গে; মস্ত একটা মোটরে চড়ে ফিরলো।

—মোটর! কিনেছে নাকি?

—কি জানি, কেনা না ভাড়া করা। এই মঙ্গলবার তো বিয়ে!

—ঐ জন্যেই তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, মা-মণি, নইলে

হয়তো আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম না....বলে তারাপদ চাই:লো কৃষ্ণার পানে।

কৃষ্ণা চা-খাওয়া থামিয়ে চেয়েই আছে কাকার পানে। তারাপদ অপ্রতিভ যেন, বললো—ভেবেছিলাম, তোর জন্য ভাল ব্যবস্থাই সে করবে!

—আমার জন্য তোমার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা এই পৃথিবীর কেউ করতে পারবে না কাকা, তুমিই আমার বাবা-মা—কৃষ্ণার চোখ দুটিতে জল টলটল করে উঠলো—না আনলে আমি গুমরে মরে যেতাম।

—চল! ও তোর আসা শুনে কি বললো মা-মণি?

—ফিরে যেতে বলছিল—আমি বললাম, ফিরবো না—বলেই চলে এলাম সোজা!

তারাপদ আর কিছু প্রশ্ন করলো না, চুপচাপ কি ভবতে লাগলো। কৃষ্ণা চায়ের ভাঁড়টা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে শুলো বিছানায়। ওর সত্যি ভীষণ ক্লান্তিবোধ হচ্ছে এতক্ষণে। নিশ্চিন্ত আরামে ও এবার ঘুমিয়ে যাবে। ওপাশের বেঞ্চের যুবকটি তারাপদকে প্রশ্ন করলো, —কোথায় যাবেন আপনি?

—কলকাতা!—বলেই তারাপদ আবার নীরব হয়ে ভাবছে, কিন্তু যুবক আবার কিছুক্ষণ পরেই শুধুলো—ওখানে মশায়ের কি করা হয়?

—কিছু করবার চেষ্টাতেই যাচ্ছি—বলে তারাপদ জানালা দিয়ে মুখ ফেরালো, যেন কোনো কথা সে কারো সঙ্গে বলতে চায় না, এটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই; কিন্তু যুবক তাকে নিষ্কৃতি দিল না, আবার বললো,— —কোনো ব্যবসায় করবার ইচ্ছে নাকি?

—ইচ্ছেটা বলবার ইচ্ছে নেই—তারাপদর গলার সুরে রাজ্যের

বিরক্তি ফুটে উঠলো এবার। এই সব উচ্চশ্রেণীর ভ্রমণ-বিলাসী তরুণদের সে চেনে। তার সঙ্গে সুন্দরী কন্যা—যুবকটি তাই ভাব জমাবার চেষ্টা করছে; কোনো একটা ছুতোনাতায় যৎসামান্য উপকার করবার চেষ্টায় ফিরছে; আসল উদ্দেশ্য কৃষ্ণাকে দেখা, তার সঙ্গে আলাপ করা। কিন্তু কৃষ্ণার অভিভাবকত্ব অত দুর্ব্বল হাতে তারাপদ গ্রহণ করে নি। উঠে সে কৃষ্ণার আধঘুমন্ত মুখখানা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল ভাল করে।

—ঘুমা— ঘুমা মা-মণি!

—মেয়েটি কে আপনার? আপন ভাইঝি?

তারাপদ উত্তর না দিয়ে একটা সাঁওতালী চুটি বের করলো পকেট থেকে। আধহাত লম্বা বিড়ির মত বস্তু। দেশলাই জ্বেলে তাতে আগুন ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলো নীরবে। যুবকটি হয়ত এতক্ষণে বুঝেছে, তারাপদ বিরক্ত হয়েছে খুবই। কুণ্ঠিত ভাবে বলল—কিছু মনে করবেন না; কলকাতায় সেদিন পুলিসের গুলি চলেছে। আপনি মেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—তাই সাবধান করবার জন্যই বলছিলাম···

—ধন্যবাদ! সে খবর আমি জানি!—বলে তারাপদ মুখ ঘুরালো।

ছোকরা আর কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। সুগন্ধী সিগারেট বের করে টানতে লাগলো ধরিয়ে। গাড়ীতে অন্য এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই প্রশ্ন করলেন—গুলি চললো কি জন্য মশায়?

—ছাত্ররা শোভাযাত্রা নিয়ে বেরিয়েছিল ডালহাউসি স্কোয়ার দিয়ে যাবার জন্য, ধর্ম্মতলায় পুলিশ গুলি চালায়। বলে যে ওটা প্রটেকটেড্ এরিয়া; ওদিকে শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হবে না!—যুবক পরম উৎসাহে জবাব দিল।

—ওঃ! তারপর!

—তারপর, ছেলেরা এবার খুব দেখিয়ে দিয়েছে মশাই; জানেন, সারা রাত বসে রইল ধর্ম্মতলায়; মেরে শেষ করে দিলেও তারা যাবেই শোভাযাত্রা নিয়ে। শেষে বাধ্য হয়ে গভর্ণর যেতে দিলেন শোভাযাত্রা। এবার ছাত্ররা যা করেছে—একটা কাজের মত কাজ! দেশ কী-রকম এগিয়েছে দেখছেন? সুভাষের আজাদ-হিন্দ বাহিনী আমাদের একশ' বছর এগিয়ে দিল স্বরাজ-যুদ্ধে!

তারাপদ কিছু হয়তো বলতো, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা নাই, তাই চুটিটাই টানতে লাগলো নিবিষ্ট মনে। ছোকরা বাঙালীর বর্ত্তমান বীরত্ব,' শাহ-নওয়াজের প্রশেসন এবং আরো অনেক গল্প বলতে লাগলো, হয়তো কৃষ্ণা এবং তারাপদকে শোনাবার জন্যই, কিন্তু কৃষ্ণা ঘুমিয়ে গেছে, আর তারাপদ শুনছে না—কৃষ্ণার কপালে-মাথায় হাত বুলুচ্ছে। অনেক ক্ষণ বকে বকে নিরাশ হয়ে ছোকরা থামলো। খবরগুলো সবই পুরোনো, তাই তারাপদর শুনবার ইচ্ছাও ছিল না, দরকারও ছিল না; সে নিজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য ভাবতে লাগলো।

ভোর বেলা ট্রেণ থামলো হাওড়া ষ্টেশনে। কৃষ্ণাকে ডেকে তুলে তারাপদ বিছানাটা বেঁধে নিল। তাড়াতাড়ির কিছু নাই, ধীরে সুস্থে নামলেই হবে,—নেমে কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবে, সেইটাই ভাবছে তারাপদ। মালিক মিঃ চ্যাটার্জির বাড়ীতে অবশ্য উঠতে পারে গিয়ে, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণাকে নিয়ে উঠবার ওর ইচ্ছে নেই, যদিও মিঃ চ্যাটার্জি বারবার তারাপদকে অনুরোধ করেছেন তাঁর বাড়ীতেই উঠবার জন্য।

কুলী ডেকে বিছানা-সুটকেশ নামিয়ে তারাপদ একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করবে,—কামরার সেই যুবকটি তখনো মালপত্র নামাচ্ছে। সে হয়তো বহু দূর থেকেই আসছে; অনেক জিনিষ রয়েছে, সেগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠলো প্লাটফর্ম্মে। যুবকটি জিনিষগুলো কুলী দিয়ে

নামাচ্ছে, আর আড়চোখে তাকাচ্ছে কৃষ্ণার পানে। কৃষ্ণা সঙ্কুচিত হয়ে কাকার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। তারাপদ বুঝলো ব্যাপারটা। মুহূর্তে ওর মন বিজাতীয় ঘৃণায় ভরে উঠলো যুবকের উপর। কিন্তু এখানে কিছুই সে করতে পারে না। এই সব বিলাসী কুকুরদের সুবিধার জন্যই সহর কলিকাতা যেন তৈরী। কুলীর মাথায় সুটকেশ বেডিং চড়িয়ে সে কৃষ্ণার হাত ধরে সটান চলে এলো ষ্ট্যাণ্ডে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি করে একেবারে কলেজ ষ্ট্রীটের মধ্যবিত্ত একটা হোটেলে এসে উঠলো দোতালার একটি কামরায়। হোটেলের চার্জ অত্যন্ত বেশি, জনপ্রতি দৈনিক চার টাকা হিসাবে লাগবে; এরকম হোটেলে তারাপদ বড় জোর দুটো দিন থাকতে পারে, তাই কৃষ্ণাকে ঘরে বসিয়েই সে ম্যানেজারের রুমে গিয়ে ফোন করলো মিঃ চ্যাটার্জিকে! মিঃ চ্যাটার্জি ফোনে সস্নেহ তিরস্কার করে বললেন যে তাঁর অতবড় বাড়ী থাকতে কৃষ্ণাকে নিয়ে তারাপদ কেন হোটেলে গিয়ে উঠলো? এখুনি যেন সে চলে আসে চ্যাটার্জির বাড়ীতে। কিন্তু তারাপদ বললো, বিকালে সে যাবে, তবে চ্যাটার্জির বাড়ীতে সে থাকবে না; তার জন্য যেন থাকবার ব্যবস্থা অন্যত্র করা হয়।

কলকাতা সহর কৃষ্ণা এর আগে একবার দেখেছিল কিন্তু তখন সে ছিল খুবই ছোট। আজ সে কলকাতার রূপ দেখতে লাগলো জানালার কাছে বসে। ট্রাম-বাস চলছে—হাজার হাজার লোক যাচ্ছে ফুটপাতে। কত লোক—উঃ! দিনরাত চলছে ঐ জনস্রোত,—কিসের জন্য? পেটের ধান্ধায়। মানুষ শুধুই পেটের চিন্তায় আজ হন্যে হয়ে ঘুরছে। জীবনকে রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষায় জীবন পণ করেছে মানুষ। মানুষের জীবন আজ পশুর জীবন থেকেও ভয়াবহ রকমের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা আর সংস্কৃতির গৌরববাহী মানুষ আজ যদি

একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখে যে সত্যি সে পশু থেকে কতখানি উন্নত, তাহলে গৌরব করবার তার আর কিছুই থাকবে না। নিজকে বাঁচাবার জন্য সে হেন হীন কাজ নাই যা না করতে পারে —তার প্রমাণ ঐ যুথ-বদ্ধ জনস্রোত। ওরা চলেছে শুধু আহার্য্যের সন্ধানে—আরামের আশায় আর আপনাকে বাঁচাবার তাগিদে! পরাধীন দেশের এই মানব-সম্পদ বিদেশীর গোলাম, বৈদেশিকের যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এই সম্পদ —এই মানুষ-রাজ্য যেদিন ভারতের নিজস্ব স্বাধীন সম্পদ ছিল, সেদিন ভারত মানবতার মহত্ত্বেই শুধু বড় ছিল না, ব্যষ্টিগত জীবনেও ঐশ্বর্য্যবান ছিল—বীরত্বে, ধীরত্বে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, ত্যাগে, তপস্যায়, ছিল সে অতিমানবের সমপর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু মানুষকে আজ এই সংগ্রাম-সঙ্কুল, স্বার্থ-পঙ্কিল জীবনের কদর্য্যতায় নামালো কে? কোন্ সভ্যতা-নাম-ধারী বিজাতীয় বিষাক্ততা! কার প্রেরণায় এবং প্ররোচনায় আজকার এই সহরে মানুষের দল কলের পুতুলের মত কেরাণী-যন্ত্রের চাকায় পরিণত হয়েছে! রেশনের থলি হাতে "কিউ" এর ঘুর্ণিচক্রে ঘুরছে—কণ্ট্রোলের কাপড় না পেয়ে কালোবাজারে দৌড়চ্ছে—হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিকে শুধু জীবনটুকু বাঁচাবার জন্য! শুধু জীবন, আর কিছু নয়—কোনরূপে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণটুকু ধারণ করবার জন্য! ওই মূঢ়-মূক দেশবাসীকে যে মহাকবি সভ্যতার সঙ্কটের কথা শুনিয়ে বলে গেছেন—"সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি।"

"দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়—"

সেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মহত্তর মানবচেতনার যে প্রকাশ-রূপ এই হতভাগ্য দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে—আজো তার সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলো না তারা—এই দুর্ভাগ্য দেশ এমনই দুর্ভাগা!

জর-গায়ে জলে ভিজে ষ্টেশনে আসার জন্য রুক্মার শরীর ভাল নাই;

সারাদিন সে জানালার ধারে শুয়ে শুয়ে কতোকি ভাবতে লাগলো—ঘুমুলো না। বিকাল চারটার সময় কাকা তাকে কাপড় ছাড়তে বললো—যেতে হবে মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে! হোটেলে কৃষ্ণাকে একা রেখে যেতে তারাপদর ইচ্ছে নেই। কৃষ্ণা কাপড় পরে বেরুলো কাকার সঙ্গে।

মিডিল্টন রোডে প্রাসাদোপম বাড়ী মিঃ চ্যাটার্জির। তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সাদরে তারাপদকে অভ্যর্থনা করলেন, কৃষ্ণাকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন—বাঃ! চমৎকার মেয়েটি তো! বসো মা! এই যে, এইটি আমার বড় ছেলে, নরেন্দ্র; আজই ও এসেছে দিল্লী থেকে। ও যে আবার দারুণ কংগ্রেসী, এই কদিন ছিল গিয়ে দিল্লীতে মহাত্মাজীর হরিজন বস্তিতে। মন্ত্রীমিশন-গণপরিষদ-মধ্যবর্ত্তী সরকার, কংগ্রেস-লীগ-হরিজনের একতা—এই সব নিয়েই থাকে!

তারাপদ এবং কৃষ্ণা দুজনেই বিস্মিত হয়ে দেখলো, মিঃ চ্যাটার্জির ছেলে গাড়ীর সেই যুবকটি! নরেন্দ্র পরম আহ্লাদ প্রকাশ করে নমস্কার জানিয়ে বললো—ইনিই তারাপদ বাবু? আমরা তো এক কামরাতেই এলাম বাবা! তখন পরিচয় জানলে কি আমি ওঁদের হোটেলে যেতে দিই!

—তোমার উচিত ছিল পরিচয় জিজ্ঞাসা করা!—মিঃ চ্যাটার্জি বললেন!

—পরিচয় আমিই দিইনি! আমার মন নানা চিন্তায় ব্যস্ত ছিল।....

বলে তারাপদই সামলে নিল কথাটা। কৃষ্ণা মাটির পানে চেয়ে বসে আছে। নরেন্দ্র যে ওর পানে তাকাচ্ছে, তা ও যেন বুঝতে পারছে। মিঃ চ্যাটার্জি হেসে বললেন তারাপদকে—সেকেণ্ড ক্লাসেই এলেন তাহলে? ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কে জানে, আপনি হয়তো থার্ড ক্লাসে আসবেন। এখন আপনাকে যে কাজের

ভার নিতে হবে, যে কর্তৃত্ব করতে হবে, তাতে থার্ড ক্লাসে আর চড়া চলে না মিঃ গাঙ্গুলী !—ওরে, চা নিয়ে আয়।

নরেন্দ্র ত্বরিতে বেরিয়ে গেল, হয়তো চায়ের ব্যাপারটা আরো সমারোহপূর্ণ করবার জন্য ; কিন্তু তারাপদর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ঐ সৌখীন কংগ্রেস সেবীর দৃষ্টিটা ও সইতে পারছে না। কৃষ্ণাকে নিয়ে সে কেন এখানে এল !

—ভারী সুন্দর মেয়েটি আপনার। ইচ্ছে করছে, ওকে এই বাড়ীতেই রাখি—বলে মিঃ চ্যাটার্জি তাকালেন কৃষ্ণার পানে, তারপর উঠে বললেন, —নরেনের মাকে ডাকি আমি, দেখুক মেয়েটিকে একবার।—উনি গেলেন ভিতরে, হয়তো কোনো কথা শিখিয়ে আনবার জন্য। কৃষ্ণা বলল,

—এ বড় ভাল যায়গা নয়, কাকামণি !

—হ্যাঁ মা—কিন্তু ভয় কি ? এখনি আমরা চলে যাব। তারাপদ আস্তে বললো।

উঠানের একপাশে গাড়ীখানা রেখে কালীপদ সারারাত শুয়ে শুয়ে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। স্বপ্নকুসুম আর স্বপ্ন নাই, তাকে সে সত্যের সাফল্যে গৌরবমণ্ডিত করতে পারবে, এতে আজ সন্দেহ নাই কালীর। সহরে সে আশাতীত অভ্যর্থনা পেয়েছে ; বড় বড় ব্যবসাদার, উকিল, জজ্, এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে করমর্দ্দন করে ধন্য হয়ে গেছেন। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত খদ্দরের তিনখানা ‘ফালীজুড়ে ও একটা জাতীয় পতাকাও তৈরী করে নিয়েছে,—তাতে চরকার মার্কা দেওয়া।

কিন্তু ভূতজীবনের বিপ্লবী কালীপদর মনে পড়ে গেল—উনিশ শো’ বিশ

পঁচিশ-ত্রিশ সালের অসহযোগ, অহিংসা আর সুতাকাটার আন্দোলনের কথা। মনে পড়ে গেল—চরকার মাকু তৈরী আর পেতলের টাকু-তকলি তৈরী করে দুচারটি বিদেশী কোম্পানী বেশ দুপয়সা কামিয়েছিল সেবার—আর দেশবাসী চরকা, টাকু-তকলী কিনে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিল সুতা কেটে। সে সুতায় কার কয়যোড়া সৌখিন ধুতি-চাদর তৈরী হয়েছে, পরাধীন দেশে নিশ্চয় তার হিসাব রাখা সম্ভব নয়, তবে অনেক জাপানী ভেজাল দেওয়া খাঁটি খদ্দর বেশ চড়া দামে বেচে দুএকজন ভালই রোজগার করেছেন। চরকা মার্কাটা তখন থেকেই চালু হয়ে গেছে জাতীয় পতাকায়। ভালই। কিন্তু জাতীর জীবনে চরকার থেকে বড়ো বস্তু ভারতবাসীর নেই নাকি? এই বৈজ্ঞানিক যুগে, যন্ত্রদানবের বিশালায়তনে, প্রতিযোগিতার তীব্রতম রণক্ষেত্রে শুধু টাকু আর চরকা সম্বল করেই নাকি জয়যাত্রায় যেতে হবে আমাদের!—তাতেই নাকি আমাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী!

হাসিই পাচ্ছিল কালীপদর, কিন্তু হাসলে চলবে না! কালীর বিষয়ী মন ভাবছে।—

বোম্বাই আমেদাবাদে বিরাট বিরাট কটন্ মিলগুলো চলছে; চরকার প্রতীকচিহ্ন দামী কালিতে আর্ট পেপারে ছাপিয়ে মিলের মিহি ধুতিশাড়ীতে 'ওঁরা আটকে দেন—মিল চালনোর' মহাপাপ খণ্ডন হয়ে যায়; কালীকেও করতে হবে তাই, ঐ তিনরং বৈদেশিক গড়নের চৌকোনা পতাকা (ইউরোপ-আমেরিকা ইত্যাদি সব দেশেরই পতাকা চৌকোনা আর বর্ণ-বিচিত্র) আর চরকার ভালো ছবি ছাপ্তে হবে; —ব্যবসায়ের আসল চাবিকাঠি ঐখানেই। মনে পড়ে গেল—স্বদেশী কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্য উনিশশো বিশ সালের বয়কট আন্দোলনের সময় মানুষ কেমন করে দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে দেশের কদর্য্য মাল কিনে

ঠকেছে। শিল্পের বিশেষ কোনো উন্নতি হয়েছে বলে কারো জানা নেই,—কতকগুলি ধনী আরো অধিক ধনী হয়েছে মাত্র। চিনির কল, কাপড়ের কল, দেশলাই-বিড়ি-সিগারেটের ফ্যাকটারী পর্য্যন্ত তখন দেশী হয়ে উঠেছিল—তারাই এই পঞ্চাশ সালের যুদ্ধের বাজারে মানুষের গলা টিপে মন্বন্তর আনলো—ব্ল্যাকমারকেটের বেড়াজালে ফেলে মানুষগুলোকে না খেতে দিয়ে নির্বীর্য্য করে দিল। ওরা শুধু দেশের লোক নয়—ওরা স্বাধীনতাহীন দেশের সুযোগ-সন্ধানী দস্যু, অথচ ওরাই আজ কংগ্রেসের জাতীয় পতাকার আড়ালে দেশনেতাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়ে দেশের মঙ্গলে লেগেছে!—কালী হাসলো।

মস্তিষ্ককোটরে চিন্তার তরঙ্গ অবিশ্রাম চলেছে ওর। বাইরে বৃষ্টি থেমে চাঁদ উঠেছে—জানালা পানে তাকাতেই অপরূপ একটা দৃশ্য চোখে পড়লো কালীর। চমৎকার সুষমাময়ী রাত্রি। গন্ধভরা বাতাসের কোমল শ্বাস গাছের পাতায় মৃদু কম্পন জাগিয়ে যাচ্ছে—যেন কোনো তরুণীর সুরভিত নিশ্বাস—হাসির শ্বাস!—অকস্মাৎ হাসির কথাটা মনে পড়ে গেল কালীর—না, অকস্মাৎ নয়, হাসির কথার উপলক্ষেই তার লক্ষ্য পড়েছিল গিয়ে ধন-তন্ত্রের কোঠায়, প্রতিষ্ঠা-তন্ত্রের প্রয়োজনে; কিন্তু কৃষ্ণার কথাটাও এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। কাকার সঙ্গে কোথায় গেল কৃষ্ণা! কোথায় আর যাবে—গেল কলকাতা! যাক্—দরকার হয়, ফিরে আসবে, না হয়, কাকার কাছেই থাকবে। কাকাই তো তার সত্যিকার অভিভাবক। কালীপদ আজ আর কৃষ্ণার পিতৃত্ব দাবী করতে চাইছে না যেন—যেন কৃষ্ণা চলে যাওয়ায় ওর অন্তর দুয়ারের একটা মরচেধরা জায়গা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে—হাসির ঢুকবার পথ এখন অনায়াসগম্য।

হাসি আসবে এই বাড়ীতে, এই বাগানে, এই বিছানায়—না—, কালীপদ তার পূর্ব্বেই বাড়ীখানা একটু সংস্কার করিয়ে নেবে। খড়ের

চালটা মেরামত করাবে। নূতন বিছানা এক সেট তৈরী করিয়ে আনবে; কিছু নূতন গহনা গড়াতে হবে হাসির জন্য—কিন্তু সময় কৈ? দিন তো আর মাঝে একটা মাত্র। নূতন কিছু গহনা হাসিকে কি দেওয়া উচিত নয় কালীর! হঠাৎ কালীর মনে পড়লো কৃষ্ণার মার কথা—গহনা কিছু ছিল তার—সেগুলো নিশ্চয় তারাপদ বেচে দিয়েছে। বেচেছে নিশ্চয়ই! কিন্তু সত্যি বেচেছে কি না দেখতে হবে।

ভোর হয়ে গেছে, কালী উঠে মুখহাত না ধুয়েই ঘরের বাক্স তিনটে আর পুরানো আলমারীটা খুঁজতে আরম্ভ করলো—না—কিছুই নাই—কোনো গহনাই নাই ঘরে। যদিবা ছিল, তাও কৃষ্ণা নিশ্চয় নিয়ে পালিয়েছে আজই। কৃষ্ণার উপর কালীর বর্ত্তমান মনোভাব পিতার গৌরবের পরিচায়ক নয় নিশ্চয়ই—কিন্তু মানুষ এমনই হয়—এই মানুষ, এরই জন্য মানুষ গর্ব্ব করে!—তাহলে মানুষ বাঘ-সিংহ-সাপ থেকে মহৎ কোন্‌খানে?

নিবিষ্ট মনে খুঁজছিল কালী—খানাতল্লাসী করছিল বলা চলে—হঠাৎ লক্ষীর হাঁড়িতে হাত পড়লো—সের কয়েক ধান, কয়েকটা পেতলের মূর্ত্তি, কড়ি, ঝিনুক, শাঁখ—একটা কৌটা। কৌটার মধ্যে ছয়গাছা সোনার চুড়ি, বিছা-হার, কানের টাপ—সবই কৃষ্ণার মায়ের। আনন্দে কালীর বড় বড় চোখ দুটো জলজল করে উঠছে—গহনাগুলো রেখেই গেছে তাহলে কৃষ্ণা, হাসির গায়ে চমৎকার মানাবে! চমৎকার!!

—মিঃ গাঙ্গুলী—বাহির থেকে কে ডাকলো। কালী চমকে উঠলো, যেন চুরি করছিল এতক্ষণ।

চমকে উঠবার কারণটা বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেল না কালী; ম্যানেজার নিত্যবাবু এসে উঠলো ঘরের চালায়। ভেতরে থাকার

জন্য কালী টের পায়নি, বেলা কতখানা হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলো, প্রায় নটা হবে, অর্থাৎ আড়াই-তিন ঘণ্টা সে ঘরের মধ্যে গহনা খুঁজেছে! নমস্কার করে নিত্যবাবু বললো—এই উঠছেন নাকি? শরীর ভালো তো?

—হ্যাঁ! কাল অনেকটা রাত্রে ফিরেছিলাম, তাই উঠতে বেলা হয়ে গেল; তাছাড়া বাড়ীতে আজ আবার নাই কেউ! কৃষ্ণা গেছে তার কাকার সঙ্গে কলকাতা!—বসুন, বসুন, আমি মুখে হাতে জল দিয়ে আসি!

কালী কুয়োতলায় চলে গেল। এরকম অবস্থায় এসে পড়ার জন্য ম্যানেজার হয়তো লজ্জিত হচ্ছিল, কিন্তু কৃষ্ণার কলকাতা যাওয়ার কথাটা ওকে বিমনা করে দিল বড় বেশী! কৃষ্ণাকে বৌমা করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ম্যানেজার তার বজ্জাৎ ছেলেটাকে শায়েস্তা করতে চায়—সেই কৃষ্ণা কলকাতা চলে গেছে। ম্যানেজার বসে বসে ভাবছে, কালী মুখ ধুতে-ধুতে রান্নাঘরে ঢুকে আগুন জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। রান্না করা ওর ভালই অভ্যাস আছে কাবুলে থেকে—এমন কি, অনেক মেয়ের চেয়ে ভালই সে রান্না করতে পারে। কৃষ্ণা না-থাকার জন্য কিছুই আটকাবে না। কিন্তু কালীপদকে কিছুই করতে হোল না—হাসির মা কাদম্বিনী এসে পড়লো। উঠানে মোটরখানা একবার দেখলো চেয়ে—ব্যাচারা ড্রাইভার তখনো মোটরের মধ্যেই চুপচাপ বসে আছে, মনিব ওঠে নি, কাজেই কি করবে, সে ঠিক করতে পারছিল না। কাদম্বিনী কাউকে কোনো কথা না বলে সটান রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। ও যেন বহুদিনের প্রাচীনা গিন্নী এবাড়ীর। কালীও নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যানেজারের কাছে বসলো এসে। ড্রাইভারকে হেঁকে বলে দিল হাত মুখ ধুতে।

—হ্যাঁ, তারপর কি খবর ম্যানেজার বাবু! কলকাতার কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন?

—পেয়েছি! আপনার প্রস্তাব মিঃ চ্যাটার্জি পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন। উনি লিখেছেন যে, আপনার প্ল্যানে কাজ চললে এখানে আশাতীত ভাবে লাভের কারবার চালানো যাবে। টাকার জন্য কিছুই আটকাবে না। একটা বড় গ্লাস ফ্যাকটরী, আর একখানা কটনমিলও ওঁরা করতে চান এখানে! আপানার মত জানতে চেয়েছেন!

—বেশ বেশ! এ সব কাজে টাকা অঢেল এসে যায় ম্যানেজারবাবু—চাই ব্রেণ! এই পৃথিবীটা শুধু চলছে অঙ্কে, অর্থাৎ কিনা ফিগারে—অর্থাৎ ব্রেণে। "ফিগার" মানে, এক-দুই-তিন অঙ্কগুলোই আজ জগৎকে চালাচ্ছে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, জগতের পরিচালক—কে একজন চার পাতার একখানা বই লিখে না'কি পুরস্কার পেয়েছে "Who rules the world ?" তার উত্তর নাকি 'টাকা'?—আমি হলে লিখতাম, টাকা নয়, টাকার অঙ্ক! বড় বড় মোটামোটা বইএর লম্বা লম্বা অঙ্কগুলোই জগৎটাকে চালাচ্ছে আজ।—কালী হাসলো—হেসে বললো, চালান বিজ্ঞাপন জোরসে, "অনুমোদিত মূলধন,"—পাঁচের ঘাড়ে বসান সাতটা শূন্য; তার পর 'বিক্রয়ার্থ মূলধন,' লাগান শূন্য দুইএর ঘাড়ে, তারপর 'বিক্রীত মূলধন,' আদায়ীকৃত মূলধন, রিজার্ভ ফণ্ড, ডিপজিট, কার্য্যকরী তহবিল—লাগান শূন্য ডানদিকে সুবিধামত। ব্যস্! ব্যাবসা চলবে ফিগারে। ফিগার বড় সাংঘাতিক বস্তু নিত্যবাবু, আর্য্যঋষিরা তাই অঙ্ককে ভক্তিভরে নমস্কার করতেন—দেবতা মনে করতেন অঙ্ককে! হাঃ হাঃ হাঃ!

কথা বলতে বলতে কালী আত্মপ্রসাদের আনন্দে লক্ষ্যই করেনি যে ম্যানেজার ওর কোন কথাই বুঝতে পারছে না, বোকার মত চেয়ে আছে; কিম্বা বুঝতে পারলেও শুনছে না। কাদম্বিনী ইতিমধ্যে দু'বাটি চা নিয়ে আবির্ভূতা না হলে কালী হয়তো আরো অনেকক্ষণ অকতব

বোঝাতো, চা পেয়ে থামলো। চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে ম্যানেজার নিরীহের মত শুধুলো,—কৃষ্ণা কবে আসবে?

—কি জানি! গেছে কলকাতা, দুদিন বেড়িয়ে আসুক—বলে কালী চায়ে চুমুক দিল; যেন কোনো ব্যস্ততাই নাই কৃষ্ণার জন্য। কিন্তু ম্যানেজার আবার বললো—ছেলের মা আমায় দিয়ে বলে পাঠালো, কৃষ্ণাকে যেন আপনি আমাদের ভিক্ষা দেন।

ভিক্ষা! কালীর কথাটা বুঝতে দেরী হোল একটু—তারপরই বললো, —বেশ তো, বেশ তো, নেবেন। কিন্তু কথাটা বলেই ও সামলে গেল। নিজেকে আর ছোট করতে চায়না কালী। কে জানে, কৃষ্ণা কবে ফিরবে, অথবা মোটেই ফিরবে কি না—তাছাড়া, এত তাড়াতাড়ি পাকা কথা দেওয়া উচিতও নয়। একটু থেমেই বললো—ওর কাকাই ওকে মানুষ করেছে; ওর বিয়ের ব্যাপারে ওর কাকার কথাই পাকা হওয়া উচিত—; না কি বলেন?

—তাতো বটেই, তবে তারাপদ বাবুও আমার বন্ধু। তাছাড়া, আমার ছেলেকে খুবই স্নেহ করেন তিনি। তাঁর নিশ্চয়ই মত হবে।

—তা হলেই হোল। ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবছেন কেন? ও যখন হবার, হবে। আগে ব্যাঙ্ক আর কারখানার কতকগুলো শেয়ার বিক্রী করে ফেলুন—কাজ আরম্ভ হয়ে যাক—তারপর সমারোহ করে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে।

ম্যানেজার নিঃশব্দেই বসে রইল, কিন্তু কালী আরো অনেক স্কীম, অঙ্কতত্ত্বের অনেক গভীর রহস্য এবং অনেকগুলি অর্থকরী বক্তৃতা দিল তার সামনে। শেষে ম্যানেজার বললো—আজ উঠি কালীবাবু, অফিসের বেলা হয়ে গেল।

ম্যানেজার যাওয়ার পর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কাদম্বিনী।

—কৃষ্ণা কাল চলে গেল বাবা,—তোমার সঙ্গে দেখাটা অবধি করে গেল না! উঃ! ঐটুকু মেয়ে, কী হিংসুটে! পাছে বাপের বিয়েটা দাঁড়িয়ে দেখতে হয়, তাই দেশছাড়া হোল! দেখেছো!

ধক্ করে উঠলো কালীর অন্তরটা একবার! সত্যি নাকি? সত্যি কৃষ্ণা বাপের বিয়ে না দেখবার জন্যই চলে গেল? সত্যি কি ওর হিংসা ওকে দেশছাড়া করেছে? বিচিত্র কি? সেইটাই তো স্বাভাবিক! সত্যি কি কৃষ্ণা এতো কদর্য্য মেয়ে? আশ্চর্য্য! নির্ব্বাক হয়েই রয়ে গেল কালী প্রায় মিনিটখানেক। তার আত্মজা দুহিতা কৃষ্ণা তার বিয়েটা দাঁড়িয়ে দেখতে পর্য্যন্ত পারলো না—এমনই অকৃতজ্ঞ! কিন্তু মানুষ নিজের সম্বন্ধে বিচারে এমনই অন্ধ যে কৃষ্ণার কৃতজ্ঞতার হেতুটাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করলো না কালী। ওদিকে কাদম্বিনী অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে ক্রমাগত, —অতবড় মেয়ে, বাপের বৌকে ঘরে তুলতে হয় না! মেয়ে তো নয়, শত্রু! জন্ম নিয়েই মা'কে খেল, বাপকে জেলে দিল! যেখানে যাবে, সেই যায়গাই জ্বলে যাবে ওর কপালে! অলক্ষুণে, অপেয়ে!

কালী এই মেয়েলি গালাগালি শুনবার জন্য বসলো না—ড্রাইভার ফিরে এসেছে, চাও খেয়েছে, পাঞ্জাবী আর চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালী, কাদম্বিনী তাড়াতাড়ি বললো—আজই তো গায়ে হলুদ বাবা!

—বেশ তো! হোক গায়ে হলুদ।

—বরের বাড়ী থেকে কিছু পাঠাতে হয় যে!

কালী আবার ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর হাঁড়িতে পাওয়া কৃষ্ণার মার হারছড়া বের করে কাদম্বিনীর হাতে দিয়ে বললো—যা কিছু, ওরই তো সব! নিন।—চলে গেল কালী মোটরে উঠে। কাদম্বিনীও ঘর বন্ধ করে বাড়ী গেল। যাবার সময় রান্নাঘর থেকে নিজেই একটু হলুদ বের করে নিয়ে গেল; হাসির গায়ে-হলুদ হবে।

অত তাড়াতাড়ি কালী কোথায় গেল? কোনো কাজে গেল না নিশ্চয়। মনের নিদারুণ অস্বস্তিটা থামাবার জন্য খামোখা খানিকটা ঘুরে আসিতে গেল রাস্তায়। এই মানসিক ব্যস্ততা কালীর স্বভাবের একান্ত নিজস্ব। কিন্তু কালীর বর্ব্বর অন্তরের তলায় কবি-অন্তর আজো বেঁচে আছে। কৃষ্ণার উপর আকস্মিক আক্রোশটা তাই স্তিমিত হয়ে এলো আধঘণ্টার মধ্যেই। কালী ভাবতে লাগলো,—কৃষ্ণা যদি সত্যি চলে গিয়ে থাকে তার বাপের বিয়ে দেখবে না বলে, তবে খুব বেশি অন্যায় কি এমন করেছে সে! তার পরলোকগতা মাতার স্মৃতিঘেরা কুঞ্জে যদি সে না সইতে পারে অপরের অনধিকার প্রবেশ! হ্যাঁ, এতকাল পরে আজ সেটা অনধিকারের মতই লাগছে তো! কিন্তু কৃষ্ণা কি সত্যি ঐ জন্যই ঘর ছেড়ে গেছে! তারাপদর মতন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এমন ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করেছে তাকে? না—বিশ্বাস হচ্ছে না কালীর। কালী ড্রাইভারকে বাড়ী ফিরতে বললো!

নদীধারের নতুন তৈরী বাঁধ দিয়ে একটি যুবক ফিরছিল; সুন্দর দৃপ্ত ভঙ্গী! মোটরাসীন কালীকে দেখেই হেসে উঠলো ছোকরা। কালী বিস্মিত হয়ে বললো—হাসলেন কেন? আমাকে চেনেন আপনি?

—চিনি! আপনার অতীত জীবনকে প্রণাম করি, আর বর্ত্তমান জীবনকে ঘৃণা করি,—মোটরে, খদ্দরে, ফ্ল্যাগে আর ফ্যাশানে, ঠিকই সেজেছেন; কিন্তু আপনিই কৃষ্ণার জন্মদাতা! এর থেকে বড়ো দুর্ভাগ্য কৃষ্ণার আর কিছু নেই। আপনাকে বাবা বলবার দুর্ভাগ্যের জন্যই তাই সে চলে গেল।

—তুমি কে? তুমি কৃষ্ণাকে কি করে চিনলে? —কালী ব্যগ্রভাবে শুধুলো।

—আমি অশনি। ব্রাহ্মণের অস্থিতে তৈরী শাসনদণ্ড! মনে রাখবেন, আপনার সমস্ত প্ল্যান আমি বানচাল করে দেব। দরিদ্রের রক্ত শোষণের ঋণ আমি উশুল করবো আপনার রক্তেই—অশনি চলে গেল।

কালী চেয়েই রইল! এই অশনি, ম্যানেজারের ছেলে! কালসাপ যেন! কিন্তু কৃষ্ণা তাহলে হিংসায় গৃহত্যাগ করে নি—কালীর মনটার কোথায় যেন অতি অস্পষ্ট গান বাজছে—দূরশ্রুত রাগিণী। আনন্দ-রসঘন সঙ্গীত!—কৃষ্ণা তাহলে হিংসুটে নয়!

প্রাচুর্য্যের মধ্যে বৈকালিক চা-পর্ব্ব চলতে লাগলো। স্বয়ং মিসেস চ্যাটার্জি অর্থাৎ নরেন্দ্রের মা পরিবেশন করছেন এসে। নরেন্দ্র বারবার তাকাচ্ছে কৃষ্ণার পানে। জ্বর হওয়ার জন্য ওর মুখশ্রী কিছুটা শুষ্ক-বিবর্ণ কিন্তু ওর গঠন-সুষমা ঈশ্বরদত্ত, তাই অধিকতর কোমল আর মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণা। ওর প্রসাধন-পারিপাট্যহীন অগোছালো চুলগুলো গালে-কপোলে পড়েছে, মিসেস চ্যাটার্জি সস্নেহে গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন,—কী মিষ্টি মুখখানা! ওকে আমার কাছেই রেখে দিন মিঃ গাঙ্গুলী!

—ও কোথাও থাকতে চায় না আমার কাছ ছাড়া হয়ে। বাবার কাছেই থাকলো না!

—বেশ তো, আপনিও থাকবেন এখানেই। ঘরের তো অভাব নেই—বললেন মিঃ চ্যাটার্জি। তারাপদ বুঝলো, তাকে আটকে রাখবার সবরকম ব্যবস্থাই করতে চায় এরা! এর গূঢ় কারণটা হয়তো এখনো দুর্বোধ্য রয়েছে ওর কাছে, কিন্তু সে তথ্য তারাপদকে আবিষ্কার করতেই হবে! নরেন্দ্র হঠাৎ বললো,—আজকার দিনে বাংলায়

এবং ভারতে আপনার মত নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর অত্যন্ত দরকার! আপনি এই বাড়ীতে থাকলে আমার কাজের খুবই সুবিধা হয়। আমি নির্ব্বাচনে দাঁড়াবো, ভাবছি। মন্ত্রীমিশন যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, তাতে কংগ্রেস যোগ দেবেই....

—মন্ত্রীমিশন যা দিল তার আঠারো আনাই তো ফাঁকি—বলে হাসলো তারাপদ!

—এইটাই শেষ দেওয়া—একথা ভাবছেন কেন! প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে, আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারি যে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে ইংরাজ আজ প্রস্তুত হয়েছে। এখন এই স্বাধীনতা আমাদের রক্ষা করতে হবে, তার জন্য চাই আমাদের প্রস্তুতি, আমাদের যোগ্যতা অর্জন!

—ইংরাজ আগামী দশ বৎসরের মধ্যেও ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না—দিতে পারে না—বলতে বলতে তারাপদ যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো—ইংরাজ দেবে স্বাধীনতা! কার কাছে শুনেছেন আপনি! যারা ইংরাজ-রাজত্ব কায়েমী রাখবার অস্ত্র-স্বরূপ তারাই একথা বলবে। তারাই এই সব বিবৃতিতে বিশ্বাস করবার কথা শুনিয়ে আজকার স্বাধীনতাকামী ভারতকে থামিয়ে রাখতে চায়। ইংরাজ জানে যে যে-কোনো মুহূর্ত্তে বজ্রাগ্নি জ্বলতে পারে। তাই বিলাত থেকে বাণী ছাড়া হয়, মন্ত্রীমিশন পাঠানো হয়, এদেশের বড় বড় নেতাকে বাণী দিতে অনুরোধ করা হয়,—তার সঙ্গে হিন্দুস্থানী আর পাকিস্তানী মতবিরোধ জাগিয়ে—প্রদেশে প্রদেশে প্রতিযোগিতার সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করে দেশের গণ-চৈতন্যকে বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত করবার বন্দোবস্ত করা হয়! মন্বন্তরের আসন্ন আশঙ্কায় অর্দ্ধচেতন জাতির ভাণ্ডার থেকে হাজার হাজার মণ খাদ্য অপচয় হয় অকারণে—কোথাও গোলাজাত খাদ্য রাখার অব্যবস্থা, কোথাও বা

লুণ্ঠন এবং অপচয়। এর পর বড় রকম বিরোধ লাগাবার জন্যও প্ল্যান আঁটা আছে কি না কে জানে?—এমনি করে অন্ততঃ আরো দশটা বছর অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যাবে ভারতের স্বাধীনতা। মনে রাখবেন, ভিক্ষার চাউলে যেমন রাজা হওয়া যায় না—স্বাধীনতা তেমনি ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না—পাওয়া অসম্ভব।

—কী তাহলে করতে হবে? নিরস্ত্র নির্বীর্য্য জাতি এবং জাতীয় কংগ্রেস কী করবে?

—আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে জাতির মনে—যে-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত-মৃত্যু থেকে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও তীব্র—যে-আকাঙ্ক্ষার চরম সাফল্যে পৌঁছাবার পূর্ব্বে আর কোনো আপোষ নেই—যে-আকাঙ্ক্ষার অনমনীয় বীর্য্য—সব লোভ, সব পাপ, সব আত্মম্ভরিতাকে অতিক্রম করে আমৃত্যু, মৃত্যুর পরেও জেগে থাকবে জাতীয় কঙ্কালে—সেই পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করতে হবে জাতীয় জীবনে। জাগরণের যে অঙ্কুরটুকু আজ দেখছি, মৃত্যুপণে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মহামহীরুহে পরিণত করবার জন্য।

—আমরা তো তাই করতে চাইছি!—নরেন্দ্র আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো!

—না; বর্ত্তমান জাতীয় জীবন একটা নিদারুণ সঙ্কটময় অবস্থায় চলেছে। যে জাগরণ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দির সাধনায় লাভ করেছে জাতি, তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা চলছে রাজনীতির অন্তরালে। অন্ততঃ তাকে বিক্ষিপ্ত এবং বিপর্য্যস্ত করবার চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে এল; কিন্তু থাক এসব কথা আমি এখানে যে কাজ করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি, তারই সম্পর্কে আলোচনা হলে ভাল হয়।

তারাপদ অকস্মাৎ থামিয়ে দিল রাজনৈতিক আলোচনা। নরেন্দ্রের বুকে সুভাষচন্দ্রের ছবি-ওয়ালা ব্যাজ আর ওর গাড়ীতে ত্রিবর্ণ পতাকা

তারাপদ অনেকক্ষণ থেকেই দেখছে, হঠাৎ দেখতে পেল কৃষ্ণার প্রতি ওর লুব্ধ চাহনি আর কৃষ্ণার সঙ্কোচক্ষুব্ধ আনত-মস্তক! অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে কৃষ্ণা, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এখান থেকে উঠবার জন্য। তারাপদ নিমেষের মধ্যে ভেবে নিল—তাকে আলোচনায় আটক রেখে কৃষ্ণার উপর দৃষ্টিপাত করবারই ইচ্ছা নরেনের, তারাপদর আলোচনা সে মোটেই শুনছে না। এই সব নারীমাংসলোভী ধনী-কুকুরদের চেনে তারাপদ। টাকার জোরে সভাসমিতিতে গিয়ে ওরা ভোট কিনে নেতা হয়, আর যত রাজ্যের মেয়েদের ডেকে এনে জনমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সান্ধ্য আড্ডায় পরিণত করে। নারী না থাকলে ওঁদের জাতীয়তা, দেশোদ্ধার-প্রচেষ্টা বা জনমঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না;—নারীর কাঁধে ভর না দিয়ে তাঁরা চলতে পর্য্যন্ত পারেন না। এঁরা করবেন দেশোদ্ধার! দুর্ভাগা ভারত জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার জন্য স্বাধীনতা হারিয়েছে—আজো সেই সংযুক্তাদের জন্যই ভারতের বীর-বীর্য্য সমাধিস্থ হয়ে রইলো। আজো সেই জয়চন্দ্রের দল—সেই কাপুরুষ কুকুরের দল, সেই দেশদ্রোহী আত্মপরায়ণ, অহঙ্কার-সর্ব্বস্ব বিলাসীর দলই ভারতের নিয়ামক! স্বাধীনতা হীনতার সেই গ্লানি হাজার বছরেও ধুয়ে গেল না—ধিক্!

—আজ আর থাক; কাল সকালে আসুন—মিঃ চ্যাটার্জি বললেন এতক্ষণে।—যে স্কিম তৈরি করেছি, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাবে! আমি চাই নরেনকে আপনার সহকারী করে দিতে। দিল্লী থেকে তাই এত তাড়াতাড়ি ওকে আসতে লিখেছিলাম।

—বেশ! সে বিষয়ে কালই কথা হবে; আজ আমি উঠি, নমস্কার।

তারাপদ কৃষ্ণার হাত ধরে উঠলো। নরেন্দ্র বললো—চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

—থাক, ধন্যবাদ। আমরা ট্রামেই বেশ চলে যাব।

বলেই তারাপদ আবার হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়ল। কৃষ্ণাও অবশ্য হাত তুলে নমস্কার ক'রে এল আসবার সময়। কিন্তু ওর মনটা কেমন যেন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে এই বাড়ীর উপর। রাস্তায় নেমে তারাপদ একটা রিক্সা ডেকে উঠলো দুজনে। রিক্সা চলছে।

একটা পার্কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন,—বিস্তর লোক শুনছে :—

"সাহিত্য স্বপ্নের জন্য এবং স্বপ্নলোকই তা সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু সেই স্বপ্নই জাতীয় জীবনকে ব্যক্ত করতে পারে বাণীমূর্ত্তিতে—দাবী করতে পারে অমোঘ শক্তিতে, এবং আয়ত্ত করতে পারে অবিসংবাদী ভাবে! বাংলার এবং ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন, জাতীয়তার অভ্যুদয় নিশ্চয়ই রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফল—এ সত্য আজ বর্ত্তমান নেতৃকুল স্বীকার করুন বা না করুন—দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, বর্ত্তমান গণজাগরণকে জাগৃতির মন্ত্রসিদ্ধি দান করেছেন জাতীয় মহাকবিগণ। এই জাগৃতিকে আমরা আগামী দশবছরের মধ্যে জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ইউনিটে, ব্যষ্টিতে সঞ্চালিত করবো—গড়ে তুলবো জাতীয় মহাবাহিনী—যারা শৌর্য্যে বীর্য্যে আর আত্মত্যাগে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিকদলকেও লজ্জিত করতে পারবে। অসত্যকে ঘৃণা করবে, অসূয়াকে নির্ব্বাসিত করবে অন্তর থেকে, লোভকে জয় করবে, পাপকে করবে পরাভূত! তুচ্ছ কর্ত্তৃত্ব বা নেতৃত্ব লাভের জন্য নয়, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই, সর্ব্বস্বত্যাগী সৈনিক হবে তারা। মানুষের জন্যই তারা মহান মানুষের আদর্শ স্থাপন করবে পৃথিবীতে।"

বক্তা একটুক্ষণের জন্য থামলো। তারাপদ বললো কৃষ্ণাকে,—ছোকরা বেশ বলছে তো মা—ওর কথাগুলো খুবই আন্তরিক মনে হচ্ছে।

—চলো না কাকা, ওঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলে হয়, কি ওঁর কর্ম্মসূচী!

—চল—দেখা যাক্—বলে তারাপদ রিক্সা ছেড়ে দিয়ে চলে এলো কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে। বহু যুবক, এবং প্রৌঢ় শ্রোতা, কয়েকটী নারীও আছেন। কৃষ্ণাকে নারী দেখেই হয়তো পথ করে দিলেন তাঁরা। বক্তা বলছে:—

"যাঁরা আজ নেতার আসনে সমারূঢ় তাঁরা জীবনে বহু দুঃখ বরণ করেছেন সত্য, কিন্তু বহু লাঞ্ছনার মধ্যে আজ তাঁরা যতটুকু যা-পাচ্ছেন তাই প্রচুর ভেবে দুবাহু বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন! ঠিক দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্য বিচারের অভাবজনিত এই উত্তেজক প্রবৃত্তি—এই আত্ম বঞ্চনার আগ্রহ। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে—যুগের প্রয়োজনের জন্য যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত করেন মহাকাল—তাঁর বলি তিনি নিচ্ছেন। এই বলি দানের বৈফল্য থেকে সিদ্ধির সাফল্যমন্ত্র একদিন শব-সাধকের শক্তিতে চৈতন্যলাভ করবে—সেদিন অদূরবর্ত্তী—তাকে আরো নিকটবর্ত্তী করবার সাধনাই আমাদের করতে হবে। স্বাধীনতা হীনতার ক্ষত-রক্ত ধুয়ে মুছে প্রলেপ লাগিয়ে বসে থাকলে চলবে না—সেই ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত চলুক চিকিৎসা।

"সুপ্রাচীন এবং সর্ব্বপ্রকারে সভ্য একটা বিরাট জাতি আজ দীর্ঘ সহস্র বৎসর ধরে পরাধীন—পৃথিবীর ইতিহাসে এত দীর্ঘকাল ধরে কোনো জাতি পরপদানত থাকে নি—যারা থেকেছে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে বিজয়ীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে; কিন্তু ভারতের জাতীয়তাকে কেউই লুপ্ত করতে পারলো না—যুগে যুগে ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং জ্ঞানসাধনার মধ্যে ভারতের জাতীয়

গৌরব প্রবলতমভাবে জাগ্রত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। বীর বিবেকানন্দ ভৈরবগর্জনে জাগিয়ে গেলেন আসমুদ্র হিমাচলে ভারতের জাতীয় গৌরব—তারপর এই অর্দ্ধশতাব্দির ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে ··শুধু রাষ্ট্রীক স্বাধীনতাই নয়—ভারতের অন্তরাত্মা চায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ; পৃথিবীর মানবত্বের পূর্ণ বিকাশলাভে ভারত চায় প্রধান স্থান অধিকার করতে—ভারত চায় পৃথিবীতে আদর্শ মানবরাজ্য স্থাপন করতে। আগামী দশবৎসরের মধ্যে তার প্রস্তুতি পূর্ণ হবে—ভাই সব, আপনারা এগিয়ে আসুন ····।

"জীবনকে জ্বালাময় করে তুলতে হবে জাতির জন্য, জাতীয়তার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান বীরের কাজ, গৌরবের বিষয়, কিন্তু জাতি-গঠনে জীবনপাত অনেক বেশি গৌরবের কাজ, ভাইসব, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কর্ম্মক্ষেত্র। স্বাধীনতা-হারা জাতি আজ সকল দিক থেকে বঞ্চিত! সুযোগসন্ধানী আর সুবিধাবাদীরা ধোঁকা দিয়েই আজ জাতিটাকে মরণাপন্ন করে তুলছে। শাসকের শোষণের চেয়ে তাদের সাধুতার মুখোস অনেক বেশি ভয়াবহ। আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে ওদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত অসম্ভব। এই আত্মচেতনাকে জাগ্রত করতে হলে আমাদের একমাত্র আশ্রয় হওয়া উচিত সাহিত্য, অস্ত্র হওয়া উচিত সাহিত্য, অবলম্বন হওয়া উচিত সাহিত্য।"

জাতি-গঠন কার্য্যে আত্মনিবেদিতপ্রাণ ঐ বক্তাটিকে তারাপদ বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল—ওকে যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় সর্ব্বস্ব দিয়ে! ও যেন ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের পরম নিষ্ঠাবান হোতা। ও যেন বক্তৃতা দিচ্ছে না—ভারতের বাণী মূর্ত্তির পূজা করছে। দীর্ঘ দীর্ঘ ওর বক্তব্য—বহুক্ষণ ধরে শুনলো তারাপদ। বক্তৃতা থামলে বক্তার কাছে গিয়ে সবিনয়ে শুধুলো—আপনার গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা কি?

—বহু এবং বিচিত্র! কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষের মনকে চিন্তা করতে শেখানো। আধ্যাত্মিক চিন্তা নয়; আধ্যাত্মিক গুরু এদেশে অনেক এসেছেন;—এখন চাই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তা করতে শেখা—মানুষের মত করে বাঁচবার চিন্তা করতে শেখা—মানুষের দাবী নিয়ে মানুষের সমাজে সদর্পে দাঁড়াতে শেখা—তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার, শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার মত শিক্ষার, জাতীয় বীর্য্যকে সুশৃঙ্খলে চালনা করবার মত শিক্ষার—জাতীয় মনকে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে তৈরী করবার মত শিক্ষার। ঐ শিক্ষাদানই আমার ব্রত—আগামী দশবৎসর আমি এই কাজেই আত্মনিয়োগ করবো! জাতি যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন যেন যোগ্যের হাতে সে নেতৃত্বভার অর্পণ করতে পারে।

—আজকার জন্য নেতৃত্ব কার হাতে দিতে চান?—তারাপদ শুধুলো।

—আজ নেতায় নেতায় দেশ সমাচ্ছন্ন; তাই এত বাদ, এত বিসম্বাদ, এত বিভেদ। দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা এখনো পরিপূর্ণ ভাবে জাগ্রত নয় নেতাকে লাভ করবার জন্য। ব্যষ্টি গত জীবন এখনো বড়ো বেশি স্বার্থপঙ্কিল! —ব্যষ্টিই হয় সমষ্টির নেতা,—সে নেতৃত্ব স্বার্থে কলুষিত, প্রাদেশিকতায় সঙ্কীর্ণ এবং স্বপ্রভুত্বের সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

—তাহলে?

—আমরা দেশের মানুষকে গড়ে তুলবো এমন করে, যাঁরা স্বাধীনতা হীনতার গ্লানিকে জীবনের প্রতি স্পন্দনে অনুভব করবে তীব্রতম ভাবে—জীবনকে জ্বালাময় করে রাখবে যারা প্রতিটি মুহূর্ত্ত স্বাধীনতার জন্য—নেতা তারাই তৈরী করবে!

আরো কয়েকটি কথা কইলো তারাপদ ওর সঙ্গে। বক্তার নাম লোকাধীশ! তারাপদর পরিচয় পেয়ে ওকে সে বললো যে কিছুদিন পূর্ব্বে সে তারাপদদের কারখানার কাছাকাছি কয়েকটা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে এসেছে; কাজ কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই!

তারাপদ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করলো ওর পরিকল্পনা। কৃষ্ণা বললো—জাতিগঠনে আত্মদান একটা কাজের মত কাজ, কাকামণি, জাতীয় জীবনকে সংহত করতে পারলে তবেই হবে স্বরাজ!

লোকাধীশ কৃষ্ণার পানে চেয়ে বললো—জাতীয় জীবন আজ বড় বেশি কদর্য্য, বড় বেশি কলুষিত হয়ে উঠেছে। ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী ইতিহাসে এমন করে কোনো শাসক ভারতীয় জীবনধারাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে নি, ইংরাজ যা করেছে—তবু এখনো আশারূপে জেগে আছেন আপনারা ভারতীয় সংস্কার-সংস্কৃতির মূর্ত্তিমতী বর্ত্তিকা-স্বরূপিণী হয়ে—আসুন, ভারতকে আবার আমরা তার সংস্কার-সংস্কৃতির সদ্ধর্ম্মে পুনর্গঠিত করি—সাহিত্যে, সামাজিকতায়,—সত্যজীবনের পূর্ণতায় বিকশিত করে তুলি—যে জীবন হবে জগতের আদর্শ—যার আদর্শ নিষ্ঠার মহত্তোমহিয়ান অতিমানবত্ব মানবের রাজত্বকে অমলিন, অমৃতময় করে তুলবে—মানুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অস্ত-সূর্য্যের রক্তাভা এসে পড়েছে লোকাধীশের ললাটে। ওর দৃপ্ত ভঙ্গী আর দীপ্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে কৃষ্ণা বললো—আমি আপনার অনুবর্ত্তিনী হলাম।

পাশ থেকে একটি হাস্যোজ্জ্বলা তরুণী এগিয়ে এসে বললো—আসুন, আমরা জীবনকে জ্বালিয়ে রাখবো স্বাধীনতা হীনতার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায়! মৃত্যুকে আমরা উপেক্ষা করবো অমৃতের সাধনার জন্য, যতক্ষণ আমাদের আত্মজগণ ভারতভূমিকে আবার সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ না করাতে পারছে!

—আপনি কে ভাই—? কৃষ্ণা প্রশ্ন করলো।

—আমি সেঁজুতি—সন্ধ্যার ক্ষীণ দীপ, কিন্তু যতক্ষণ ঐ অস্তসূর্য্য উদয়াচলে পুনরুদিত না হবেন, ততক্ষণ আমি জ্বলে থাকবো।

—বেশ, আমি কৃষ্ণা! কৃষ্ণ রাত্রির দীর্ঘতম দুঃখসাধনা শেষে আমিও দেখিতে চাই ওই সবিতৃদেবের উদয়-গৌরব।

দূরের তরুশীর্ষে আর একবার অস্তোন্মুখ সূর্য্য জ্বলে উঠলো—

আগামীদিনের সম্ভাবনার সঙ্কেত!

ঘরে ফিরে এলো কালী, বেলা তখন অনেকটা। ওরও গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ইত্যাদি হওয়া উচিত, কিন্তু কে করে অতসব ঝামেলা। কালী ড্রাইভারকে একটা টাকা দিয়ে বললো—নদীর ওপারে কারখানার বাজারে গিয়ে সে খেয়ে আসুক। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ড্রাইভারের দরকার হবে না। ড্রাইভার চলে গেলে কালী শূন্য ঘরখানার এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারাপদ যে কুঠরীতে থাকতো সেটা একেবারে খালি, শুধু বইএর আলমারীটা আর বিছানাটা পড়ে আছে। বইগুলো আলমারীতে তুলে চাবি দিয়ে গেছে কৃষ্ণা। ওর পাশেই কৃষ্ণার শোবার ছোট্ট কুঠরীটা। কালী ওঘরে একদিনও যায় নি এসে অবধি। যেতে সময় পায় নি সে। যাবার মত মনের আগ্রহও যে যথেষ্ট ছিল না, সেকথা কালী ভুলেই গিয়েছিল—সময়াভাবের কথাটাই মনে হোল ওর।

উঃ! কত কাজ—কত অসংখ্য কাজ কালী এই সামান্য কয়েকদিনেই করলো—আরো কত কাজ করবার প্ল্যান ওর মগজে কিল্‌বিল্‌ করছে! কাজগুলো সব করে ফেলতে পারলে কালী মাল্টি-মিলিওনিয়ার হয়ে উঠবে। দোতালার উপর চারতালা বাড়ী তুলে—ফোর্ডের সঙ্গে য়োলস্

বয়েস কিনে, কালী তখন পাঁচজনের একজন হবে। তারপর দাও না লাখ খানেক টাকা চাঁদা ছেড়ে দেশের কাজে—রোল্‌স রয়েসের মাথায় তিনরং পতাকা উড়িয়ে বেরিয়ে পড়ো দেশোদ্ধারের চমক দেওয়া বুলি মুখে নিয়ে—দাঁড়িয়ে যাও নির্ব্বাচনের ভোটাভুটিতে, এরোপ্লেনে চড়ে চলো দিল্লী বোম্বাই জরুরী প্রয়োজনে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে! হাজার রিপোর্টার তোমার প্লেনের চারপাশে ভিড় করে আসবে—মুখের হাসিটি থেকে গলার কাশিটির পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করবে তারা রাজনৈতিকতার প্রকাশ-সম্ভাবনায়—খবরের কাগজে কাগজে অবিশ্রাম চলবে তোমার নামের নামাবলী, কাজের ফিরিস্তি—। তখন তোমারই হাতে এসে উঠবে টাকার তোড়া—যে টাকা দেশবাসীর রক্তজল করা অন্নমুষ্টি থেকে অর্জিত! বড় বড় মোটা মোটা টাকার তোড়া—কেউ হিসাব চাইবে না সে টাকার, কেউ প্রশ্ন করবে না, সে টাকায় কি হোল। স্বাধীনতাহীন দেশ, মূঢ় মূক জনসাধারণ, হুজুগ-প্রিয় বাঙ্গালী—এই তো সময়, এই তো সুযোগ! কালী ভাবছে—

কিন্তু এমন দিন আর বেশি দিন থাকবে না। ঐ মূঢ় মূক মুখে আজ ভাষা ফুটতে আরম্ভ করেছে—ঐ নির্ব্বোধ জনসঙ্ঘের আজ বোধ জেগে উঠছে—আরো জাগবে! ওরা জাগবে যেমন করে উষার উদয়ের সঙ্গে মাটির পৃথিবী জেগে ওঠে। মৌন মূক মাটিও জাগে···

কালীর হঠাৎ চোখ পড়লো, কৃষ্ণার মাথার কাছে টাঙানো একখানা ফটোতে কালী স্বয়ং আর তার পূর্ব্ববিবাহিতা পত্নী—কৃষ্ণার মা—সেই বিয়ের সময় হাত-ক্যামেরায় তোলা নিতান্ত সাধারণ ফটো একখানা—সেটার কথা কালীর মনে ছিল, অথচ ভুলে গিয়েছিল কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করতে। কৃষ্ণা সেই ফটোটি নিজের মাথার শিয়রে রেখেছে; পরম শ্রদ্ধায়

বেল ফুলের মালা গেঁথে পরিয়েছে সেই ছবিতে, শুকিয়ে গেছে মালাটা ; বোধহয় পনর-কুড়ি দিন আগের মালা ওটা। কৃষ্ণা কি তবে এই কয়দিন মালা দেয় নি ঐ ফটোতে ? কেন ? কেন দেয় নি !

কালীর কবি-অন্তর প্রশ্নে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো—কেন সে দেয় নি মালা ? কিন্তু কেন দেয় নি—তার উত্তরটা কালী এড়িয়ে যেতে চাইছে—'অশ্রদ্ধায় কৃষ্ণা মালা দেয় নি তার ফটোতে'—এচিন্তা ওর অন্তরকে নিষ্পিষ্ট করে দেবে ! কালী অন্য দিকে তাকালো, সবই পড়ে আছে—কোনো কিছুই নিয়ে যায় নি কৃষ্ণা ;—শিয়রে বঙ্কিমের আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী পড়ে আছে—আর পড়ে আছে কালীর সেই "কৃষ্ণা" কবিতাছাপা প্রবাসীখানা। কিছুই নেয় নি, পিতৃগৃহের তুচ্ছ একটি স্মৃতিকণাও নিয়ে যায় নি কৃষ্ণা ! যে কাপড়খানা পরে গেছে, সেটা ওর কাকার দান, কালীর নয়। কৃষ্ণা শুধু পিতৃগৃহই ত্যাগ করে নি, কালীকে, কালীর পিতৃত্বকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে ; মর্ম্মান্তিকভাবে অস্বীকার করেছে কালীর পিতৃত্ব। কে জানে, কেন-যেন বেদনার বাষ্প জমে উঠছিল মর্ম্মকোষে। কালী হাসলো ; হেসেই অস্বীকার চাইলো সে ব্যথাকে।

ডাকতে এলো অশ্বিনীর ছোট মেয়ে। কৃষ্ণা নেই, রান্নাবাড়ার অসুবিধা হবে, তাই কালীকে ডেকে পাঠিয়েছে অশ্বিনী মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। সেখানেই কালীর শুভ অধিবাস ইত্যাদি যা-হবার হবে। কালী বললো, সে যাচ্ছে আধ ঘণ্টার মধ্যে। ওকে বিদায় করে দাড়ি কামিয়ে কুয়োর জলে স্নান করলো কালী। ভাল একখানা কাপড় পরলো,—নিজেকে সুচারুরূপে সাজিয়ে আয়নায় মুখখানা দেখলো একবার—বরের মতই দেখাচ্ছে—সস্মিতবদন কালী বেরিয়ে গেল অশ্বিনীর বাড়ী। যাবার সময় কাবুল থেকে আনা একখানা কাপড় আর গতকাল কেনা একটি

সোনার আংটি হাতে নিয়ে গেল, সময় এবং সুযোগ পায় তো হাসির হাতে স্বহস্তে পরিয়ে দেবে।

অশ্বিনীর বাড়ীতে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আছে, গ্রামের দুই চারজন মাতব্বরও রয়েছেন। অশ্বিনী চতুর ব্যক্তি, দুচারজনকে সাক্ষী রেখেই সব কাজ করা ওর অভ্যাস। কালী ওসব চিন্তা করলো না—চিন্তা করবার দরকার নেই। কৃষ্ণা ওকে মুক্তি দিয়ে গেছে, লজ্জার বাঁধন আর ওর নেই; ও এখন নিঃসঙ্কোচে হাসিকে বিয়ে করে সংসার করতে পারবে। সগর্ব্বে কাপড়খানা কাদম্বিনীর হাতে দিয়ে বললো—গায়ে হলুদে কি দিতে হয়, আমার তো জানা নেই, কাপড়টা দিন।

—দেবে বাবা,—তুমিই দেবে জন্ম জন্ম—বলে কাদম্বিনী হাসিমুখে চলে গেল।

হাসির সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হোল না কালীকে; কারণ বিয়ের সব কথাই যখন পাকা, তখন শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে আর দেখা কেন,—অকল্যাণ হতে পারে। কালী ক্ষুণ্ণ হোল স্বহস্তে আংটিটা পরাতে না পেয়ে; কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে বাঙালী মেয়েদের আচার-অনুষ্ঠান-উপচার-সংস্কারই শাস্ত্র—ওর উপর কথা চলে না। কালী আংটিটা কাদম্বিনীর হাতেই দিয়ে বললো—আমার আশীর্ব্বাদ বলে ওকে দিন!

চলে এলো কালী আপনার ঘরে। আত্মপ্রসাদের আতিশয্যে ওর চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। জীবনকে আর একবার মধুময় করে তুলবার আকাঙ্ক্ষায় ওর মনশ্চেতনা আজ উদ্বেগ-আকুল। পৃথিবীর বাস্তব রূপ ওর চোখে আজ স্বপ্নের রঙিন কল্পনার মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ও যেন বিংশতিবর্ষীয় তরুণ।

ড্রাইভার খেয়ে এসে বসে আছে। কালী অকারণে আর একবার গাড়ীতে উঠে যাত্রা করলো, কোনো কাজ না থাকায় কারখানার

ম্যানেজারের কাছেই গেল। ম্যানেজারবাবু বাড়ী ছিলেন না—ছিল অশনি। কালীকে দেখেই হেসে বললো—পৃথিবী গোলাকার—তাই আপনার সঙ্গে আবার দেখা হোল আজই। বসুন, বাবা এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার কথা বলছিলেন।

—কি কথা ?—কালী সাগ্রহে শুধুলো।

—বলছিলেন যে, আপনার মত ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি উনি নাকি আর দেখেন নি। তাতে আমি বললাম, আমার বাবাও কম ব্যবসায়ী নন ; জেল থেকে বেরিয়ে তিনিও নিজকে ক্রীতদাসত্বের গৌরবে নিঃশেষ করতে পেরেছেন। এখন আবার আপনার মত ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে আরো বড় ব্যবসায়ী হতে চাইছেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি ওঁর কম কিসে ?

অশনি কি বলতে চায়, কালী ঠিকমত বুঝতে পারলো না ; কৃষ্ণাকে বিয়ে সে করতে চায় না নাকি ? কালী সরাসরি প্রশ্ন করলো।

—আমার সঙ্গে ওঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ কি তুমি পছন্দ কর না ? কৃষ্ণাকে তো তুমি জানো শুনেছি ; তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে নাকি ?

—তাকে বিয়ে করবার যোগ্যতা থাকলে করতাম। কিন্তু আপনি তার বিয়ের কথা উচ্চারণ করেন কোন্ মুখে ! কোন্ যোগ্যতায় আপনি তার বাবা হ'তে চান ? আপনার সে-গৌরব বহুদিন হোল মুছে গেছে—আজ আর কৃষ্ণার কেউ নন আপনি—

বলে অশনি একটু থামলো, তারপর বললো,—আমাকে এইখানে রেখে গেছে কৃষ্ণা আর কাকামণি, আপনাদের সিঁদকাঠি যাতে গরীবদের ছিটেবেড়া ফুটো না করতে পারে, তাই দেখবার জন্য। মনে রাখবেন, আমি আমৃত্যু তাই দেখতে জেগে থাকবো এখানে, জলে থাকবো।

অশনি চলে গেল। কালী বহুক্ষণ বসে কি যেন ভাবতে লাগলো! তার বর্তমান জীবনধারার উপর কী দারুণ অশ্রদ্ধা এই অশনির!—উঃ! অসহ্য! কালী উঠে ঘরে চলে এলো ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা না করেই!

কিন্তু ঘরে ফিরবার আগে মনটাকে মানিয়ে নিতে হবে আগামী উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য; কালী তাই ফেরবার পথে গেল কারখানার্ সংলগ্ন ছোট বাজারটায়। লোকজন, জিনিষপত্র দেখে মনটা একটু আনমনা করতে চায় সে। নিতান্তই ছোট বাজার, কিনবার মত কোনো জিনিষই নাই; কালী একগোছা ধূপকাঠি আর দুটো মোম বাতী কিনলো—জ্বালাবে ঘরে।

সন্ধ্যাও হয়েছে, কালী ফিরে এলো আপনার ঘরে। এইবার হাতমুখ ধুয়ে নিজেই এককাপ চা করে খাবে সে। ওদিকে আকাশে মেঘ উঠেছে, কালো হয়ে গেছে রঙিন সন্ধ্যা—কালীর বাগানের রজনীগন্ধার শীষগুলো বাতাসে নুয়ে মাটিতে ঠেকছে এসে! বৃষ্টিও আরম্ভ হোল। ড্রাইভারকে আবার ছুটি দিয়েছে কালী—বাড়ীটায় ও এখন একা। ওর কাবুলী মনে বিলাস-চিন্তা আবার জেগে উঠলো একাকীত্বের আশ্রয়ে। কাল হাসিকে বিয়ে করে আনবে এই ঘরে—এই একাকীত্ব হাসির হাস্যঝঙ্কারে মুখর এবং মধুর হয়ে উঠবে। কালী নিশ্চিন্তে ধনতন্ত্রবাদের উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করবে—হাসির একফোঁটা হাসির জন্য কালী কী না করতে পারে!

ঝম্ ঝম্ বারিধারার মধ্যে শুভ্রবেশা, সিক্তবসনা কে এসে দাঁড়ালো। মোমবাতীর অস্পষ্ট আলোতে কালী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল; ওর পূর্ব্ব পত্নীর প্রেতাত্মা নাকি?—না—স্বয়ং হাসি। আনন্দে

অথবা আত্ম-সম্বিতহারা হয়ে কালীপদ কথাই বলতে পারলো না কিছুক্ষণ!

—আমি এলাম,—এলাম আপনাকে একটা কথা বলতে—হাসিই বললো।

—বলো! বসো, বসো—কালী সাগ্রহে চামড়াবাঁধানো মোড়াটা এগিয়ে দিচ্ছে।

—না—হাসির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ়—বসতে আজ আসিনি আমি; আমি জানতে এসেছি, আমাকে বিয়ে করে কি আপনি আমার ভালবাসা পাবেন, ভেবেছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন, গহনা আর কাপড় দিয়ে কোনো তরুণীর মন জয় করা যায়? কোনো মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া যায় শুধু বাড়ী-গাড়ী আর শাড়ীর মচ্ছব দিয়ে? আমি জানতে চাইছি, কোন্ অধিকারে কৃষ্ণার মার' গলার হার আপনি আমায় উপহার দিয়েছেন?—আমি অসহায় একটা মেয়ে, মামার খুসীমত আমাকে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু বিয়ে আমি যাকে করবো সে আমার ভালবাসা পাবে,—এমন কথা তো আমি দিতে পারি না—এ সত্য জেনেও কি আপনি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছেন? আমি সত্যি উত্তর চাই।

হাসি ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে গেল; যেন ওর মুখস্ত ছিল। কালী নির্ব্বাক—নিঃসহায় হয়ে বসে। কোনো উত্তর দেবার ক্ষমতাই ওর নাই! কালীকে নির্ব্বাক দেখে হাসিই আবার আরম্ভ করলো,—আপনাকে শুধু শ্রদ্ধা করতাম না—পূজা করতাম। যে-শ্রদ্ধাভক্তিতে ভারতবাসী আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করে—আমি আর কৃষ্ণা ঠিক তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে আপনাকে পূজা করতাম—আপনার জীবনের কথা স্মরণ করতাম, আপনার রচনা-করা কবিতা

আবৃত্তি করতাম—কিন্তু সে-আপনার মৃত্যু হয়েছে। যে-বীর কালীপদ স্বদেশের মুক্তির জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, শ্রদ্ধা আমরা তাকেই করতাম, তাই আপনি যেদিন ফিরে এলেন—দেশহিতে আত্ম-নিবেদিতপ্রাণ বীর-সৈনিককে দেখতে এসেছিলাম আমি ফুল তুলবার ছল করে। এসে দেখলাম, একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ—লোভে-কামনায় পরিপূর্ণ একজন অতি সাধারণ মানুষ, যাকে শ্রদ্ধা করবার কিছুই অবশিষ্ট নেই—বরং তার অধঃপতনে দুঃখ এবং ঘৃণায় অন্তর ভরে উঠে !! মানুষের অসহায়তাকে অধিকতর বিড়ম্বিত করবার কূটকৌশলে যে মানুষ দস্যুর থেকেও অধমতরের, আপনি তিনিই। আমি একান্ত অসহায়া—কৃষ্ণার মত আমি গৃহপরিজন ত্যাগ করে যেতে পারবো না—কিন্তু মনে রাখবেন—আপনাকে শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা দেবার মত আমার মনে আর একফোঁটাও শ্রদ্ধা নেই।

হাসি থামলো। কালীপদ চিন্তাই করতে পারছিল না যেন। হাসি থামার পর ওর অনুভূতিতে জেগে উঠলো—ওর সামনে একা তরুণী—যার সঙ্গে আগামী কাল ওর বিয়ে হবে—সে ওকে স্পষ্টভাষায় জানাতে এসেছে—ওকে ভালোবাসা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু কালী কি বলবে! যে বীরত্ব এবং মহত্ব নিয়ে সে একদিন কারাবরণ করতে গিয়েছিল—এ কালী তো সে কালী নয়! সত্যি সে কালীর মৃত্যু হয়েছে!

—ঐ যে মালাটা আপনাদের ফটোতে ঝুলছে—জানেন, ও মালা আমিই গেঁথে পরিয়েছিলাম—হাসির অধরোষ্ঠ কাঁপছে আবেগে।

কালীপদ দেখলো—যেন কৃষ্ণ মেঘের স্তরে স্তরে স্ফুরিত বিদ্যুৎ। হাসি বলছে,—যে ভাগ্যবতী আপনার প্রথম জীবনের বীরত্বকে মালা

দিয়েছিলেন তাঁর সমপর্য্যায়ভুক্তা হতে পারলে নিজেকে আমি অসীম ভাগ্যবতী মনে করতে পারতাম—কিন্তু আপনি আজ কাপুরুষের অধিক, ক্রূর, নিষ্ঠুর,—স্বাধীনতাহারা দেশের শত্রু—মাতৃভূমির কলঙ্ক হয়ে উঠেছেন। আমার ঐ শ্রদ্ধার পূজা আপনার ফটোতে আর মানাবে না!

হাসি ত্বরিতে এগিয়ে গিয়ে ফটোর মালাটা টেনে ছিঁড়ে হাতের মুঠোতে গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাবার সময় বলে গেল—এ মালা মালা নয়, এ তরবারী—যোগ্য বীরের জন্য তুলে রাখবো।

হাসি চলে গেল বর্ষা-বিদ্যুতের মধ্যেই। কালী নিস্পন্দ বসে! কতক্ষণ বসে আছে, খেয়াল নেই; ওর মস্তিষ্ক-কোটরে কতকগুলো ঘুণকীট যেন উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওর চিন্তাকে বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। কিন্তু কালীর প্রকৃতিগত সাঁওতালী গোঁ ওকে উত্তেজিত করতে লাগলো ক্রমশঃ। মেঘের বিকট গর্জনে চমক ভেঙে সে উঠে দাঁড়ালো। মোমবাতীটা প্রায় অর্দ্ধেকের উপর পুড়ে গেছে; ঘরটা স্তব্ধ, থম্‌থমে। কালী উঠে দীর্ঘ বারান্দায় সবেগে পায়চারী করতে লাগলো। হাওয়ার ঝাপটায় খড়ের চালখানা দুলছে, বাগানের গাছগুলো নুয়ে পড়ছে,—বিদ্যুতালোকে দেখলো কালী!

কৃষ্ণা ওকে ছেড়ে গেছে; কেন ছেড়ে গেছে, সেকথা কৃষ্ণা স্বমুখে জানিয়ে যায় নি, কিন্তু জানাবার জন্য হাজার রকম ব্যবস্থা করে গেছে। হাসি, অশনি, এমন কি এই ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব, এই গ্রামের পথধূলিও জানিয়ে দিচ্ছে, কালী আজ আর কারো শ্রদ্ধার পাত্র নয়। কালী ধনী, কালী মোটরবিহারী—পাকাবাড়ীবাসী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার এবং হাসির বর হতে পারে, কিন্তু কালী আর জাতির এবং জগতের চোখে শ্রদ্ধার আসন, ভক্তির অর্ঘ্য পাবে না। হাসি স্বয়ং সেকথা জানিয়ে গেল;

—জানিয়ে গেল, সামাজিক জীবনে সে যতই অসহায়া হোক আপনার প্রেম-জীবনে সে স্বাধীনা। কালীকে প্রেম সে দিতে পারবে না।

প্রেমহীন এক নীরস নারীমূর্ত্তির জন্তই কি কালী তবে এতো আয়োজন করছে? তার বিরাট ব্যক্তিত্বকে এমনি করে অকাজে অপব্যয় করবে কালী! কৃষ্ণার পিতৃত্বগৌরব সে পেল না, হাসির স্বামিত্বগৌরবও হারাবে—কারো অন্তরে সত্যিকার শ্রদ্ধার আসন সে পাবে না আর। আজকার চাতুর্য্যবুদ্ধি, কূটকৌশল এবং স্বদেশীয়ানার ভণ্ডামী দেখিয়ে সে হয়তো কিছুদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত এবং প্রচারিত হতে পারে—কিন্তু জাতীয় জীবনে "আজ এবং আগামী কাল-এ" তফাৎ আকাশ-জমিন। আগামী কালের ভবিষ্যৎ-বংশধর কালীর নাম ঘৃণাভরে উচ্চারণ করবে। দেশদ্রোহী, দেশসেবকের ভণ্ডামীকারী জাতীয় কলঙ্ক নামে ঘোষিত হবে কালী। অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধর কালীকে ক্ষমা করবে না—কিছুতেই না। কোনো দেশেই দেশদ্রোহীকে কেউ মার্জনা করে না।

পার্থিব জীবনে যে-প্রাপ্যের আশায় কালী দেশকে বঞ্চনা করে ধন-তন্ত্রবাদের আরাধনা করতে যাচ্ছিল, সেই হাসিকেও সে পাবে না! কাউকেই পাবে না; কেউ তাকে সত্যকার শ্রদ্ধা দিতে পারবে না! তবে কিসের আশায় কালী আত্মবঞ্চনা করবে? কি জন্ত তার আবাল্য-লালিত দেশসেবার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসন্ন করে দেশদ্রোহী হবে? কেন? কার জন্ত?

আজন্ম আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান কালী উদ্বেল হয়ে উঠলো অন্তরের অতৃপ্তি-যন্ত্রণায়। আত্মজা কৃষ্ণা তাকে ছেড়ে গেছে, সহোদর তারাপদ ত্যাগ করলো,—হাসিও এলো না; বিরাট বিশ্বে কালীকে

আশ্রয় দেবার মত অতি ক্ষুদ্র একটি অন্তরও নেই আজ! কালীর অবচেতন কবি-অন্তর, আধঘুমন্ত বিপ্লবী অন্তর উন্মথিত করে জেগে উঠলো দেশমাতৃকার আহ্বানবাণী। দেশমাতা তো তাকে ভোলেন নি। এখনো এই দুর্যোগময়ী রাত্রির অবসান-প্রতীক্ষায় তিনি অগণ্য সন্তানের মুখপানে চেয়ে আছেন; অসীম ধৈর্য্যে অপেক্ষা করছেন আগামী দীপ্তোজ্জ্বল প্রভাতের সম্ভাবনার জন্য! সে সম্ভাবনাকে কালী ত্বরান্বিত করতে পারে, তপঃসিদ্ধ করতে পারে।

কক্কড় শব্দে আবার বজ্র গর্জন করে উঠলো, কালীর অন্তরে গান বেজে উঠলো যেন—"বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে, বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম—

জয়, তব জয়—"

ফিরে এলো কালী ছোট্ট সেই কুঠরীতে। মোমবাতিটা শেষ-জ্বলা জ্বলছে; তীব্রতর হয়ে উঠেছে ওর শিখা। কালী একটা লাল-নীল পেনসিল তুলে নিয়ে ফটোর মাথার উপরকার দেওয়ালে লিখলো :—

"যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,—
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হ'য়ে রইলো আমার সত্তায়;—
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি, মৃত্যুর মূল্যে—
দুঃখের দীপ্তিতে!···

দুর্য্যোগময়ী রাত্রির অন্ধকার গর্ভে আগামী সূর্য্যের সম্ভাবনার ভ্রূণ রইল, তাকে বারম্বার নমস্কার ! ! !—কালী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—যে পথে কৃষ্ণা গেছে, হাসি যাবে এবং যে পথে চলবে অনাগত যৌবন, অনমনীয় বীর্য্য আর অপরাজেয় ঐকান্তিকতা !

বজ্রহুঙ্কার ওকে স্বাগত জানাচ্ছে !

ভোর বেলা সাজি হাতে এলো হাসি। সারারাত্রির অনিদ্রায় চোখদুটি ওর ক্লান্ত-করুণ, মুখের দীপ্তি নিষ্প্রভ। বীতবর্ষণ প্রত্যূষের কোমলতায় ওকে আরো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দু'একটা ফুল তুলেই সে দেখতে পেল, কালীর ঘরদোর খোলা। উঁকি দিয়ে দেখলো, কেউ নেই। ফুলের সাজি হাতে ঢুকলো এসে ঘরে।—ফটোর মাথায় ডগ্‌ডগে লাল কালিতে লেখা কবিতাটি; একনিশ্বাসে পড়ে ফেললো হাসি। মুখের হাসি ওর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে! হাতের সাজির সব ফুলকটি নিঃশেষে সেই ফটোর উপর ঢেলে দিয়ে বললো,—

—এই তো চাই ! এই-ই আমি চেয়েছিলাম। বীর তুমি, বিপ্লবী তুমি,—তুমি নিবে গিয়েছিলে, আমি তোমায় আবার জ্বালিয়ে দিলাম। কৃষ্ণা যা করেনি, আমি সেই কাজ করতে পেরেছি, এই আমার গৌরব। তোমায় জয়মাল্য দেবার জন্ম তোমার ফেরার পথ চেয়ে আমি বসে রইব।

হাসি বাইরে এসে দেখলো, সূর্য্যের প্রথম রশ্মি মহাকালের ত্রিশূলের মত ঝলমল করছে আকাশের বুকে। মৃত্যুপাণ্ডুর পৃথিবীতে অ-মৃতের আশ্বাস-বাণী জেগেছে !

হাসি নমস্কার করলো আনত হয়ে।

শেষ

৬। পান্নার বুকে রহস্য—ফণীন্দ্রনাথ পাল ১৲
৭। মাখন দৌড়ে—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। পুরস্কার-প্রতিযোগিতা—সুধাংশু দাশগুপ্ত
৯। সাহসীর জয়যাত্রা—(যন্ত্রস্থ)

ছোটদের গল্পের বই ঃ

১। সুরমাধুরী—প্রমথনাথ সেন ||/০
২। মায়া-মুকুর—বিনয়েন্দ্র সিংহ ||০
৩। দানবে-মানবে— ঐ ||০
৪। দেবতার-রোষ— ঐ ||০
৫। জানোয়ারদের যুদ্ধযাত্রা—ইন্দুভূষণ রায় ৸৵০

হাসির গল্প ঃ

১। শনিবারের বিকেল—বুদ্ধদেব বসু ১৲
২। কালান্তক লাল ফিতা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী ১৲
৩। বেঁটে বক্কেশ্বর—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৲
৪। কুড়ের বাদশা— ঐ ১৲
৫। ছিটে ফোঁটা—(৮৮টী রস-রচনা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৲
৬। রিপ ভ্যান্ উইঙ্ক্ল্—প্রমথনাথ সেন ||০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প ঃ

১। বিজ্ঞানের বিস্ময়—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৸০
২। আজগুবি জানোয়ার—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু ১৲

জীবনী ও ছোট গল্প ঃ

১। গৌতম বুদ্ধ—ত্রিভঙ্গ রায় ১||০
২। রাজর্ষি অশোক—প্রমথনাথ সেন ১৲
৩। মণি-কাঞ্চন—ভীমাপদ ঘোষ ১৲
৪। ভিক্তর হুগোর গল্প—গজেন্দ্র মিত্র

সেন ব্রাদাস এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দ্রষ্টব্য ঃ—লাইব্রেরী ও দোকানদারদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে।